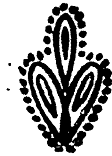
তামসী

জরাসন্ধ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২



প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা ১২
মুদ্রক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩
প্রচ্ছদ-চিত্র
খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

শ্রীঘরে বসেও

যারা ঘর বাধবার স্বপ্ন দেখে

সেই সব হতভাগিনীর উদ্দেশে

লে খ কে র

লৌহকপাট ১ম ৩৫০ * লৌহকপাট ২য় ৩৫০ * লৌহকপাট ৩য় (যন্ত্রস্থ)

গল্প লেখা হল না ১'৫০ * রংচং ১০০

তা ম সী

এক

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই আবার সেই বজ্র-হুঙ্কার—হজৌর! আপাতত আশ্বস্ত হলেন মহেশ তালুকদার। বাজ নয়, বাঘও নয়, তাঁরই অনুগত অনুচর, চীফ হেডওয়ার্ডার মহাবল সিং। পরক্ষণেই আবার কপালে ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার রেখা। গুরুতর অঘটন কিছু না ঘটলে এই গভীর রাতে তাঁর ডাক পড়ে নি। জেলর সাহেবের ঘুম ভাঙাবার আগে জানালার শিক ভেঙে উধাও হয়েছে হয়তো কোনো ধুরন্ধর দায়মলি,* কিংবা বারো নম্বরের জুয়ার আড্ডায় বিড়ির বখরা নিয়ে ঝড়ু মণ্ডলের দাঁত ভেঙেছে ছলিমদ্দির ঘুসি। তারই চমকপ্রদ রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে তাঁর জানালায় হানা দিয়েছেন জমাদার সাহেব।

বাজখাঁই কণ্ঠের আর-একটা উদ্‌গিরণ ঘটবার আগেই সাড়া দিলেন তালুকদার—কেয়া হুয়া?

নরম সুরে জবাব এল, সেলাম হুজুর, জেনানা ফাটকমে হল্লা হোতা হ্যয়।

—জেনানা ফাটকে হল্লা! কেন, ভাগল নাকি কেউ?

—নেহি হুজুর, এক আদমিকা শকৃত্‌ বেমার হুয়া।

—ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

—জী হাঁ। ডাকদরবাবু আফিসমে বৈঠল বা।

অতএব উঠতে হল। সুইচ টিপতেই নজর পড়ল টেবিলের কোণে টাইম্‌পিসটার উপর। রাত তিনটা বেজে পনেরো। শেষ-মাঘের দুর্দান্ত শীত। ওত পেতে বসে ছিল লেপের বাইরে। বেরিয়ে

---

* যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী

আয়তেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অনাবৃত দেহের উপর। আলনা থেকে জামাটা আনতে গিয়ে চোখ পড়ল ড্রেসিংটেবিলের আয়নায়। নিজের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে দেখলেন জেলর সাহেব। সদ্য-নিদ্রামুক্ত মুখের উপর গভীর হয়ে উঠল বিরক্তির কুঞ্চন। তারপর আপাদমস্তক বর্মাবৃত করে টেবিলের টানার ভিতর থেকে বের করলেন একটা থলে—জেনানা ফাটকের চাবির গোছা।

জেলখানার আসল প্রতীক এই তালাচাবি। কয়েদীকে মানুষ হবার সুযোগ দাও, তার সমাজ-বিরোধী মনকে ফিরিয়ে আনো সমাজ-কল্যাণের দিকে—এ সব হল কারাতন্ত্রের কেতাবী কথা। কাজের কথা হল, তাকে আটকে রাখো। তার অশন-বসন আরাম-বিরাম কাজ-কর্মের দিকে নজর দাও, আপত্তি নেই, কিন্তু সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখো, সে যেন না পালায়। জেলের ওয়েলফেয়ারটা তোমার ভাববার বিষয়, কিন্তু ভাবনার বিষয় হল তার সিকিউরিটি।

যে কোনো একটা কারাদুর্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চারদিক ঘিরে আছে চোদ্দ ফুট উঁচু দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল। এক পাশে একটিমাত্র লৌহতোরণ। তার সামনে অহোরাত্র টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী। শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই জেলের কর্তৃমহল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটিল এবং ব্যাপকতর তালাচাবির অবরোধ। সূর্যদেব পাটে বসবার আগেই সারা জেল জুড়ে শুরু হবে 'লক-আপ' পর্বের আয়োজন। মেট আর কয়েদী-পাহারাব দল তাদের আপন আপন বাহিনী কুড়িয়ে এনে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে দেবে লম্বা লম্বা ব্যারাক এবং সেল ব্লকের দরজার সামনে। 'গুনতি' হবে—দো, চার, ছ, আট।·· তারপর সার বেঁধে তারা ঢুকে পড়বে পূর্বনির্দিষ্ট 'নম্বরের' বিশাল গহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে লৌহ-কপাটের ঝনৎকার আর তালাবন্ধের ক্লিক ক্লিক। নিশান্তে যারা তালার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল, দিনান্তে আবার তাদের ফিরে যেতে হবে সেই দৃঢ়বদ্ধ তালার আশ্রয়ে। অতঃপর 'লক-আপ' পর্বের

অবসান। নিরুদ্বেগ সবল কণ্ঠে ঘোষণা করবে চীফ-হেডওয়ার্ডার, সব ঠিক হ্যয়। সেনট্রাল টাওয়ারের শিখর থেকে বেজে উঠবে 'তিন ঘন্টি'র প্রতিধ্বনি—সব ঠিক হ্যয়।

দরজার বুকের উপর তালার মালা ঝুলিয়ে দিয়েই কি দায়মুক্ত হলেন কর্তৃপক্ষ? এটা শুধু সূচনা। তারপর থেকে শুরু হবে তালার উপর বল-প্রয়োগ। প্রহরে প্রহরে তার শক্তি পরীক্ষা করে যাবে শক্তিমান প্রহরীর দল, আর তার বিরাট চাবির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে টহল দেবে আর-একদল নিশাচর। জেলকোডে তাদের নাম হেড-ওয়ার্ডার, সিপাই-কোডে বলে জমাদার সাহেব। কয়েকটা করে ব্যারাক বা ওয়ার্ড নিয়ে তাদের আঞ্চলিক এলাকা, এবং নিজ নিজ অধিকারের প্রতিটি চাবির জন্য তাদের জবাবদিহির দায়িত্ব। কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাদের এলাকার বাইরে। তার নাম ফিমেল ওয়ার্ড বা জেনানা ফাটক। সেখানকার চাবিগুচ্ছের নৈশ মালিক স্বয়ং জেলর সাহেব।

মহেশের মনে পড়ল দীর্ঘ-দিন পিছনে ফেলে-আসা সেই সন্ধ্যাটির কথা, 'লক-আপ' অন্তে প্রথম যেদিন তাঁর হাতে এসেছিল এই জেনানা ফাটকের চাবির থলি। সে যেন তুচ্ছ একতাড়া চাবি নয়, তার সঙ্গে জড়ানো একটি নারীরাজ্যের গৌরবময় অধিকার। আজ থেকে প্রতিটি রাত আমারই হাতে ন্যস্ত হল কয়েকটি অসহায়া বন্দিনীর মান, সম্ভ্রম, নিরাপত্তা, আমারই উপরে তারা একান্ত নির্ভর —এমনি একটা পুলকময় অনুভূতির মৃদু স্পর্শ হয়তো লেগেছিল তাঁর সেদিনের তরুণ মনে, তুলেছিল একটুখানি মিষ্ট সুরের গুঞ্জরণ। তারপর একদিন কখন তার শেষ রেশটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেছে! আজ এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে ঐ লণ্ঠনধারী বড় জমাদারের অনুসরণ করতে গিয়ে চকিতে মনে হল সেইদিনকার কথা। এক ঝলক কৌতুক-হাসির মৃদু স্পর্শে গোঁফের কোণ দুটো নড়ে উঠল।

এত রাত্রে হল্লার রিপোর্ট পেয়ে জেলর সাহেবের মনে যে

দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছিল, জেনানা ফাটকের কাছাকাছি আসতেই সেটা মিলিয়ে গেল। ভুল করেছে জমাদার। এ হল্লা নয়, নারীকণ্ঠের কলকাকলি! সুরসিক বলে বিধাতা-পুরুষের খ্যাতি নেই। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তিনি রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নারী জাতির বাগ্‌যন্ত্রে বেগ দিয়েছেন অপরিমেয়, কিন্তু ব্রেক নামক কোনো বল্‌গার সংযোগ করেন নি। তাই দেখা যায়, স্বজাতীয়ার দর্শনমাত্রেই তাঁরা পুলকিত-তনু হয়ে ওঠেন, এবং মুখোমুখি হলেই খুলে যায় মুখের অর্গল। তারপর সেই মুক্ত দ্বারপথে যে ঝটিকা-প্রবাহ ছুটে চলে, তাকে রোধ করতে পারে সংসারে এমন শক্তি নেই। যে কোনো নারীসমাবেশে গিয়ে দেখুন, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। রেলের জেনানা কামরা থেকে লেডি-হস্টেলের কমন-রুম, পল্লীপুকুরের স্নানের ঘাট থেকে মহিলা-সমিতির বাৎসরিক সম্মেলন—সর্বত্র এই একই দৃশ্য। সকলেই বক্তা, অভাব শুধু শ্রোতার। জেলের পাঁচিলের মধ্যে বসে নারী অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু এই সনাতন জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে পারে না।

কম্পাউণ্ড-গেট খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই কানে গেল ফিমেল-ওয়ার্ডার সুশীলা দত্তের দুর্জয় ধমক। কোলাহলের সুর নেমে গেল কিন্তু গতি বন্ধ হল না। জেলর এবং জেলডাক্তার সদলবলে ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার তালা খুলতেই ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এল একটি মেয়ে। ডোরাকাটা জেলের শাড়িখানা শক্ত করে কোমরে জড়ানো। সর্বাঙ্গে একটি অনাড়ষ্ট সহজ ভঙ্গী, তৃতীয় শ্রেণীর জেনানা ফাটকে যেটা সুলভ নয়। ডাক্তার সিঁড়ির গোড়ায় এগিয়ে যেতেই সে বাধা দিল—একটু পরে উঠবেন, ডাক্তারবাবু, দরজার সামনেটা নোংরা হয়ে আছে। এখখুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

সুশীলার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি, মাসীমা। বলেই, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল এবং জমাদারের দিকে চেয়ে বলল, আলোটা একটু ধরবেন, জমাদার সাহেব। বড্ড অন্ধকার।

জমাদার আলো নিয়ে গেল ওর সঙ্গে। ওয়ার্ডের পেছনে যতক্ষণ ওরা অদৃশ্য হয়ে না গেল, তালুকদার নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেরালেন সুশীলার দিকে। সুশীলা প্রশ্নটা বুঝল এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ওর নাম হেনা। ফরিদপুর জেল থেকে চালান এসেছে।

মহেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কদ্দিন ?

—তা, দিন পনেরো হবে।

—দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

সুশীলা মৃদু হেসে বলল, দেখেছেন বৈ কি। রোজই তো থাকে নম্বর খোলার সময়। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি।

জেলর বিস্মিত হলেন। লক্ষ্য না করবার মতো মেয়ে তো নয়! তবে এ হয়তো সেই জাতের, চিরদিন যারা ভিড়ের মধ্যেই থাকে, শুধু প্রয়োজনের দিনে বোঝা যায় ভিড় থেকে তারা আলাদা।

মিনিট চারেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। এক হাতে ঝাঁটা, আর এক হাতে মস্ত বড় জলের বালতি। আর-একবার সুশীলার ঝঙ্কার শোনা গেল, বলি, তোদের কি সব হাতে-পায়ে খিল ধরেছে! ঐ একটা মানুষ কত করবে, শুনি? একটা চাপা গুঞ্জন উঠল মেয়েদের দলে। দু-এক জন উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু এগিয়ে আসবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক হেনার পাশে এসে বলল, ঝ্যাঁটাটা আমার হাতে দাও, দিদিমণি। তুমি ওদিক থেকে জল ঢালো। সঙ্গে সঙ্গে নাকে কাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আপনারা সব সরে যাও বাবুরা।

তুমি পারবে না, কানুর মা, বাধা দিয়ে বলল হেনা। আমি চট করে ধুয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং ফিনাইলের টিনটা নিয়ে এসো। ঐ কোণে আছে।

কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে সিঁড়ির মুখে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ঝাঁটা এবং বালতি নিচে নামিয়ে রাখল। তারপর ডাক্তারের

দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আসুন। অনেকক্ষণ আপনাদের কষ্ট দিলাম ঠাণ্ডার মধ্যে।

ডাক্তারের পিছনে তালুকদারও সিঁড়িতে উঠবার উদ্যোগ করছিলেন। হেনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আর না-ই বা এলেন স্যর, এই সব অসুখ-বিসুখের মধ্যে। তার চেয়ে বরং আমাদের ঐ খাটনি-ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। বড্ড হিম পড়ছে।

ঘরে ঢুকেই সুশীলাকে ফিসফিস করে কী বলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তাড়াতাড়ি নেমে এসে ওয়ার্ক-শেডের ভিতর থেকে একটা মোড়া বের করে আচল দিয়ে মুছে পেতে দিল বারান্দায়। তারপর জেলর সাহেবের কাছে গিয়ে সনির্বন্ধ বিনয়ের সুরে বসতে অনুরোধ করল। তালুকদার কৌতুক-দৃষ্টিতে সুশীলা জমাদারনীর ঐ সিংহাসনটির দিকে তাকালেন, এবং কোনো উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে সেটি গ্রহণ করলেন।

ডাক্তার বয়সে তরুণ। জেলের চাকরিও বেশি দিনের নয়। তখনো পুরোপুরি জেল-ডাক্তার হয়ে উঠতে পারেন নি। রোগীকে রোগী বলেই দেখেন, কয়েদী বলে নয়। মিনিট দশেক পরে রবারের নলটা গলায় ঝুলিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, হেনাকেও তাঁর পাশে দেখা গেল। বলতে বলতে আসছে, বোধ হয় তাঁর কোনো প্রশ্নের উত্তরে, না, রক্তবমি এর আগে আর হয় নি। জ্বরটা চলছে বেশ কিছুদিন থেকে ; তার সঙ্গে কাশি, রাত্তিরে রাত্তিরে ঘাম, তার পরেই ভীষণ দুর্বলতা, সবই আমি আপনি আসার আগেই জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিয়েছি।

—অথচ এত দিন আমাকে কিছুই বলে নি, বিরক্তির সুরে বললেন ডাক্তার।

—আপনাকে বলে নি, তার কারণ আছে।

—কী কারণ ? সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চাইলেন ওর মুখের দিকে। তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল হেনা, যদি ভাত বন্ধ করে দেন।

ও-ও, বলে হেসে উঠলেন ডাক্তার। পাশে যে দাঁড়িয়ে, তার চোখে-মুখেও ছড়িয়ে গেল সে হাসির ছোঁয়াচ। তারই উপর আরেক জনের দৃষ্টি-স্পর্শ অনুভব করে চকিতে চোখ নামিয়ে নিল।

কাছে এলে লণ্ঠনের আলোয় তাঁর এই নতুন কয়েদীটিকে আর-একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন জেলর সাহেব। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামবর্ণা মেয়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে তার নিখুঁত দেহবিন্যাস। প্রতিটি অঙ্গ এবং তার প্রতিটি রেখা ও কোণ যেন কোনো নিপুণ ভাস্করের সযত্ন সাধনার ফল। বাহুল্য নেই, নেই কোনোখানে এতটুকু অপূর্ণতা। সব মিলিয়ে একটি অনুপম শিল্পসৃষ্টি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন তালুকদার। নাতিপ্রশস্ত কপালের নীচে মমতা-ভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ। সুগঠিত নিটোল দুটি গণ্ড; আলগোছে নেমে এসে মিলে গেছে চিবুকের রেখায়। পাতলা ঠোঁট দুখানিতে মাধুর্যের সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তিত্ব।

—কী দেখলে? ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তালুকদার।

—এক্সরে না করে ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাহলেও ওখানে রাখা চলবে না। সরিয়ে দেওয়াই দরকার। রক্ত-টক্ত দেখে সবাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

—বেশ তো; হাসপাতালে নিয়ে যাও।

সাধারণ ওয়ার্ড থেকে খানিকটা দূরে কম্পাউণ্ড-পাঁচিলের গা ঘেঁষে এক রাশ নেবুগাছের ঝোপের আড়ালে একখানা মাত্র ঘর। সেইটাই ফিমেল হাসপাতাল। ডাক্তার একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে তো যাব। কিন্তু একটা মুশকিল আছে।

—কী মুশকিল?

—একা-একা কিছুতেই যেতে চাইছে না।

—একা যাবে কেন? উত্তর দিল হেনা। আমি থাকব ওর কাছে।

—আপনি! হেনার সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কপাল কুঞ্চিত করলেন ডাক্তার। মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ।

দেহের চার দিকে আঁচলখানা আরো খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে হেনা মৃদু হেসে বলল, কেন? পারব না ভাবছেন? খুব পারব।

—পারার কথা হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ডাক্তার। তারপর জেলর সাহেবের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, এ রোগের সবচেয়ে সহজ শিকার হচ্ছে যৌবন। ফস করে ধরে ফেলতে পারে।

—পোকাগুলো তো বেশ রসিক দেখছি, মন্তব্য করলেন তালুকদার। তোমরা এদের খালি খালি নিন্দে করে বেড়াও।

ডাক্তার হেসে উঠলেন। ঠিক তখনই ওয়ার্ডের ভিতর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেল। হেনা ছুটে চলে গেল। ডাক্তারও তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই। কাশিতেও রক্ত রয়েছে, স্কায়াগ্রামটা কাল সকালেই নিতে হবে।

জেলর বললেন, সরাবার ব্যবস্থাও কাল সকালেই কোরো। এত রাত্রে টানা-হেঁচড়া সুবিধে হবে না। ঘরটাও একটু ঝেড়ে-পুঁছে গোছগাছ করে নিতে হবে। অ্যাদ্দিন খালি পড়ে আছে।

একটু থেমে, সুশীলার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, ঠিক খালি বোধ হয় নেই। কারো কারো দিবানিদ্রা-ডিউটি হয়তো ওখানেই সেরে নেওয়া হয়। কী বল জমাদার?

মহাবল সিংয়ের জমকালো গোঁফের নিচে চকিতে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। মনিবের মুখে নিজের নাম উল্লেখমাত্র বুট ঠুকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলল, জী, হুজুর!

—বেশ, তাহলে এবার চলো। ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন তালুকদার, যে রকম ঠাণ্ডার বহর, আর কিছুক্ষণ এই খোলা বারান্দায় বায়ু সেবন করলে আমাকেও তোমার হাসপাতালে আশ্রয় নিতে

হবে। বলে, মাফলারের উপর ওভার-কোটের কলারটা আর-একটু তুলে দিয়ে রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন।

সুশীলাকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার পর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হেনা ছুটে এসে বলল, রোগীর সঙ্গে আমিই থাকব তো?

ডাক্তারেব মুখ গম্ভীর। সেদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন তালুকদার, রোগটা তো ভালো নয়, দেখতে পাচ্ছ। ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিপদ ঘটতে পারে।

হেনা কিছুমাত্র দমে না গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, সে বিপদ তো সবার বেলাতেই আছে।

—তা আছে ; কিন্তু তোমার এই বয়সে তার সম্ভাবনা একটু বেশী।

—তা হোক : আমিই ওর দেখাশোনা করব। আপনি বলে দিয়ে যান।

জেলর ফিরে দাঁড়ালেন। অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখের চেহারা ঠিক দেখতে পেলেন না। বিস্মিত হলেন ওর কণ্ঠের দৃঢ়তায়। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে সহজভাবেই বললেন, বিপদ আছে জেনেও এত বড় ঝক্কি তুমি নিতে চাইছ কেন?

হেনা জবাব দিল না। নতমুখে দাঁড়িয়ে আঁচলের কোণে আঙুল জড়াতে লাগল। মহেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তুমি ওয়ার্ডে যাও। হাসপাতালে কে থাকবে, কাল সকালে আমরাই স্থির করব।

—আপনারা হয়তো জানেন না, মুখ তুলে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু আমি জানি, এখানে আর যারা রয়েছে তাদের সবারই ঘর-সংসার আছে, আপনার জন আছে। একদিন তাদের কাছে ফিরে যাবার আশা রাখে। তারা এ ঝক্কি নেবে কেন? আপনি হুকুম করলে অবিশ্যি না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

একজন সাধারণ মেয়ে-কয়েদী জেলর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে

তাঁর মুখের উপর তর্ক করে যাবে, মহাবল সিং জমাদার কিংবা সুশীলা জমাদারনীর পক্ষে সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। প্রথম জন শুরু থেকেই ছটফট করছিল ; দ্বিতীয় ব্যক্তি আর থাকতে না পেরে কী একটা বলে উঠতেই, হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তালুকদার। তারপর তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, সে বিবেচনার ভার আমাদের। তবু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। অন্য সবার বেলায় যে বাধার কথা বলছিলে সেটা কি তোমার বেলায় নেই ? তোমাকেও তো একদিন ঘরে ফিরে সংসারের ভার নিতে হবে।

হেনা মুহূর্তকাল কী ভেবে নিয়ে বলল, না, সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

নিতান্ত সহজ সুর। তবু কিছু একটা ছিল তার মধ্যে, বহুদর্শী জেলর মহেশ তালুকদারের কঠিন অন্তরেও তার ছোঁয়া লাগল। এই আশ্চর্য মেয়েটির পূর্বজীবনের কোনো ইতিহাস তাঁর জানা নেই। চোখের উপর যেটুকু দেখলেন তার থেকেই মনে হল, এই বয়সে সমস্ত জেনে-শুনেও এই যে নিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, এর সবটুকুই বোধ হয় পরোপকারের প্রেরণা নয়।

জেলর সাহেবকে নিরুত্তর দেখে হেনা যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে ওয়ার্ডের ভিতর থেকে নিয়ে এল তার কয়েদী টিকেট। ওঁর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, তাহলে লিখে দিন।

সুশীলা ধমকে উঠল, পাগল হলি না কি তুই ? এটা কি ওঁর খাটনি পাশ করবার সময় ? দে, আমাকে দে টিকিট।

—আপনি থামুন তো মাসীমা, খানিকটা আব্দারের সুরে বলল হেনা। এখন না করিয়ে নিলে কাল ওঁর মনে থাকবে কি না ! এদিকে আবার বাগড়া দেবার লোকের তো অভাব নেই, বলে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। তালুকদার হাত বাড়িয়ে টিকেটখানা নিলেন ওঁর হাত থেকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন

চমকে উঠলেন যখন নজর পড়ল অপরাধের ধারাটার উপর। এই মেয়ে খুন করেছিল! বিষ খাইয়ে! কাকে? কেন? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। এই সামান্য ব্যাপারে বিস্ময় তাঁর শোভা পায় না। তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কত শত বার নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন জেলর সাহেব। উত্তর পান নি। এ এক আদি-অন্তহীন আদিম রহস্য! এমনি আরো কত দেখেছেন তিনি। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। কথায়-বার্তায় চেহারায় হাবভাবে অন্য দশ জনের মতো। কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। হঠাৎ টিকেট উলটে দেখা গেল, ঐ অতি সাধারণ হাত দুখানা নররক্তে কলঙ্কিত। টিকেট যে দেখে নি, তার কাছে সে পরিচয় হয়তো কোনো দিনই প্রকাশ পাবে না। তবু দাগ থেকে যায়। অন্য সকলের অলক্ষ্যে হয়তো শুধু তার নিজের বুকের মধ্যে একটা মসীরেখা সে বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। এই খুনী মেয়েটার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তালুকদার। খুঁজতে চেষ্টা করলেন সেই মৃত্যুহীন কালো ছায়া। কিন্তু ঐ প্রশান্ত চোখ দুটির মধ্যে তার কোনো আভাস চোখে পড়ল না। মনের মধ্যে জেগে রইল শুধু সেই সমাধানহীন চিরন্তন প্রশ্ন—এ কেমন করে সম্ভব? একদিন যে হাত একজনের প্রাণ নিয়েছিল, আজ সে আর-একজনের প্রাণ দেবার জন্যে ব্যাকুল। বিনামূল্যে নয়, নিজের প্রাণের বিনিময়ে। এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে তো কোনো ফাঁকি নেই।

বুকপকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে বললেন তালুকদার, তোমার কথা আমি রাখলাম। কিন্তু আমার একটা কথাও তোমাকে রাখতে হবে।

—কী কথা, বলুন। আপনি যা হুকুম করবেন, আমি আনন্দে মাথা পেতে নেব।

—বেশ, কিন্তু আজ নয়, তার সময় একদিন আসবে। সেই দিন তোমাকে জানাব।

এইটুকু বলেই সেই টিকেটের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন, Sick Attendant, T. B. Ward.

যক্ষ্মারোগীর নার্সের পদে বহাল হল হেনা মিত্র।

জেলর সাহেবের হাত থেকে টিকেটখানা ফিরে পাবার পর সেই লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হেনা। তার পর সেটা বুকে চেপে ধরে বসে পড়ল মাটির উপর। হাত তুখানা তাঁর পায়ে ঠেকিয়ে মাথায় রাখল। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে যখন মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে, সবিস্ময়ে দেখলেন তালুকদার, সেই চোখ তুটো জলে ভরে গেছে। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ ফেরালেন। মনে হল ঐ শিশির-ঝরা তামসী রাত্রির সঙ্গে এই অশ্রুসজল শ্যামল মুখখানার কোথায় যেন একটা মিল আছে!

পরদিন ভোর থেকেই হেনার কাজ শুরু হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ধুয়ে-মুছে ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে তুলল সেই নেবুতলার ছোট্ট হাসপাতাল। আরো তু-তিনটি মেয়েও খাটল তার সঙ্গে। মেইন হাসপাতাল-থেকে ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তুখানা লোহার খাট, তু-সেট আনকোরা নতুন গদি, বালিশ, চাদর, মশারি। সব সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে বিছানা পেতে রোগীকে শুইয়ে দিল জানালার ধারে। বেড-সাইড টেবিলটাও গুছিয়ে ফেলল। সেখানে রইল টেম্পারেচার চার্ট, থার্মোমিটার, খাবারের পাত্র এবং আর সব টুকিটাকি। একটা মাটির সরা আনিয়ে, তার মধ্যে কয়লা জ্বেলে, খানিকটা ধুনো ছিটিয়ে বসিয়ে দিল খাটের পাশে। সুগন্ধি ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠল।

গোছানো-পর্ব শেষ হলে সকাল সকাল স্নান সেরে নিজের হাতে সাজিমাটি দিয়ে কাচা 'ফিমেল-কুর্তা'র উপর ডোরাকাটা শাড়িখানা জড়িয়ে এক রাশ ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, সবে এসে বসেছে বুড়ীর খাটের পাশে-রাখা ছোট টুলটিতে, এমন সময় ডাক্তার

এসে পড়লেন। চার দিকটা একবার চোখ বুলিয়ে, তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটিমাত্র অব্যয়—বাঃ! তার পর ওর দিকে যখন চোখ ফেরালেন, সে চোখে কিছুক্ষণ আর পলক পড়ল না। হেনার মুখের উপর ছড়িয়ে গেল এক ঝলক আরক্ত আভা। সেইটাই বোধ হয় লুকোবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে থার্মোমিটারটা ঝাড়তে শুরু করে দিল। ডাক্তারও ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছেন। হেসে বললেন, আপনার হাতে দেখছি জাদু আছে। এই সব তুচ্ছ জিনিসগুলো অন্য হাসপাতালেও তো দেখেছি, কিন্তু—হঠাৎ বুড়ীর দিকে নজর পড়তেই সুর বদলে গেল, এই যে, আমার পেশেণ্টও দেখছি বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। কেমন আছ, কী নাম যেন তোমার?

হেনা হেসে ফেলল, এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? ওর নাম মোনার মা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোনার মা। কেমন লাগছে আজ?

বুড়ী ম্লান হেসে বলল, ভালো আছি, বাবা! আমার মা রয়েছে কাছে, আর আমার ভয় নেই।

—বেশ। কই, দিন থার্মোমিটার। হেনার দিকে হাত বাড়ালেন। বুড়ী বলল, হ্যাঁ বাবা, আমার মাকে এখানেই থাকতে দেবে তো?

—কেন, একলা থাকতে পারবে না?

—একলা! না, বাবা! তাহলে আমি মরেই যাব, বলে কম্পিত হাতখানা দিয়ে হেনাকে ধরে ফেলল, যেন এখনই কেউ তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

হেনা সেই হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। মাথা নেড়ে বলল, দেখলেন তো?

ডাক্তারের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে একলা থাকতে হবে না। উনিও থাকবেন তোমার ঘরে।

রোগী দেখা হয়ে গেলে নার্সকে দু-চারটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে যেমনি পা বাড়িয়েছেন ডাক্তার, হেনা এগিয়ে এসে বলল, আপনার মেট আর জন দুই ফালতু পাঠিয়ে দেবেন তো।

—কেন?

চোখের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় দফা খাট-বিছানা দেখিয়ে বলল, ঐগুলো ফেরত নিয়ে যাবে।

ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। বললেন, ওগুলো এখানে কাজে লাগবে বলেই দেওয়া হয়েছে।

—কী কাজে লাগবে? এ ঘরে রুগী তো আপনার একটি।

—হ্যাঁ; তবে রুগী ছাড়া আর কেউ কি নেই?

—সে এ সব চায় না।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর নার্সের দিকে। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, দেখুন, জেলখানার নিয়ম হল, যার যা পাওনা, তা সে পাবেই। না চাইলেও পাবে।

—কিন্তু, এগুলো তো সত্যিই আমার পাওনা নয়, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমি সাধারণ কয়েদী। বিছানা বলতে আমার প্রাপ্য শুধু দুটো কম্বল।

—জানি। সে সব জেনেই এ কটা জিনিস আপনাকে পাঠানো হয়েছে।

—কেন?

—কেন আবার কী? এই টি-বি রোগীর ঘরে শুধু দুটো কম্বল বিছিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে পারবেন?

—কেন পারব না? অন্য সবাই যদি পারে আমিও পারব।

—আপনি পারলেও, আমি তা দিতে পারি না। বলে, আর কোনো প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে

পড়লেন। হেনা কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন, আবার কী হল ?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—বলুন না ?

—আপনি আমাকে 'আপনি আপনি' করেন কেন ? আমরা সাধারণ কয়েদী। অন্য সব বাবুরা, সিপাই, জমাদার সকলেই তো আমাদের 'তুমি' বলে থাকেন।

ডাক্তারের দৃষ্টি গভীর হয়ে এল। সমস্ত মুখে ঘনিয়ে এল গাম্ভীর্যের ছায়া। তারপর অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, সকলের চোখ তো সমান নয়। কেউ যদি মনে করে, 'সাধারণ কয়েদী' এই কথাটার মধ্যেই একজনের পরিচয় শেষ হয়ে যায় নি, তাতে আপত্তির কী আছে। মানুষ কি সব সময়ে নিজেকে দেখতে পায়, না বুঝতে পারে, হেনা ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডাক্তার ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কিন্তু আরেক জনের পা দুটো যেন অচল হয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মতো। ইতিমধ্যে সুশীলা কখন এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, টের পায় নি। হঠাৎ চমক ভাঙল তার ডাক শুনে, এখানে কী করছিস ? ও মা, চোখ দুটো যে ছলছল করছে। জ্বর-টর হয় নি তো ? দেখি, বলে কাছে এসে কপালে হাত রাখল। আশ্বাসের সুরে বলল, না, গা দেখছি ঠাণ্ডা।

মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে এনে হেনা বলল, আমি কি কচি খুকী, মাসীমা, যে জ্বর হলেও বুঝতে পারব না ? কিচ্ছু হয় নি আমার।

—না হলেই ভালো, বাপু। ঝোঁকের মাথায় কাণ্ড তো একটা বাধিয়ে বসলে। এখন বিপদ-আপদ না ঘটলেই বাঁচি। কী দরকার ছিল ঐ ঘাটের মড়াটাকে আগলে রাখবার ? ব্যারাম হয়েছে, বুঝুক

সরকার, বুঝুক জেলখানার বাবুরা। তোর কী? কোন সাত পুরুষের কুটুম ঐ বুড়ী যে ওকে বাঁচিয়ে না তুললে আর চলছে না? তোর যদি কিছু হয়, তখন দেখবে কে, শুনি?

হেনা ফিসফিস করে বলল, আস্তে মাসীমা! শুনতে পাবে যে?

—শুনুক গে। ভারি বয়ে গেল আমার! না বাপু, এ-সব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। আর জেলর বাবুর আক্কেলটাই বা কী রকম! একজন চাইল বলেই কি তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হবে? কেন, যক্ষ্মারোগীর জন্যেও তো হাসপাতাল আছে। পাঠিয়ে দাও না সেখানে?

—তাই হয়তো দিতেন, ধীরে ধীরে করুণ কণ্ঠে বলল হেনা, তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু দয়া হল। তাই এ কাজে আমাকে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুশীলা জ্বলে উঠল, দয়া! এর নাম হল ওঁর দয়া!

—হ্যাঁ, মাসীমা। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ঐ শুনুন, বুড়ী আবার কাশতে শুরু করেছে। আমি যাই···বলে হাসতে হাসতে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকল। সুশীলা মুখখানা বিকৃত করে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে চলল খাটনি-ঘরের দিকে।

এর পর কটা দিন কেটে গেল রীতিমত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। এক্সরে ফটো তোলার জন্যে মোনার মাকে পাঠানো হল বাইরের সদর হাসপাতালে। রিপোর্ট আসবার পর বিশেষজ্ঞ এলেন। জেলের বড় সাহেব একাধারে সুপার এবং মেডিক্যাল অফিসার। তিনিও একদিন এসে দেখে গেলেন। কাজের সূত্রে ডাক্তারকে এ কদিন অনেকখানি বেশি সময় কাটাতে হয়েছে রোগীর ঘরে। হেনাকেও থাকতে হয়েছে তাঁর হাতের কাছে। কখন কী চাই, কখন কী করতে হবে। কাজকর্মের মধ্যে কত বার দুজনের চোখোচোখি হয়েছে, দাঁড়াতে হয়েছে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। আঙুলের সঙ্গে

ছোঁয়া লেগেছে আঙুলের, একজনের দেহে লেগেছে আরেক জনের নিশ্বাস। অকস্মাৎ হেনার বুকের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে রক্তস্রোত, কখনো আবার অবশ হয়ে এসেছে হাত দুটো। কিন্তু এই অসঙ্গত হৃদয়াবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায় নি। সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য চিত্তকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করেছে। নিজেকে নিবিষ্ট করে দিয়েছে নিরলস সেবার মধ্যে।

কয়েক দিন পরে সকাল সাড়ে আটটায় যথারীতি রোগী দেখতে এসেছেন ডাক্তার। বুড়ীর মুখে থার্মোমিটার দিয়ে অপেক্ষা করছেন। হেনা সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেলছিল। তার পর রোগীর বাসি কাপড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ডাক্তার বললেন, শোনো।

হেনা ফিরে দাঁড়াল। চোখে পড়ল দুটি একাগ্র মুগ্ধ চোখ। মনে হল শুধু এই মুহূর্তে নয়, এতক্ষণ ধরেই বোধ হয় তারা তাকে অনুসরণ করেছে। নিজের অজ্ঞাতে বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। দেহটাও কেমন আড়ষ্ট হয়ে এল। বুকের কাপড়খানা টেনে দিয়ে বলল, কী বলছেন ?

ডাক্তারের মুখে সলজ্জ হাসি। অপ্রতিভ স্বরে বললেন, না, থাক।

—কিছু চাই কি ?

—না ; দেখছিলাম, তুমি যখন ছুটোছুটি করে কাজ কর, ভারি আশ্চর্য লাগে। কেমন একটা সুন্দর ছন্দ আছে তোমার চলাফেরার মধ্যে।

—এই ব্যাপার ? আমি ভেবেছিলাম, কী না জানি দরকারী কথা।

আরো একটা কী বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার। হেনা বাধা দিয়ে বলল, ও মা ! ও করছেন কী ? আর কতক্ষণ জিভ বার করে থাকবে বেচারা ! ওটা তুলুন, তার পর না হয় ছন্দ দেখবেন বসে বসে। বলেই, বেরিয়ে গেল তেমনি দ্রুত ছন্দে।

বাইরে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। এ কী করল সে! স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে এল, ওঁর ঐ স্তুতিটুকু সে মনে মনে উপভোগ করেছে, ভালো লেগেছে তার মিষ্টি স্বাদ। বাইরে যে ভাবই দেখাক, খুশী হয়েছে তার অন্তর। ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে! তার একমাত্র কর্তব্য ছিল একটা কড়া উত্তর। বলা উচিত ছিল, আপনি তো এখানে আমার দেহের ছন্দ দেখতে আসেন না, ডাক্তারবাবু! আপনার অন্য কাজ আছে, দায়িত্ব আছে। সেই দিকে মন দিন। একবার ভাবল, ফিরে গিয়ে শুনিয়ে দেয় কথাগুলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠল না। কী ভাববেন ডাক্তারবাবু! কাপড়গুলো কেচে নিয়েও তার ফিরে যাওয়া হল না। কী এক মধুর লজ্জায় যেন জড়িয়ে গেল পা দুখানা।

পরদিন আবার রাউণ্ডে এসেছেন ডাক্তার। হাসপাতালের দরজার বাইরে তার টিকেটখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে হেনা। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে যে? খবর ভালো তো? বুড়ী কেমন আছে?

হেনা সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। টিকেটখানা এগিয়ে দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, এ সব কী লিখেছেন আমার টিকিটে? আমার তো কোনো অসুখ করে নি।

ডাক্তার লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে ফেললেন, এই ব্যাপার? আমি তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। না, অসুখ তোমার করে নি। তবু, এই বাড়তি খাবারটুকু তোমার একান্ত দরকার।

—কিচ্ছু দরকার নেই, খানিকটা উদ্ধত সুরে বলে উঠল হেনা। সকলের যা বরাদ্দ, তাই আমার যথেষ্ট। এ সব আপনি কেটে দিন।

ডাক্তার অনুযোগের সুরে বলল, দেখো, তুমি সব বোঝ, আর এই সোজা কথাটা বুঝতে চাও না, যক্ষ্মারোগের নার্স করতে গিয়ে যদি

তাকে রেজিস্ট মানে—ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা বাড়ানো না যায়, যে কোনো সময়ে সর্বনাশ ঘটতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণে পোষ্টাই খাবার পেটে না পড়লে ঐ টি-বি জার্মসগুলোর সঙ্গে লড়বে কী দিয়ে?

—আমার যা আছে, তা দিয়েই লড়ব। না পারি, মরব। তাই বলে রোগের সেবার নাম করে ডিম-মাখন গিলতে পারব না।

—আহা, ব্যাধিটাই তো হল রাজব্যাধি। তাকে রুখতে হলে রাজভোগ ছাড়া চলবে কেন? তোমার রুগীর খাবার লিস্টিটা দেখেছ তো? সে তুলনায় তোমাকে তো কিছুই দিই নি।

—রুগীকে আপনার যা-খুশি দিতে পারেন। আমি তো আপনার রুগী নই। আমাকে দিচ্ছেন কিসের জন্যে? দিলেই বা আমি নেব কেন?

ডাক্তারের সুরে ক্ষোভ ফুটে উঠল—নেওয়া না-নেওয়া তোমার ইচ্ছে। ডাক্তার হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে; তাই দিয়েছিলাম। না খেতে চাও, খেও না। আমার কী!

টিকেটখানা ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বুড়ীর অবস্থা খানিকটা ভালো। তার সঙ্গে দু-চারটা কথা হল। মিটসেফের মধ্যে সাজানো রয়েছে তার খাবার—মাখন, রুটি, ডিম, দুধ আর দু রকমের ফল। সেই দিকে চেয়ে বললেন, খাবার-টাবারগুলো সব খাচ্ছ তো?

—আমি তো খাচ্ছি; ও কিন্তু কিছুই ছোঁয় না। খালি দুবেলা দুটো ভাত, 'ফাইল' থেকে যা আসে। আপনি একটু বুঝিয়ে বলে যান ডাক্তারবাবু!

—আমার কথা শোনে কই?

—শুনবে। আপনারে ও খুব মান্যি করে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ডাক্তারের কাজ শেষ হল। নেবু-ঝোপের পাশ দিয়ে পথ। মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন মাস পড়েছে। ফুল এসেছে নেবুগাছে। সকালবেলার তাজা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার মিষ্টি

গন্ধ। কাছেই একটা ঘনপল্লব আমের গাছ। ডালপালাগুলো নুয়ে পড়েছে মুকুলের ভারে। তার উপরে মধু-মাতাল মৌমাছির ভিড়। আকাশ গাঢ় নীল। তার নীচে এই শিশির-স্নিগ্ধ আলো-ঝলমল শীতের প্রভাত। কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, কোলাহল নেই। শুধু খানিকটা দূরে ঐ খাটনি-ঘর থেকে ভেসে আসছে একটানা ডালভাঙার শব্দ ; তার সঙ্গে একটি সুকণ্ঠী মেয়ের মেঠো সুরের গান। সব মিলিয়ে ডাক্তারের তরুণ মনে ফুটে উঠল একটি পরিপূর্ণ সুর।

নেবুগাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল হেনা। ডাক্তারের হঠাৎ মনে হল, বসন্ত-প্রভাতের এই অপরূপ ছবিটির সঙ্গে সে-ও যেন অঙ্গে-অঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ঐ শ্যামল চিক্কণ তনুদেহখানি যদি না থাকত, সমস্ত দৃশ্যটাই বুঝি অপূর্ণ থেকে যেত।

—তুমি এখানে ? বিস্ময়ের সুরে বললেন ডাক্তার। তার মধ্যে ফুটে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা।

—এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম, গম্ভীর কণ্ঠে উত্তব এল।

—দিনটা ভারি সুন্দর, না ?

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, টি-বি-দের যারা নার্স করে সব হাসপাতালেই কি তাদের বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা আছে ?

—সব হাসপাতালের খবর জানি না, আচমকা আঘাতটা সামলে নিয়ে বললেন ডাক্তার, আমার হাসপাতালের কথা বলতে পারি।

—আমি বলতে চাইছিলাম, ঐ খাবারগুলো কি সত্যি সত্যিই আমার দরকার, না ওটা শুধু আমার জন্যে, মানে, আমাকে আপনারা দয়া করেন, তাই হয়তো আপনি—কথাটা শেষ করতে পারল না। কুণ্ঠাজড়িত আয়ত চোখ দুটি তুলে ধরল ডাক্তারের মুখের পানে। সেই দিকে চেয়ে, লজ্জায় সঙ্কোচে মাধুর্যে মণ্ডিত সেই কণ্ঠ শুনে ডাক্তারের বুকের ভিতরটা ব্যথায় ভরে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে গভীর সুরে বললেন, তোমাকে হাতে করে দেবার মতো

আমার তো কিছুই নেই, হেনা! সে উপায়ও নেই। ডাক্তার হিসেবে যেটুকু দিলাম, সামান্য একটু খাবার, তাও যদি না নাও, আমি আর কী করতে পারি!

হেনা জবাব দিল না, তেমনি করুণ চোখে চেয়ে রইল। ডাক্তার আবার বললেন, কিসের জন্যে নিজের ইচ্ছায় এই বিপদের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ, আমি জানি না। হয়তো এর পেছনে কোনো গভীর কারণ আছে। কিন্তু এটুকু জানি, যেমন করে হোক তোমাকে বাঁচাতে হবে। এখানে এই জেলের মধ্যে আমার চোখের সামনে তোমাকে আমি আত্মহত্যা করতে দেব না।

হেনার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আবেগ-কম্পিত স্বরে বলল, কেন? আমার মতো একটা তুচ্ছ মেয়েকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর একান্ত কাছটিতে দাঁড়িয়ে আছে হেনা। ঠোঁট দুখানা কেঁপে কেঁপে উঠছে; চঞ্চল নিশ্বাসে দুলে উঠছে তার উন্নত বুক। সেই চোখ দুটো তীব্র প্রতীক্ষায় তখনো তাঁর মুখের পানে চেয়ে। ডাক্তারের প্রশস্ত বুকের মধ্যে উদ্দাম হয়ে উঠল রক্তস্রোত। আজ হয়তো সে কোনো বাধা মানবে না। কিন্তু না, বাঁধ অটুট রইল। নিজেকে সংযত করে মৃদু-কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, কী লাভ? তা জানি না। হয়তো কোনো লাভই নেই। কিন্তু লাভ-লোকসানের হিসাবটাই কি মানুষের জীবনের সব, হেনা? তার বাইরে আর কিছু নেই? আর কিছু দেখতে পাও না?···বলে, কখনো যা করেন নি, হঠাৎ নত হয়ে ওর ডান হাতখানা তুলে নিলেন নিজের দুটি উত্তপ্ত হাতের মধ্যে। পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে গেলেন।

মুহূর্তকালের একটি নিবিড় স্পর্শ! হেনার সমস্ত শরীর বারংবার শিউরে উঠল। কোনো রকমে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল তার সেই নতুন খাটখানার উপর, যেখানে সাজানো প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে

জড়িয়ে আছে একজনের গভীর প্রাণের স্পর্শ। বালিশে মুখ রেখে চোখের জলের ধারা আর ধরে রাখতে পারল না।

বুড়ী শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। শব্দ শুনে পাশ ফিরেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বার বার বলতে লাগল, কী হল, মা! অমন করছ কেন?

পর পর কয়েক দিন ডাক্তার হাসপাতালে এসে তার নার্সের দেখা পেলেন না। তার জায়গায় দেখলেন আর-একটি মেয়ে। তার নাম কমলা। এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন কী দরকার হয়। তার পর রোগী দেখা যেমনি শেষ হল, সাবানটা এগিয়ে দিয়ে হাতে জল ঢেলে তোয়ালেটা বাড়িয়ে ধরে—এইটুকু তার কাজ। টেবিলের উপর চাপা-দেওয়া টেম্পারেচার-চার্ট হেনার হাতে তৈরী। তাব পাশে তারই হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সংক্ষিপ্ত নোট। তা ছাড়া যা কিছু দরকারী জিনিস, সব যথাস্থানে পরিপাটি করে সাজানো। যেদিকে তাকানো যায়, সর্বত্র তার নিপুণ হাতের চিহ্ন।

সেদিন কাজ সেরে ফিরে যাবার সময় সিঁড়ি থেকে নেমেই ডাক্তার হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের দিদিমণি কোথায়?

কমলা বলল, এই তো ছিল এখানে। বোধ হয় চান করতে গেছে। ডেকে দেব?

ডাক্তার একটু ইতস্তত করলেন; তার পর বললেন, না থাক।

পরদিন ডাক্তার আসবার সময় হতেই হেনা তার কাজ সেবে যথারীতি চলে যাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরোতেই সুশীলাব সঙ্গে দেখা।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—যাচ্ছি একটু ওদিকে।

—এই নে।, ডাক্তারবাবু আসতে পারবেন না। একটা চিঠি দিয়েছেন তোকে।

—আমাকে! কিসের চিঠি? কপাল কুঞ্চিত করে জানতে চাইল হেনা।

—আমি কী জানি, কিসের চিঠি? কী করতে-টরতে হবে, তাই বোধ হয় লিখে জানিয়েছেন। নে, ধর।

ভায়োলেট রঙের মুখবন্ধ খাম। উপরে কোনো নাম নেই। হাতে করতেই হাতটা কেঁপে উঠল। একটু যেন দোলা লাগল বুকের মাঝখানে। কী জানি কী আছে এ চিঠির মধ্যে! খুলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল হেনা। মাথা নেড়ে বলল মনে মনে, না, এ চিঠি সে খুলবে না। যেমন আছে তেমনি ফিরিয়ে দেবে সুশীলার হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি এগিয়েও গেল খানিকটা তাকে ধরবার জন্যে। আবার কী ভেবে ধীরে ধীরে ফিরে এল। খামটার দিকে আরেকবার চেয়ে দেখল। মনের মধ্যে ছুঁয়ে গেল কিসের একটুখানি মৃদু সৌরভ, একটু কিসের মোহময় অনুভূতি। তার পরে আনমনে কখন ছিঁড়ে ফেলল একটি ধার। ছোট্ট একখানি কাগজে সুন্দর করে লেখা কয়েকটি কথা—

"হেনা, তোমার কোনো ভয় নেই। আমার দিক থেকে কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির হও। তোমার পথ থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে নিলাম। দেবতোষ।"

দেবতোষ! বেশ নামটি তো! ডাক্তারবাবুর নাম এই প্রথম জানল হেনা। জানতে ইচ্ছা হয়েছে কত দিন। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। দেবতোষ। মনে মনে আউড়ে নিল নামটা। তার পর আবার পড়ল চিঠিখানা। মনকে বোঝাতে চাইল, এ ভালোই হল। এই মুক্তিই তো চেয়েছিল। এরই জন্যে পালিয়ে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। সহজভাবে একটি বার কাছে এসে দাঁড়াতে পারে নি। দিন কেটেছে ছটফট করে, রাত কেটেছে অস্থির অনিদ্রায়। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে ফিরেছে দুঃসহ গুরুভার। সে ভার নেমে গেল। আজ সে নিশ্চিন্ত,

নিরাপদ। যাকে নিয়ে তার এত দুর্ভাবনা, তিনি নিজের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই আশ্বাসভরা অভয়বাণী—কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির হও।

চিঠিখানা হাতে করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হেনা। মনে মনে বলল, আমি বাঁচলাম। তার পরে এক সময়ে মনে হল, কই মুক্তির হাওয়ায় তার বুকের বোঝা নামল কই? নিভৃত অন্তরের কোণে কে এক অবুঝ বসে রইল মুখভার করে, কে এক লোভী চেয়ে রইল তৃষিত দৃষ্টি মেলে। মনে পড়ল, কত দিন আগে কী একটা বইতে পড়েছিল, এক রকম অসভ্য জাত আছে, পাখির পালক যাদের অমূল্য অলঙ্কার, বনের পথে চলতে চলতে গজমুক্তা কুড়িয়ে পেলে ছুঁড়ে দেয় গভীর জঙ্গলে। আজ সে-ও কি তেমনি মূঢ়ের মতো ফেলে চলে যাচ্ছে না জীবনের সেই পরম রত্ন, সহস্র মুক্তার চেয়েও যা মূল্যবান?

সহসা জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে এল চিন্তার মোড়। না, না। এ কী করছে সে! এই সর্বনাশা মোহজালের মায়া তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। একথা ভুললে চলবে না, সংসারে কিছু পেতে হলে তার দাম দিতে হয়। কিন্তু তার তো কানাকড়িও সম্বল নেই। এই ক্ষুদ্রজীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সব একদিন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু কালি। আজ চারদিকে শুধু অন্ধকার, তার কোথাও নেই একবিন্দু আলোর রশ্মি। অথচ একদিন তার সবই ছিল। নারীজন্মের যেটা পরম সম্পদ, যা দিয়ে সে নিজে সার্থক হয়, অন্যকে সার্থক করে তোলে, অন্য দশ জন মেয়ের মতো সেখানে সে-ও বঞ্চিত ছিল না। তার পর জীবনের বাইশটা বছর কাটতে না কাটতেই সংসারের সহজ সরল পথ থেকে কে তাকে নির্মম হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল! তবু তো আশার মৃত্যু নেই, লোভের শেষ নেই। সব গেছে তবু স্বপ্নের ঘোর কাটে না। বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

দুই

কমলা অসুখে পড়ল। পড়বার কথা অনেক আগেই। বহু চেষ্টায় নিজেকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারল না। ব্যথাটা প্রথমে ছিল তলপেট আর কোমর জুড়ে। ক্রমে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। পায়ের গাঁটগুলো যেন পাকা ফোড়া। একটু জোরে হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে, ধড়ফড় করে বুক। দেহে রক্ত নেই, চোখের কোলে কালি, গাল দুটো ফ্যাকাশে। চুল উঠে যাচ্ছে গোছা-গোছা, গায়ের ফরসা রং তামাটে হয়ে যাচ্ছে। বয়সে হেনার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই বরং হবে। কিন্তু কোথাও কোনো লাবণ্য নেই, শ্রীহীন শীর্ণ দেহের সীমান্ত থেকে দ্রুত মুছে যাচ্ছে যৌবনের রেখা।

হেনার চোখে পড়েছে অনেক আগেই। অন্যান্য মেয়েদেরও নজর এড়ায় নি। কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, কেউ বা সস্নেহ উৎকণ্ঠায় জানতে চেয়েছে নানা কথা। কমলা একটুখানি হাসি দিয়ে এড়িয়ে গেছে, কিংবা যা হোক একটা সংক্ষিপ্ত জবাব। সেদিন একলা পেয়ে চেপে ধরল হেনা, ব্যাপার কী বল তো ?

—কিসের ভাই ? জানতে চাইল কমলা।

—শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন দিন দিন ?

—তাই না কি ? কই, আমি তো বুঝতে পারছি না। ওটা তোমার চোখের ভুল, হেনাদি। মোটা আমি কোনো কালেই ছিলাম না।

হেনা রাগ করে চলে গেল।

দু-তিন দিন পর বিকাল বেলা খাটনি-ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুশীলার চিৎকার শুনে ঢুকে পড়ল।

—কী হল মাসীমা ?

—হল আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই দেখো খাটনির ছিরি। মোটে তো আধ মণ ছোলা। তার এই অবস্থা। এ ছাই ঝাড়েই বা কে, আর বাছেই বা কে ? গুদামীবাবুকে এখন কী বুঝ দিই বলো। সে তো আমাকেই ধরবে।

—কার খাটনি এটা ? আধভাঙা ছোলাগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হেনা।

—কার আবার ? তোমাদের কমলমণির।

রেগে গেলে সুশীলা প্রত্যেকের নামে ঐ রকমের একটা সাদর অলঙ্কার জুড়ে দিত। কমলা হত কমলমণি, জ্ঞানদা হত জ্ঞানুরানী। হেনা হাসি চেপে বলল, কোথায় গেল সে ?

কয়েক জন মেয়ে জাঁতায় ডাল ভাঙছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, যাবে আব কোথায় ! নম্বরে গিয়ে লম্বা হয়েছে।

হেনা বলল, আহা, বেচাবা ! শবীরটা ওর ভালো নেই। তাই নিয়েই কাজ করছিল। আজ বোধ হয় আব পেরে ওঠে নি !

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শরীর ভালো না থাকে, 'সিকমান' গেলেই তো হয়। আমি এ পিণ্ডি নিয়ে এখন কী করি !

—আপনি সরুন, আমি ভেঙে দিচ্ছি। এ আর কতক্ষণ লাগবে ?

—থাক, তোমাকে আর এ সব করতে হবে না।

এত দিন তো করে এলাম। কদিন নার্সগিরিতে প্রমোশন পেয়েছি বলে কি এই কটা ছোলা পিষতেও পাবব না ?

কয়েক জন মেয়ের চোখে চোখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, ওকে মানা করুন, মাসীমা। ডাক্তারবাবু জানতে পারলে আপনার আর রক্ষা নেই।

হাসির রোল উঠল ঘরের একটা কোণ জুড়ে। সুশীলার অগ্নি-দৃষ্টি পড়ল সেই দিকে। কিন্তু হুঙ্কার ছাড়বার আগেই চাপা গলায় বাধা দিলে হেনা, থাক মাসীমা।

আজকার মতো এমনি প্রকাশ্য রূপ না নিলেও ইঙ্গিতটা যে কিছু দিন থেকেই ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধছে, হেনার সে কথা অজানা ছিল না। ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালে যেতে-আসতে, স্নানের লাইনে, খাবার শেডে এখানে-ওখানে হঠাৎ নজরে পড়েছে দু-চারটি মেয়ের ছোটখাটো জটলা। তাকে দেখতে পেয়েই ফিক করে হেসে দিয়েছে কেউ, কিংবা চিমটি কেটেছে একজন আর-একজনের গায়ে। কথা চলেছে চোখের ইশারায়। তাদের এই নীরব আলোচনার লক্ষ্য কে এবং বিষয়টা কী, হেনার বুঝতে কষ্ট হয় নি। না-বোঝার ভান করে নিজের কাজে চলে গেছে। কিন্তু একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারে নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এর একটা জবাব দেওয়া দরকার। মুখ বুজে সহ্য করলে দুর্নামের মুখ বন্ধ হয় না। তারপর অনেক ভেবে আর অগ্রসর হয় নি। প্রবৃত্তিও হয় নি। মনকে বুঝিয়েছে, নোংরা জিনিস ঘাঁটলেই তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যায়। আজও তাই কোনো কথা না বলে সহজভাবেই সে কমলার জাঁতার পাশে গিয়ে বসল। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটাকে মন থেকে সরাতে পারল না। একে আশ্রয় করেই তার জীবনের এই নতুন কটা দিন তাদের আনন্দ, বেদনা, লজ্জা ও গৌরবের পসরা নিয়ে ঐ জাঁতাটার মতোই যেন তার অন্তরের নিভৃতলোকে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

'স্টপ-ওয়ার্ক' অর্থাৎ দিনের মতো কাজ শেষ করবার ঘণ্টা পড়ে গেছে। একটু পরেই খাবার আসবে, এবং নিশি না আসতেই নৈশ ভোজনের ফাইল বসবে। মেয়েরা সব বাইরে উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা মাঠে কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বিশ্রাম করছে। অল্পবয়সী যারা, জমাদারনীর দৃষ্টি এড়িয়ে ওরই মধ্যে একটু ছুটোছুটি করবার চেষ্টা করছে। নির্জন ব্যারাকে চুপ করে শুয়ে আছে কমলা। হেনা গিয়ে বসল তার পাশটিতে। পাতলা রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, কদিন থেকে বলছি, কী হয়েছে খুলে বল। ডাক্তার দেখা।

কমলা চমকে উঠল, ডাক্তার! না দিদি, ও-কথা বোলো না। সে আমি পারব না।

—কেন? ডাক্তার খেয়ে ফেলবে তোকে?

হেনার একটা হাত নিজের শীর্ণ হাত দুটির মধ্যে নিয়ে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলল কমলা, তুমি জান না হেনাদি, এ রোগ কাউকে মুখ ফুটে বলা যায় না।

হেনার চোখের উপর থেকে যেন একটা পরদা উঠে গেল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আর কাউকে না বলিস, ডাক্তারকে লজ্জা করলে চলবে কেন?

—না ভাই, অন্য ডাক্তার হলে যদি বা হত, কিন্তু ওঁর কাছে! ছিঃ—বলে জিভ কেটে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

—কেন, ওঁকে তোর ভয় কিসের?

—ভয় নয় ভাই, সে যে কী, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। ওঁর চোখ দুটো দেখেছ তো? যখন তাকান, মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ে। বাপ রে! ওঁর কাছে কখনো বলা যায় এই সব নোংরা কথা!

হেনা উত্তর দিল না। তার চোখের উপর ভেসে উঠল দেবতোষের সেই দেবোপম মুখখানা। উদার আয়ত দুটি আত্মভোলা চোখ। ঠিকই বলেছে কমলা। মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ে। ইচ্ছা করে, ঐ পা দুটির উপর নিজেকে লুটিয়ে দিই। নিজের বলে যেন আর কিছু বাকী না থাকে। বুকের ভিতরটা কোন অজানা বেদনায় টনটন করে উঠল। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে, দিনশেষের রক্ত-রঞ্জিত আকাশের দিকে।

—হেনাদি, মৃদু কোমল স্বরে ডাকল কমলা।

—কী?

—একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?

চোখ ফেরাল হেনা। ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তরল কণ্ঠে বলল. কী বল না? মনে করব কেন?

—তুমি ভুল করছ, হেনাদি।

কমলার হাতের মধ্যে তার হাতখানা কেঁপে উঠল। ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, তার মানে ? কিসের ভুল ?

—আমি সব জানি দিদি। ভুলে যাও কেন, আমিও তোমারই মতো মেয়েমানুষ !

—তুই কী জানিস ? কতটুকু জানিস ?

সবটুকুই জানি। কটা দিন তুমি সামনে যাও নি ; তখন যদি ওঁকে দেখতে একবার ! আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি, ওঁর হাত দুটো কাজ করছে, আর চোখ দুটো খুঁজছে তোমাকে। এমন করে দুঃখ দিয়ে আর দুঃখ পেয়ে লাভ কী ?

—সে তুই বুঝবি না, কমলা।

—খুব বুঝব ! আমি ছেলেমানুষ নই। তা ছাড়া—হঠাৎ থেমে গেল কমলা। একটু ইতস্তত করল। তার পর বলল, তা ছাড়া, এ জিনিস তো আমার অচেনা নয়, ভাই—বলে একটু হাসবার চেষ্টা করল। হেনার বিস্মিত দৃষ্টি পড়ল তার মুখের উপর, সেটা লক্ষ্য করে বলল কমলা, তোমার কাছে লুকোব না, দিদি, আমার সব কথাই তুমি শুনতে পাবে। কিন্তু সে আরেক দিন। আজ তোমার কথা শুনব। বলো, কেন সাড়া দিচ্ছ না তুমি, কোথায়, কিসে তোমার বাধা।

হেনা জবাব দিল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে হাসি মুখে আবার প্রশ্ন করল কমলা, আর কারো কাছে বাঁধা পড়েছ কি ?

হেনা স্মিতমুখে জবাব দিল, না রে, না। বাঁধা পড়ব আবার কোথায় ?

তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অস্ফুট-স্বরে বলল যেন তার আপন মনের প্রশ্নের উত্তরে, আমি যে আমার নিজের কাছেই বাঁধা। শুধু এই জেলখানার কালো পাঁচিলের মধ্যে

নয়, আমি বাঁধা পড়ে আছি আমার নিজেরই জীবনের কালো গণ্ডীর মধ্যে, যে জীবন পেছনে ফেলে এলাম। আমার কি আর সাড়া দেবার উপায় আছে রে?

—কী জানি ভাই, তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলল কমলা, তোমার এ সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি শুধু বুঝি, যে দিন ফেলে চলে এলাম, তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে কী লাভ? যে গেল সে গেল। তার ওপর আবার কিসের টান? নতুন ডাক যদি এল, তাকে ফিরিয়ে দিতে যাব কেন? কোন দুঃখে, কিসের অভিমানে? তোমার পথ চেয়ে তো কেউ বসে নেই?

হেনা হাতেব উপর চিবুক রেখে নিঃশব্দে বসে ছিল। কমলার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। শুধু তার শেষ কথাটা শুনে ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটে উঠল একটুখানি বাঁকা হাসি। কমলা আবার বলল, আজ হোক, কাল হোক, এই জেলের বাঁধন তোমার শেষ হবে। তারপর? জীবনভোর শুধু ভেসে বেড়াবে? তোমার এই বয়স, এই রূপ, এই প্রাণ, এই ভালোবাসা, সব বৃথা হয়ে যাবে? তাতে করে কার কী উপকারটা হবে শুনি?

—কিন্তু তোর ঐ চোখ দিয়ে আমাকে যা দেখছিস, সেইটুকুই তো আমার সব নয়, পাগলী! পেছনে যা পড়ে রইল তাকে ঢেকে রাখি কী করে? কী করে ভুলি, কোথায় এলাম, কোত্থেকে, কোন পথ ধরে এলাম? আমি যদি বা ভুলি, গোটা সংসার তা ভুলবে না, ভুলতে দেবে না।

—চুলোয় যাক তোমার গোটা সংসার। যার ভোলবার সে যদি ভুলে থাকে, বাকী সব নিয়ে তোমার কিসের ভাবনা?

—সেই জন্যেই তো আরো বেশী ভাবনা। শুধু ভাবনা নয়, ভয়। বলতে বলতে হেনার চোখে-মুখে ফুটে উঠল যেন কোনো আতঙ্কের ছায়া। স্বর নামিয়ে বলল, তাই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কাছে যেতে পারি না।

কমলার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কিসের ভয় হেনাদি?

—না, না, আমার নিজের জন্যে নয়, ভয় ওঁর জন্যে। ওঁর সম্মান, ওঁর মর্যাদার জন্যে আমার আশঙ্কা। ওঁকে বঞ্চনা করছি, এই ভেবে আমার ভাবনা।

কমলার মুখে এ কথার কোনো উত্তর এল না। নির্বাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই চোখের দিকে। স্নেহ এবং উৎকণ্ঠায় ভরা অপরূপ দুটি চোখ। হেনা লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে সহজ সুরে বলল, আচ্ছা, আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। তুই পারতিস? এত যে বড় বড় বক্তৃতা করছিস, তুই কী করতিস বল তো?

—আমি? হেসে ফেলল কমলা। আমার কী আছে? কে আছে? আমি যে ফুরিয়ে গেছি, দিদি! আমার আর কিছু নেই। তা যদি না হত, আমি যদি তুমি হতাম, আর আমার জীবনে আসত এমন কেউ, তুমি কি মনে কর, তখনো তোমার মতো পেছনের দিকে চেয়ে শুধু বড় বড় নিশ্বাস ফেলতাম? কখখনো না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। আমার যে অনেক চাই, ঘর চাই, আশ্রয় চাই। এক জন চাই, যাকে ধরে দাঁড়াতে পারি, যার হাত ধরে চলতে পারি। সে এল, আর আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম, এত বড় দুর্মতি আমার কোনো দিন হত না।

দুর্বল শরীরে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে কমলা হাঁপাতে লাগল। হেনা আর কথা বাড়াল না। শুধু নিঃশব্দে তার শীর্ণ হাতখানার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই স্পর্শ-টুকু দিয়েই বোধ হয় অনুভব করল এই রোগজীর্ণা বঞ্চিতা নারীর একান্ত অন্তরের অত্যুগ্র গোপন-কামনা, যা হয়তো চিরদিন অপূর্ণ থেকে যাবে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তার পর কমলা যখন অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে, স্নেহার্দ্র মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ঘর বাঁধবার তোর বড্ড সাধ, না রে কমলা?

—বাঃ, সাধ হবে না? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কমলা। ঘর বাঁধব বলেই তো ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুটল এই শ্রী-ঘর—বলে হেসে ফেলল।

হেনা সে হাসিতে যোগ দিল না। গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল জানালার বাইরে।

বুড়ী অনেকখানি সেরে উঠেছে। জ্বর বন্ধ হয়ে গেছে। কাশি আছে, কিন্তু তার মধ্যে নেই সেই মারাত্মক রক্ত-কণা। ওজন বেড়েছে। খানিকটা বলও এসেছে দেহে। একটু-আধটু উঠে-হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে যে সব আণবিক মহারথীর দল তার ফুসফুসে হানা দিয়েছিল, তারা খানিকটা হটে গেলেও এখনো পুরোপুরি দখল ছেড়ে দেয় নি। ডাক্তার যথারীতি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন আর রোজ নয়, মাঝে মাঝে এসে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সিরিঞ্জ চালনা করেন। হেনার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। তিনি আসবার আগেই সে হাসপাতালের যেটুকু কাজ চটপট শেষ করে চলে যায় খাটনি-ঘরে। কারো হাত থেকে জাঁতা টেনে নিয়ে মটর বা অড়হর ভাঙতে বসে। কখনো কোনো নতুন মেয়েকে ধরে শিখিয়ে দেয় ডাল ঝাড়ার কৌশল। সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুই এখানে কী করছিস? পালা। নিজের কাজে যা।

—হুঁ, ভা-রি তো আমার কাজ! কখন সেরে ফেলেছি।

কোনো কোনো দিন আবার জাঁতা না ঘুরিয়ে কাঁথা সেলাই করে সুশীলার নাতনীর জন্যে, কিংবা বুনতে বসে তার নাতির গায়ের সোয়েটার।

সেদিনও সকাল আটটার মধ্যেই তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজটুকু সেরে নিচ্ছিল। মোনার মার বুকে তেল মালিশ করছে, এমন সময় সুশীলা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। এসেই বলল, তোর টিকিটখানা দে তো, হেনা!

—টিকিট কী হবে?

—দে না? বোডে যাবে।

—সে আবার কী?

—'বোড্'। 'বোড্' শুনিস নি! কী করেই বা শুনবি? ছোট জেলে ছিলি। সেখানে তো এসব কাণ্ড নেই। বোড্ বসে খালি আমাদের মতো 'সেণ্টার' জেলে।

উৎসাহের ঝোঁকে যা কোনো দিন করে নি সুশীলা, তাই করে বসল। চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকে পড়ল বুড়ীর ঘরের মধ্যে; স্কার্টটা উঁচু করে, যথাসম্ভব ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

হেনা বলল, বসুন না ঐ চেয়ারটায়।

সে কথার জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে শুরু করল জমাদারনী, বোড্ কী জানিস? কোলকাতা থেকে জেনারেল সায়েব আসে। এখান থেকে আসে কালেকটর সায়েব, জজ সায়েব, আরো সব কারা কারা। আমাদের সায়েবও থাকে। সবাই মিলে টিকিট আর কী সব কাগজ-পত্তর দেখে ঠিক করে কোন্ কোন্ কয়েদীকে খালাস দেওয়া হবে।

—মেয়াদ শেষ হবার আগেই? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল হেনা।

—আগে মানে? অনেক আগে। অর্ধেক মেয়াদ খাটতে হয় নি, বেরিয়ে গেছে কত লোক।

বুড়ীও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল জমাদারনীর এই বোডতত্ত্বের ব্যাখ্যা। সাগ্রহে বলে উঠল, হ্যাঁ মা, সবাইকেই ছাড়ে তো? আমিও ছাড়া পাব?

—হ্যাঁ; তা আর পাবে না! শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে মুখ বিকৃত করে উত্তর দিল সুশীলা। দিব্যি শুয়ে শুয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম মাংস দুধ মাখনের শ্রাদ্ধ করছ! সরকারের কত বুড উপকারটি করছ তুমি! তোমাকে না ছাড়লে আর ছাড়বে কাকে?

ভারী লজ্জিত হল মোনার মা। শুকনো মুখখানা কালো হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে চুপ করে পড়ে রইল। হেনা বিরক্ত

হল, দুঃখিতও হল বুড়ো মানুষের উপর এই রূঢ় ব্যবহারে। কিন্তু কয়েদীর সামনে জমাদারনীর আচরণ নিয়ে তো কিছু বলা যায় না! সুশীলা ও সব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে আগের সূত্র ধরেই বলল, সোজা ব্যাপার না কি! যে সব ভারী মেয়াদী লোক বরাবর পুরো খাটনি দেয়, ভালোভাবে থাকে, টিকিটে একটাও রিপোর্ট নেই, তারাই কেবল এ সুবিধা পেতে পারে। তার মধ্যেও আবার বাদ আছে। ডাকাতি, জাল-জোচ্চরি, মেয়েমানুষের ওপর অত্যাচার—এ সব কেস-এ যাদের সাজা হয়, তারা কেউ বোড-এ যেতে পারে না।

হেনা অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শেষ কথাটা কানে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, তবে আমি যাব কেমন করে?

—শোনো কথা! তুই কি ডাকাত না জালিয়াত, যে—কথাটা শেষ না করেই ফিসফিস করে বলল সুশীলা, ডেপটিবাবু তোকে বাদ দিয়েই রেখেছিল। আমার ওয়ার্ড থেকে এক ফুলবানু ছাড়া আর কারো নাম দেয় নি। তার পর জেলারবাবু হুকুম দিলেন, হেনার টিকিটও নিতে হবে।

এত বড় একটা চাঞ্চল্যকর শুভ সংবাদ গোপনে শুনিয়ে হেনার কাছ থেকে কিছুটা কৃতজ্ঞতা অন্তত আশা করেছিল সুশীলা। মুখে কিছু না বলুক, আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় মুখখানা যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। সেইটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কই? উৎসাহের কিছুমাত্র চিহ্নও সেখানে দেখা গেল না। হেনাকে সে সত্যিই স্নেহ করে। তাই শুধু বিস্মিত নয়, ব্যথিতও হল সুশীলা। হেনা উঠে গিয়ে টিকেটখানা এনে তার হাতে দিতেই সে নিঃশব্দে প্রস্থান করল। ভাবতে ভাবতে গেল, সংসারে দুর্বোধ্য যদি কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে এই সব লেখা-পড়া-জানা অল্পবয়সী মেয়েগুলোর মন-মেজাজ

সুশীলার স্কার্ট-জ্যাকেট-জড়ানো বিশাল বপুখানা ধীরে ধীরে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হেনা সেই দরজার মুখটাতেই

দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দের মতো। সমস্ত মন ছেয়ে রইল জমাদারনীর ঐ 'বোড' অর্থাৎ তার সম্ভাব্য খালাসের আতঙ্ক। এ তো মুক্তি নয়, অন্তহীন শূন্যতা। সে দিকে চাইলে চোখে পড়ে শুধু একটা অতল-স্পর্শী গহ্বর, যার মধ্যে না আছে আশ্রয়, না আছে কোনো অবলম্বন। জেল-গেটের ওপারে যে জগৎ, তার সমস্ত দুয়ার তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা আছে শুধু পথ আর তার খর রৌদ্রের জ্বালা। তার ডাইনে বাঁয়ে হাত বাড়িয়ে নেই কোনো স্নেহনীড়, আঁচল বিছিয়ে নেই কোনো গৃহাঙ্গণ। তার চেয়ে কি অনেক বেশী আপনার নয় এই প্রাচীরঘেরা জেনানা ফাটক! এইখানে এই নেবুগাছের ছায়ায় এমনি স্বচ্ছন্দ নির্বিবাদে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না? যদি যেত, তার চেয়ে বড় তার আর কোনো কাম্য নেই। কিন্তু একথা তো কাউকে বলা যায় না। কে বিশ্বাস করবে? সঙ্গিনীরা বুঝবে না, কেউ হেসে উড়িয়ে দেবে, কেউ আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে বলবে, ন্যাকামি! সুশীলা তাকে ভালোবাসে। তাকে বলতে গেলে লাভ হবে শুধু তিরস্কার। আর জেলর-সাহেব? তিনি নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন। হয়তো ভাববেন, এ শুধু তার জিদ, শুধু একগুঁয়েমি, মিথ্যা মর্যাদার ধূয়া তুলে স্নেহের দানকে প্রত্যাখ্যান। প্রকারান্তরে বলা, জেল খাটতে এসেছি, খাটতে দাও। তোমাদের দয়া চাই না, চাই না তোমাদের অনুগ্রহ। না, না; সেখানে সে যেতে পারবে না। কিন্তু আর-এক জনকে বলা যায় না? তিনি হয়তো বুঝবেন তার একান্ত মনের কথা। কিন্তু বলবে কেমন করে? ছিঃ, কী ভাববেন তিনি?

গাছের আড়াল থেকে যেন ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ফুলবানু। হাসিভরা মুখ। হেনা তাড়াতাড়ি নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের মধ্যে, এগিয়ে গিয়ে ফুলবানুর হাতটা ধরে তরলস্বরে বলল, খুব খুশী দেখছি যে আজ?

—খুশী হব না? নিজেকে দিয়েই বুঝতে পার! একসাথেই তো যাচ্ছি।

—বেশ ; তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠব।

—সে তো আমার ভাগ্যি, দিদিমণি! কিন্তু আমাদের মতো গরিবের ঘরে—

—আমার মতো এই এত বড় একজন বড়লোক, বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল হেনা।

ফুলবানুও হাসল। তার পর হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, আচ্ছা, কবে ছাড়বে আমাদের ? ছেলে দুটোকে কত কাল দেখি নি। বড্ড ছটফট করছে মনটা।

—শুধু ছেলে দুটো ? তাদের বাপের জন্যে নয় বুঝি ?

ফুলবানুর মুখের উপর ফুটে উঠল একটুখানি ম্লান হাসি। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিলিয়ে গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কী জানি কী দেখব গিয়ে ? অ্যাদ্দিনে হয়তো একটা নিকে করে বসে আছে। দেশে তো পোড়া মেয়েমানুষের আকাল নেই। আমার কপালে আবার সেই লাথি-ঝ্যাঁটা।

হেনা সান্ত্বনার সুরে বলল, না, না। এ তোমার মিথ্যে ভয়, ফুলবানু! নিকে অমনি করলেই হল ?

—করলেই বা ঠেকায় কে ? এদের কাছে আমরা তো হাঁড়িকুঁড়িব সামিল। পুরোনো হলেই ফেলে দিয়ে নতুন নিয়ে আসবে।

—তাই যদি হয় তুমিই বা লাথি-ঝ্যাঁটা খাবে কোন দুঃখে ? ছেলের হাত ধরে চলে যাবে ; ঘর বাঁধবে নতুন লোকের সঙ্গে। তোমাদের সমাজে সেটা দোষের নয়। আইনেও কোনো বাধা নেই।

ফুলবানু নিশ্বাস ফেলে বলল, বাধা নেই বলেই কি সব কিছু পারা যায়, দিদি ? ওরা পুরুষ মানুষ ; ওরা পারে। আমরা পারি না।

ফুলবানু ওয়ার্ডে ফিরে যাবার পরেও হেনার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল তার সেই শেষ কথাটা—ওরা পারে, আমরা পারি না। কেন পারি না ? নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করল হেনা।

দুর্বল বলে? অসহায় বলে? দৃশ্যত হয়তো তাই। কিন্তু তার মূল কারণ জড়িয়ে আছে, নারী বলে বিধাতার যে আজব সৃষ্টি, তার প্রকৃতি, তার অস্থিমজ্জার মধ্যে। একদিন হয়তো আসবে, যখন তার এই বাইরের অক্ষমতা আর থাকবে না। অর্থে, সামর্থ্যে, জ্ঞানে, গরিমায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, নারী হবে পুরুষের সমকক্ষ। তখনো হয়তো তাকে ফুলবানুর মতো নিশ্বাস ফেলে বলতে হবে—ওরা পারে, আমরা পারি না। যত ভালোই বাসুক, স্বামীর কাছে স্ত্রী তার নর্ম-সহচরী। কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামী তার মর্ম-সহচর। একে অন্যকে যখন ছেড়ে যায়, পুরুষের চোখ ফেটে যদি জল ঝরে, নারীর বুক ফেটে ঝরে রক্ত। পুরুষের প্রেম তার আত্মদান, আর নারীর প্রেম তার আত্মবিলোপ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে ফুলবানুর জাত চিরদিন কেঁদে এসেছে, চিরদিন কাঁদবে।

তিন

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, জেলের মধ্যে তার মোহনাটা অতি স্পষ্ট। সন্ধ্যা সেখানে ধীরে ধীরে রাত্রির মধ্যে মিলিয়ে যায় না, রাত্রি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে। একের বিদায় যেমন আচমকা, অন্যের আগমন তেমনি আকস্মিক।

দিনের রুটিন শেষ হয়ে গেছে। জেলের ভিতরকার রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। চারদিকে হাঁকডাক ছুটোছুটি। মুহূর্ত-কয়েকের ব্যবধান। হঠাৎ দেখা গেল, সব ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। পথ শূন্য, মাঠ নিস্তব্ধ, ঘাট জনহীন। বিশাল ওয়ার্কশপগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরীর মতো। খাঁ-খাঁ করছে রান্নাঘর, খাবার হল, স্নানের লাইন। সন্ধ্যার কোলাহল সহসা থেমে গেছে, নেমে এসেছে রাত্রির স্তব্ধতা।

দীর্ঘ ব্যারাকগুলোর ভিতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা এক-টানা গুঞ্জন। নির্জন রাস্তায় এখানে-ওখানে লণ্ঠন ঝুলিয়ে পাহারা দিচ্ছে রাতের সিপাই। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিচ্ছে, আ—স্তে। কেউ হাঁকছে, মুখ বন্ধ্। সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে গুঞ্জনের সুর। আবার ধীরে ধীরে চড়তে থাকবে তার পরদা। মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠবার আগেই গর্জে উঠবে সিপাইবাবুর দ্বিতীয় হুঙ্কার।

আফিস মহলের চেহারা অন্য রকম। জেলর ও সুপাবের ঘরে তালা ঝুলছে। কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকটায় ডেপুটি এবং কেরানী-বাবুরা যেখানে বসেন, সে ঘরগুলো রীতিমত সরগরম। উজ্জ্বল বিজলি বাতির নিচে টেবিলে টেবিলে নানা আকারের খোলা রেজিস্টার। তার পাশে যাঁরা জমিয়ে বসেছেন, তাঁদের হাতে কলম, মুখে সিগারেট, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে খোশ খবরের বুকনি। বাইরেকার লৌহ-তোরণ পার হয়ে ভিতরের দিকে যে বিরাট কাঠের গেট তার বুকে রাত্রির মতো তালা পড়ে গেছে। দরকারমত খোলা যাবে পাশের দিকে বসানো একটা ছোট্ট দরজা, যার নাম উইকেট গেট। আকারে ছোট হলেও তার প্রতাপ ছোট নয়। খোলা এবং বন্ধ করার শব্দে গোটা আফিস সজাগ হয়ে ওঠে।

আসর বেশ জমে উঠেছে। সেই উইকেট গেট খোলার সাড়া পাওয়া গেল। অনেকেই উৎকর্ণ হলেন। প্রত্যাশিত ব্যক্তিই বটে। গলায় স্টেথোস্কোপ-পরা ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ, পিছনে তাঁর কম্পাউণ্ডার। বাবুদের কারো কারো মুখের উপর খেলে গেল নীরব হাসির চমক। বাক্যের স্রোতে দেখা গেল সাময়িক ভাটার টান। সামনেকার গেট খোলা এবং বন্ধ করার ঝনৎকার শোনা যেতেই আবার সবাই নড়েচড়ে বসলেন। আমদানি দপ্তরের সাদেক হোশেন বলল, বড্ড মুসড়ে পড়েছে যেন মনে হল।

কোণের দিক থেকে কে একজন যোগ করল, তেমন সুবিধে হচ্ছে না বোধ হয়।

—আরে, না, না। সুবিধা ঠিকই আছে। মান-অভিমানের পালা চলছে ; এর পরেই ভাব-সম্মেলন। বৈষ্ণব কবিতা পড় নি ? উত্তর দিলেন গজেনবাবু। তৃনম্বর ডেপুটি বরেন রায় বললেন, লোকটার একটা বিয়ে-থার ব্যবস্থা করুন, দাদা! শেষটায় একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারি না করে বসে। সিনিয়র ডেপুটি রিলিজ ডায়রি লিখছিলেন। খাতা থেকে মুখ না তুলেই বললেন, জানা-শোনা মেয়ে আছে না কি তোমার হাতে ?

—রক্ষে করুন। থাকলেও ওর হাতে দেবার আগে জলে ডুবিয়ে দেবার পরামর্শ দিতাম। কী টেস্ট দেখুন লোকটার! একটা কনফার্মড ক্রিমিনাল, বলতে গেলে রাস্তার মেয়ে। তাকে নিয়ে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুই হলি একটা ডাক্তার, লেখাপড়া শিখেছিস, সরকারী চাকরি করছিস, বংশের একটা মান আছে।

গজেনবাবু বললেন, আরে মশাই, এর নাম হল লভ, কবিরা বলেছেন প্রেম-তৃষা, যার ঠেলায় লোকে নর্দমার পাঁক তুলে মুখে দেয়, আর এ তো—

—নর্দমা ঝরনা হতে কতক্ষণ ? বাধা দিয়ে বললেন সিনিয়র, সেই চেষ্টাই হচ্ছে, জান না বুঝি ?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সকলেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সিনিয়র বুঝিয়ে দিলেন, অ্যাডভাইসরি বোর্ডে নাম গেছে। খালাস হয়ে গেলে আর পায় কে ? কয়েদী তো গায়ে লেখা থাকে না ?

—বোর্ড ছাড়তে বলবে মনে করেন ? প্রশ্ন করলেন বরেনবাবু।

—আমার তো মনে হয় না। আর বললেও গভর্মেণ্ট শুনবে কি না সন্দেহ! ঐ রকমের হেনাস অফেন্স! তারপর জেল-রেকর্ডও ভালো না। প্রেসিডেন্সি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ডিস্ট্রিক্ট জেলে। সেখানেও পানিশমেণ্ট আছে গোটা কয়েক।

কে একজন বলল, কিন্তু এখানে তো বেশ ভালোভাবেই আছে। কোনো রিপোর্ট হয় নি।

—তার মানে সুশীলাটা যে ভেড়া। সব মেয়েগুলো কাঁধে চড়ে নাচে, কিচ্ছু বলে না। ওখানকার ফিমেল ওয়ার্ডার কড়া লোক। ওর সঙ্গে বনত না একেবারেই। তাই এখানে এসে জুটেছে।

—কোন জেল? জানতে চাইলেন গজেনবাবু।

—ফরিদপুর।

—ফরিদপুর! ও-ও! সেখানকার জমাদারনীও এক দারুণ চীজ।

—কী রকম? কৌতূহলী হলেন শ্রোতার দল।

গজেনবাবু বললেন, ডিউটিতে এসেই তিনি দিব্যি বিছানা-টিছানা করে শুয়ে পড়বেন। তারপর চলবে অঙ্গ-সেবা। একসঙ্গে দুটো মেয়ে। একজন পায়ের দিকে, আর একজন মাথার দিকে। তাও যাকে-তাকে দিয়ে চলবে না। বয়স কম হবে, দেখতে-শুনতেও ভালো হওয়া চাই। তা ছাড়া পছন্দমত মেয়ে পেলে—

—বলুন না? থামলেন কেন? সাগ্রহে এগিয়ে এল ছোকরা-মত একজন কেরানী।

—সে সব কি এখানে বলা যায়? দাদা বসে আছেন।

—দাদার খাতিরে বাকীই বা কী রাখলে শুনি? মন্তব্য করলেন সিনিয়র। শুধু ফরিদপুর কেন, ও সব প্রেমলীলা সব জেলেই আছে। পুরুষে পুরুষে যেমন চলে, মেয়েতে মেয়েতেও তেমনি। জমাদার, জমাদারনীরাও মাঝে মাঝে অংশ নিয়ে থাকেন।

সাদেক বলল, তাহলে একে নিয়েও বোধ হয় সেই রকম একটা কিছু হয়ে থাকবে। জমাদারনী সুবিধে করতে পারে নি। এ-ও তো চীজ কম নয়!

—চীজ কম নয়, তুমি জানলে কী করে? পরখ-টরখ করে দেখেছ নাকি? অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন গজেনবাবু।

—না, দাদা। সে সুযোগ আর হল কই? সুযোগ হলেও, সত্যি বলতে কি, সাহস হয় নি। তা ছাড়া রুই-কাতলা যেখানে ঘায়েল হয়ে গেল, সেখানে আমার মতো চুনো-পুঁটি—

আমি এবার চলি, দাদা, কথার মাঝখানে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বরেনবাবু। একটু বেরোতে হবে। গুডনাইট।

সিনিয়র তার খাতায় মুখ রেখেই বললেন, গুডনাইট।

সাদেক হোশেনকে ঘিরে ধরল সবাই। গজেনবাবু বললেন, তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক হে! একটা থলে হাতে করে বসে আছ! ঝাড়ো ঝাড়ো। ও সব হেঁয়ালি-টেয়ালি ছেড়ে সোজা বাংলায় বলো। কাতলাটি কে?

—সাদেক একেবারে আঁতকে উঠল, সর্বনাশ! সেটা একেবারে স্ট্রিক্‌ট্‌লি কনফিডেনসিয়াল। ভাঙলেই চাকরি যাবে।

—আচ্ছা নাম-ধাম থাক। ব্যাপারটা বলে যাও।

—ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। ঐ মেয়েটা আসবার বোধ হয় দু-তিন দিন পর। টিকিটখানা কী কাজে এসেছিল আমার টেবিলে। কাতলার নজর পড়ে গেল। নামটা পড়া আর শেষ হয় না। তারপর বোধ হয় বয়সটা আরো গোল বাধাল। বুঝলাম কাতলা-বাবুর চোখে ঘোর লেগেছে। ভিতরে ভিতরে খবর রাখতে শুরু করলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। একটা কী ছুতো-টুতো নিয়ে একদিন বিকেল বেলা ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে হাজির। রীতিমত সাজগোজ করে। সুশীলা যখন থাকে, তখন নয়। ছোট.জমাদারনী রানীবালার ডিউটি। তার সঙ্গে বোধ হয় কোনো বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। হেনাকে ডেকে পাঠানো হল। গেট খুলতেই যে দেয়ালের স্ক্রীনটা আছে, তার পাশে।

—জায়গাটি চমৎকার—দলের মধ্য থেকে মন্তব্য শোনা গেল।

—হেনা আসতেই রানীবালা চলে যাচ্ছিল। সে বাধা দিল, আপনি যাবেন না। টোনটা অনুরোধের নয়, একেবারে হুকুমের মতো। রানীবালাকে থাকতে হল। কাতলাও সাহস করলেন না তাকে সরিয়ে দিতে। অত্যন্ত ফরওয়ার্ড মেয়ে। সোজা তাকিয়ে বলল, আমাকে ডেকেছেন, আপনি? কাতলা নার্ভাস। আমতা আমতা

করে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোমার কেসটা মিথ্যা। উকিলের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। মোটামুটি কতকগুলো ফ্যাক্ট্স্ জানতে পারলে তোমার খালাসের জন্য চেষ্টা করতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, ধন্যবাদ! কেসটা মিথ্যা নয়। খালাসের চেষ্টারও দরকার নেই।

কাতলা দ্বিগুণ নার্ভাস। তবু কোনো রকমে বলে ফেললেন, তা ছাড়া, মানে এই ডালভাঙাটা বদলে যাতে অন্য কোনো সোজা কাজ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে আমি সাহেবকে বলব। ভাবছি··

—দরকার হলে আমিই বলতে পারব। তবে, দরকার নেই।

অতঃপর কাতলার প্রস্থান। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আবার একদিন লাক্ ট্রাই করতে ছুটলেন কাতলা-বাবু। রবিবার দুপুর বেলা। সেই দেয়ালের আড়ালেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। খবর পেয়ে হেনা বেরিয়ে এল। নমস্কার করে বলল, ওখানে কেন, এদিকে আসুন না? যেন কত খুশী ওঁকে দেখে। ওয়ার্ক শেডের বারান্দায় একটা মোড়া ছিল। সেখানে নিয়ে বসাল। খাটনি বন্ধ। মেয়েরা সব ওয়ার্ডে ঘুমুচ্ছে। ধারে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাতলার আনন্দ আর ধরে না। হেনাই কথা পাড়ল, বলুন। সেন্ট-মাখা সিল্কের রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললেন কাতলা-বাবু, তোমাকে দেখলে বুঝতে পারি, মেয়ে-কয়েদীদের এই পোশাকগুলো বদলানো দরকার। যেমন মোটা কাপড়, তেমনি বিশ্রী কাটছাঁট। এ বিষয়ে আমরা লিখব। অন্তত তোমার মতো ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের জন্যে—

কথার মাঝখানেই হেনা বলে উঠল, ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে করেন নাকি আমাকে?

কাতলার তীব্র প্রতিবাদ, কী যে বল! তোমাকে, মানে—

হেনা তেমনি শান্ত ভাবেই বলল, কিন্তু আর কোনো অপরিচিত

ভদ্রঘরের মেয়েকে 'আপনি' না বলে যদি 'তুমি' বলে আলাপ শুরু করতেন, আপনাকে কী নিয়ে ফিরতে হত জানেন ?

কাতলার চোখ ছানাবড়া। উত্তরটা হেনাই দিল—অপমান! বলে নমস্কার করে চলে গেল ওয়ার্ডে।

সাদেকের কথা শেষ হতে না হতেই অফিস ফাটিয়ে উল্লাসময় অট্টহাসি এবং তার পিঠের উপর সমবেত চপেটাঘাত। হুল্লোড় থামলে সিনিয়র শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই সরস কাহিনীটি কি সাদেক সাহেবের লেটেস্ট রচনা ?

—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, দাদা, এর প্রত্যেকটি কথা সত্যি।

—সোর্‌স্‌টা জানতে পারি ?

—মীনা বলে যে বি-ক্লাশ মেয়েটা খালাস পেল সেদিন, ঐ যে প্রায়ই জেলে আসে, তারই কাছে শোনা। রানীবালাও স্বীকার করেছে।

—তাই বল ; মাথা নেড়ে বললেন সিনিয়র, এবার বোঝা গেল ডাক্তারের ওপর বরেনবাবুর এত রাগ কিসের—

—এবং আঙুরফলটাই বা এত টক লাগল কেন ? যোগ করলেন গজেনবাবু।

আর একবার হাসির রোল।

এ কাহিনী যে সময়ের, তখনকার দিনেও জেলে জেলে কয়েদীদের জন্যে একটা করে লাইব্রেরি ছিল। বই যা থাকত, দু-চারখানা ধর্মগ্রন্থ বাদ দিলে, বেশির ভাগই নিচু স্তরের, অন্তত সাবালকদের পড়বার মতো নয়। ও জেলে থাকতে ক্যাটালগটা আনিয়ে একবার পাতা উলটিয়ে দেখেছিল হেনা। ভূত-প্রেত, জ্বিন-পীরের কাহিনী, তিন আনা সিরিজের জীবনী কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর অ্যাডভেঞ্চার। আর যা, তার প্রায় সবগুলোই ছেলেবেলায় পড়া হয়ে গেছে আর

বাকীগুলো দুর্বোধ্য। সবে নতুন। জেলখানার হালচাল তখনো রপ্ত হয় নি। তাই বিষয়টা একদিন খোদ সুপার সাহেবের সাপ্তাহিক ফাইল-এ পেশ করে বসল। তিনি জেলর সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন এবং জেলর সাহেব তাকালেন ডেপুটি সাহেব পানাউল্লার দিকে। সে বছর বই কিনবার ভার পড়েছিল তাঁরই উপর এবং তিনি কয়েকখানা আমপাড়া বিষাদসিন্ধু আর বাকী সব ফতিমাবিবির কেচ্ছা ইত্যাদি মূল্যবান সংগ্রহ দিয়ে আলমারি ভর্তি করেছিলেন। হেনার অভিযোগের উত্তরে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, জেলের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর, বাকী প্রায়ই চাষাভুষা, নামমাত্র লেখাপড়া জানে। তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই আমাদের বই কিনতে হয়। দু-চার জন শিক্ষিত বা শিক্ষিতার স্বার্থ দেখলে চলে না।

হেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যারা নিরক্ষর কিংবা সবে পড়তে শিখেছে, তারা লাইব্রেরি দিয়ে কী করবে? লাইব্রেরি জিনিসটাই শিক্ষিত লোকের জন্যে। বই-এর অভাব বোধ করে তারাই। তাদের যা কাজে লাগে, সেই বই-ই রাখা দরকার। তা না হলে লাইব্রেরি করে কী লাভ?

বলা বাহুল্য, একটা সামান্য কয়েদীর কাছ থেকে এরকম স্পষ্ট উক্তি কর্তারা পছন্দ করেন নি। নেহাত মেয়েমানুষ বলে শুধু একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেই প্রস্থান করেছিলেন; ইনসোলেন্স বা ইমপার্টিনেন্সের অপরাধে আর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। এর পরের বার বই কিনবার সময় শোনা গেল, বড় সাহেব লিস্টি তলব করে বসেছেন। তার কিছুদিন পরেই হেনার বদলি হয়ে গেল।

এখানকার ক্যাটালগ দেখে সে কিন্তু অবাক না হয়ে পারেনি। প্রথম দিকের বইগুলো যাই হোক, হাল আমলের সংগ্রহটা চমৎকার। সুশীলার কাছে শুনেছিল, বই নির্বাচনের ভার নাকি তালুকদার নিজের হাতেই রেখেছেন। মাঝে মাঝে দু-একখানা বই সে লাইব্রেরি

থেকে আনিয়ে পড়ত। একদিন একটা নতুন উপন্যাস পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল পেনসিলে লেখা কতকগুলো কুৎসিত কথা।· শুধু এক জায়গায় নয়, মাঝে মাঝেই অমন ধারা অশ্লীল মন্তব্য। গা-টা এমন পাক দিয়ে উঠল যে বইখানা তাকে শেষ না করেই ফেরত দিতে হয়েছিল। তারপর অনেক দিন আর বই আনবার মতো উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সুশীলার পীড়াপীড়িতে আবার একদিন কয়েকখানা বইয়ের নাম লিখে শ্লিপ পাঠিয়ে দিল লাইব্রেরিয়ানের কাছে। সুশীলাকে এ ব্যাপারে নিঃস্বার্থ বলা যায় না। দুপুর বেলা হেনার ঐ মিষ্টি সুরের গল্প পড়া না শুনলে তার ভাত হজম হত না। কোনো কোনো দিন এটা ছিল তার নিদ্রাকর্ষণের ওষুধ। সুশীলা ছাড়া কমলা এবং আরো কয়েকটি মেয়েও ছিল পাঠের আসরের নিয়মিত সভ্যা।

লাইব্রেরির চার্জটা একজন কেরানীবাবুর হাতে থাকলেও কাজকর্ম সব চালাত "রাইটার" অর্থাৎ খানিকটা লেখাপড়া-জানা একজন মাতব্বর কয়েদী। হেনার শ্লিপ পেয়ে খানকয়েক বই পাঠিয়ে·দিল ফিমেল ওয়ার্ডে। পড়তে গিয়ে তাদের একখানার মধ্যেও পাওয়া গেল তেমনি পেনসিলে লেখা অশ্রাব্য উক্তি। কিন্তু এবার আর ওসব গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলল। তারপর একটা পাতা ওল্টাতেই বেরিয়ে পড়ল এক টুকরা কাগজ। সদ্যলেখা প্রেমের কবিতা। তার মধ্যে ভাব ভাষা ছন্দ সবটারই অভাব, অভাব ছিল না শুধু কুরুচির। নাম ধাম উল্লেখ না থাকলেও এটা যে তারই উদ্দেশে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। মাথার ভিতরটা হঠাৎ ঝাঁ করে উঠল। কবিতার শেষে লেখক তার নামটাও প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা হল জেলর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয় কাগজখানা। তারপর ভাবল, কী লাভ হবে তাতে? আরো খানিকটা ঘুলিয়ে উঠবে পাঁক। একবার মনে হল আর কারো নজরে পড়বার আগে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ঐ নোংরা জিনিসটা স্পর্শ

করতেও প্রবৃত্তি হল না। ডিউটি জমাদারকে খবর পাঠিয়ে সেই দিনই সে সব বইগুলো ফেরত দিয়ে দিল। আর কোনো দিন লাইব্রেরির বই চেয়ে পাঠায় নি।

বুড়ী অনেকখানি সেরে ওঠবার পর হেনার হাতে বেশ কিছু সময় জমতে শুরু করল। মনটাও যেন কিছুদিন থেকে ভালো নেই। নতুন করে আবার তীব্র হয়ে উঠল বই-এর অভাব। লাইব্রেরির ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুশীলাকে খানিকটা ইঙ্গিত দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে 'দেখে নেব' গোছের খানিকটা আস্ফালন করলেও শেষ পর্যন্ত সে-ও হেনার মতেই সায় দিয়েছিল। বলেছিল, তোর কথাই ঠিক। দেখেছি তো, এ সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দোষেব ভাগী মেয়েরাই, আব কলঙ্কের দাগও তাদেব গায়েই লাগে।

অনেক ভেবে-চিন্তে হেনা একদিন সুশীলাকেই ধরে বসল, আপনাব জানা-শোনা কেউ নেই, মাসীমা, যেখান থেকে দু-একখানা বই ধার পাওয়া যায়? পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আনা যেত, কিন্তু সেখানে আবার টাকা লাগবে যে।

সুশীলা একটুখানি কী ভাবল। তার পর বলল, আচ্ছা, দাঁড়া, দেখি তোর বই যোগাড় কবতে পারি কি না।

ঠিক দুদিন পরে সুশীলা একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট হাতে করে হাসতে হাসতে দাঁড়াল গিয়ে হাসপাতালের দরজায়। সেদিক নজব পড়তেই হেনাব চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে প্যাকেটটা একরকম কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কলকণ্ঠে, বই! কোত্থেকে আনলেন?

—খুলেই দেখ।

তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে এল তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছ। নতুন বই-এর মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল বুকখানা। বইগুলো দুহাতে বুকে জড়িয়ে অনুযোগের সুরে বলল, আপনি আবার কিনতে গেলেন কেন এতগুলো বই? এর যে অনেক দাম!

সুশীলা মুখ টিপে হেসে বলল, দাম তো আর আমি দিই নি। যে দিতে পারে, সেই দিয়েছে।

—কে সে? হেনার চোখ-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর বিরক্তির কুঞ্চন।

সুশীলা ধমকের সুরে বলল, তা দিয়ে তোর কাজ কী? পড়তে চেয়েছিলি, পড়।

—এই রইল আপনার বই। কোত্থেকে পেলেন না বললে কখখনো নেব না।

—শুনলে আবার লাফাতে শুরু করবি না তো?

—কেন, লাফাব কেন?

—ডাক্তারবাবু।

অকস্মাৎ যেন তড়িতাঘাতে হেনার আপাদ-মস্তক শক্ত হয়ে গেল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, তাঁর কাছে বই চাইতে গেলেন কেন আপনি?

সুশীলা খানিকটা এগিয়ে এসে স্বাভাবিক রুক্ষ স্বর যথাসাধ্য নরম করে বলল, দেখ, কথায় কথায় ওরকম মাথা গরম করতে নেই। কার কাছে চাইব শুনি? এতবড় জেলখানার এতগুলো বাবু। তার মধ্যে বই পড়ে ঐ একটা লোক। মস্ত বড় আলমারি-ঠাসা খালি বই। সে যদি দেখতিস? যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ঐ নিয়েই পড়ে আছে। চাকরটার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে রাত্তিরে খাওয়াই হয় না। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে।

হেনার সেই দৃঢ় ভঙ্গী আস্তে আস্তে কোমল হয়ে এল। অনেকটা যেন সলজ্জ সুরে বলল, আমার নাম করে চাইলেন?

—না; তোর নাম করব কেন? আমার নাম করে চাইলাম। বললাম, ওগো, তোমাদের সুশীলা জমাদারনী এত বড় পণ্ডিত হয়ে গেল। ছখানা বই পড়তে দেবে না?—বলে পরিহাস-তরল কণ্ঠে হেসে ফেলল সুশীলা।

হেনা বোধ হয় শুনতেই পায় নি। আগের সূত্র ধরেই বলল, ছি, ছি, কী মনে করলেন উনি ?

—কী আবার মনে করবে! দেখে তো মনে হল খুশীই হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে আলমারি খুলে বেছে-বেছে খান-চারেক বই আমার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো পড়া হলে আবার এসে নিয়ে যেও। তারপর ও মা! বারান্দা পেরিয়ে কেবল উঠোনে পা দিয়েছি, পেছন থেকে এই ডাকাডাকি। 'কী হল!' 'না, না, ওগুলো নিতে হবে না। কাল এসো, অন্য বই দেবো।' বই কটা যেন কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে। আজ আবার যেতে ঐ বাণ্ডিলটা দিলে। লোকে ঠিকই বলে, ডাক্তারবাবুর মাথায় বেশ একটু ছিট আছে।

হয়তো তাই। কিন্তু এই 'ছিট'-এর পেছনে আরো কিছু আছে, যা সুশীলা না জানলেও, হেনার কাছে আজ আর অস্পষ্ট নেই। তার মনে পড়ল, দেবতোষের সেই চিঠি—'আমার কাছ থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। নিজেকে আমি তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিলাম।' পাছে তাঁর নিজের ঐ কটি প্রিয়বস্তুর রূপ ধরে সেই 'ভয়' এসে দেখা দেয় হেনার মনের কোণে, পাছে তার সন্দেহ জাগে, এ তো নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়, কৌশলে নিজেকে নতুন করে বিস্তার করা, তাই বই এল, কিন্তু সে তাঁর নিজের কাছ থেকে নয়, তাঁর হাতের কোনো স্পর্শ লেগে নেই এর কোনোখানে। বই কখানা আবার উলটেপালটে দেখল হেনা। একটা কালির আঁচড় পড়ে নি এর কোনো পাতায়। কী দোষ হত যদি প্রথম পাতাটির মাঝখানে ছোট্ট করে থাকত তার নাম, আর তার নিচে যত্ন করে লেখা তাঁর একটি সুন্দর স্বাক্ষর—দেবতোষ। সংসারে কার কী ক্ষতি হত ?···সহসা ঘুরে গেল চিন্তাস্রোত। ক্ষণিকের মধুর ঘোর কেটে গেল। নিজের স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হল হেনা। আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল দৃঢ় শাসনের বন্ধনে।

বুড়ী ঘরে নেই। জনালার ধারে টুলটা টেনে নিয়ে প্রথম

খণ্ডখানা খুলে বসল হেনা। নিজেকে ডুবিয়ে দিল কবিগুরুর এই অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে, যার জন্যে মন-প্রাণ তৃষিত হয়ে ছিল কত দিন। তারপর কখন এক সময়ে অনুভব করল, বইয়ের অক্ষর তার চোখে ঝাপসা হয়ে গেছে। মন বলছে কানে কানে, নাই বা রইল লেখনীর টান, নাই বা রইল মসীচিহ্ন। এই সাদা পাতার বুকের উপর যে অদৃশ্য লিপি তিনি পাঠিয়ে দিলেন, তার প্রতিটি রেখাই তো তার কাছে প্রত্যক্ষ। দেখা না গেলেও সে দৃশ্যমান, শোনা না গেলেও সে সুরময়।

বই কখানা তুলে দিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকাল, তার পর গভীর আবেগে চেপে ধরল বুকের উপর।

চার

স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীকে আবার পেয়ে বসল তার সেই আগের দিনের দুটো নেশা—আড্ডা আর তামাকপাতা। প্রথমটার জন্যে সাধারণ ওয়ার্ডে যাওয়া দরকার, আর দ্বিতীয়টার জন্যে চাই রানীবালার অনুগ্রহ। সে দাক্ষিণ্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণার প্রয়োজন। সেটা যোগাবার মতো গোপন সঞ্চয় বুড়ীর তখনো শেষ হয়ে যায় নি। ইদানীং হেনার কাছে সে ঘন ঘন ছুটির আব্দার জানাত, এবং মঞ্জুরও করিয়ে নিত। আসল ব্যাপারটা হেনার অজানা ছিল না। মাঝে মাঝে বলত, বুড়ো হয়েছ; এবার ঐ বদ নেশাগুলো ছাড়ো তো দেখি। ফোকলা দাঁতে এক-গাল হেসে বুড়ী একেবারে আকাশ থেকে পড়ত—কী যে বল দিদিমণি, এই তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, নেশা-টেশা ক-বে ছেড়ে দিয়েছি। ও-সব ছাই আর খাই না। ঐ কালীর মা মানুষটা বড় ভালো। দু-চারটা সুখ-দুঃখের কথা ও-ও কয়, আমিও কই। মনটা একটু ভুলে থাকে, এই আর কী!

হেনার সঙ্গে বুড়ীর বিচিত্র সম্পর্ক। রোগশয্যায় মা, সুস্থ অবস্থায় দিদিমণি।

আজ সে ছুপুরের দিকেই বেরিয়ে পড়েছিল। একটা সেলাই হাতে করে নিজের মনের মধ্যে ডুবে ছিল হেনা। সমস্তটা দিন কখন গড়িয়ে গেছে, টের পায় নি। হঠাৎ জোলো হাওয়া গায়ে লাগতেই জানালা দিয়ে দেখল, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি আসন্ন। বুড়ীর জন্যে চিন্তা হল। বুকের দোষ এখনো কাটে নি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। দেখতে দেখতে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে শুরু করল। ডেকে আনতে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় দরজায় সাড়া পেয়ে সেদিকে না তাকিয়েই বলল, হ্যাঁ, বেশ করে ভেজো। এবার পড়লে আমি আর টানতে পারব না বলে দিচ্ছি।

—না টানলে যাব কোথায় ?

হেনা চমকে উঠল, ও মা, তুই ! বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ ?

—কী করব, তুমি তো আর খোঁজ-খবর নেবে না। তাই, আমিই এলাম।

—খোঁজ নিয়ে লাভ ? আমার কথা তো আর শুনবি না ? ডাক্তার এসে ফিরে গেলেন। একবার দেখা পর্যন্ত করলি না !

—বাঃ, ভালো হয়ে গেছি যে। এই দেখো না, বলে কমলা তার শীর্ণ হাত ছুখানা তুলে ধরল।

সেদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে হেনা বলল, ভালো হওয়ার কী একখানা নমুনা !

—যাকগে ও-সব বাজে কথা, হেনার খাটের উপর বসে পড়ে বলল কমলা : তোমার ঐ বই থেকে একটা গল্প-টল্প পড়ো, শুনি।

হেনা সেলাইটা জড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল, না ; আজ তোর গল্প শুনব।

—আমার গল্প !

—হ্যাঁ ; তোর নিজের গল্প। সেদিন যে শোনাবি বলেছিলি ?

—ও—ও হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। সে-সব কাহিনী ঠিক গল্পেরই মতো। গুছিয়ে লিখতে পারলে তোমার ঐ নামজাদা লেখকদের বানানো গল্পের চেয়ে মন্দ হবে না। কিন্তু আমি তো আর লেখিকা নই। শেষ পর্যন্ত তোমার ধৈর্য থাকবে কি না, তাই ভাবছি।

—বেশ তো ; পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। অনেক দিন অনাবৃষ্টির পরে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। এরই জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছে তৃষিত পৃথিবী। গাছপালার পাতায় পাতায় সদ্য স্নানের আনন্দ। ভিজে মাটিব মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরপুর। জানালা দিয়ে একটু একটু ছাট আসছিল। কিন্তু দুজনের কারুরই সেদিকে খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে বাগানের দিকে চেয়ে রইল কমলা। তাবপর মৃদু কণ্ঠে শুরু করল তার কাহিনী।

বাপ-মায়ের শেষ বয়সের সন্তান আমি। ভাই বোন কেউ নেই। হবার যখন আর আশা নেই, মা তাঁর এক বিধবা জ্ঞাতি-বোনের একটি মেয়েকে কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন। আমি জন্মাবার আগেই আমার সেই মাসী মারা গেলেন। দিদি মার কাছেই রয়ে গেল। তার যখন বিয়ে হল, আমার বয়স বোধ হয় বছর ছয়েক হবে। ভালো করে মনেও পড়ে না। তারপরই বাবা অবসর নিলেন। ইস্কুল-মাস্টার ছিলেন। সামান্য পুঁজিতে সংসাব চলে না। তাই ছেলে পড়াতে হত। কারো বাড়ি গিয়ে পড়াতেন না, ছেলেরাই আসত ওঁর কাছে। উনি পড়াতেন ; আমি পাশে বসে থাকতাম। একটু বড় হলে সকলের দেখাদেখি আমিও শুরু করলাম। ছাত্রেরা চলে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে বসতেন। বাবাব সঙ্গে খাই, বাবার হাত ধরে বেড়াতে যাই, তাঁর পাশে শুয়ে গল্প শুনি। বাপের অতখানি সঙ্গ বোধ হয় কোনো মেয়েই পায় না, অতটা আদরও না। মাকে বড় একটা কাছে পাই নি। আমার বিয়ের ভাবনার আড়ালেই যেন তাঁর সব স্নেহ, সব আদর চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই

আমার বাড়ন্ত গড়ন। সেদিকে দেখতেন আর আপন মনে বলতেন, পোড়ারমুখী এলি, কটা বছর আগে এলি না কেন? বাবার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, শরীর ভেঙে পড়ছে। আমাকে পার করবার আগেই পাছে তিনি চোখ বোজেন, এই ভয়ে মার চোখে ঘুম ছিল না।

দেখতে দেখতে আমি বড় হয়ে উঠলাম। বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা নিয়েই থাকি। বাবার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আমার ওপরে পড়ত, কেউ কেউ আমার সঙ্গে। অঙ্কে আমার সঙ্গে প্রায়ই কেউ পেরে উঠত না। আমাকে দিয়ে ওদের হারিয়ে বাবা ভারি আমোদ পেতেন। কাউকে হয়তো একটা শক্ত অঙ্ক দিলেন। খানিকটা চেষ্টা করে যখন পারল না, তার খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, দেখো তো কমল, তুমি পার কি না। আমি সহজেই করে দিতাম। আড়চোখে দেখতাম, ছেলেটার মুখ কালো হয়ে গেছে। খাতাটা আমার কাছে আসবে বলে কেউ কেউ আবার ইচ্ছা করে ভুল করত। বাবা বুঝতেন না; আমি না বোঝবার ভান করতাম। যার খাতা, সে বুঝত, ভুলটুকু ঠিক জায়গায় ধরা পড়েছে। রোজ রোজ ভুল বেড়েই চলত, আর সেটা শুধরে দেবার বাড়তি কাজটুকু আমারও নেহাত মন্দ লাগত না।

নীরস অঙ্কের সঙ্গে একটু-আধটু সরস কাব্যের আমদানিও যে না হত, তা নয় একদিন একটি ছেলের অঙ্কের খাতা দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল কোণের দিকে ছোট্ট ছোট্ট করে লেখা—'কমল, তোমার জন্যে আমার হৃদয় 'বিদির্ণ' হচ্ছে।' আমি ঐ 'বিদির্ণ' শব্দটার নিচে একটা দাগ দিয়ে লিখে দিলাম, 'বানান ভুল'। এ সবই ছিল খেলা। কিন্তু খেলতে খেলতেই একদিন জড়িয়ে পড়লাম। সে যেদিন এল, সেদিনের কথাটা বেশ মনে আছে। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। গায়ের রংটা চাপা। কিন্তু কী চমৎকার গড়ন! অনেকটা যেন তোমার মতো।

হেনা হেসে উঠল, দূর; আমার মতো কি রে?

কমলা একটু অপ্রতিভ স্বরে বলল, মানে, ধরো, তুমি যদি ব্যাটা-ছেলে হতে—

—ও, সেই জন্যেই বুঝি আমার ওপর এত টান ?

—না দিদি, তোমার ওপর টান আমার আগের জন্মের। তা না হলে এখানে এসে দুটোতে জুটলাম কী করে ?

হেনা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। কমলার একটা হাত সস্নেহে তুলে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল।

কমলা ফিরে গেল তার গল্পে—সবচেয়ে সুন্দর ছিল ওর দুখানা টানা-টানা ভ্রূ। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এদিকে কিন্তু বেজায় গুণী লোক। দু-দুবার ম্যাট্রিক ফেল করে বার বার তিন বার বলে ঝুলে পড়েছেন। বাপ বড় ব্যবসায়ী। ছেলে পাশ না করলে তাঁর মান থাকে না। টিউটর হিসাবে বাবার নাম ছিল। তাই এসে এক রকম ধরনা দিয়ে পড়ল, পাশ করিয়ে দিতেই হবে। তখন কি জানি, তারই হাত দিয়ে আসছে আমার মরণ-বাণ! বাবার এত ছাত্র। কাউকে দেখে কখনো এতটুকু সঙ্কোচ হয় নি। তারাই বরং আমাকে দেখে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে গেছে। কিন্তু সে যেদিন প্রথম এসে বসল আমাদের বাইরের ঘরে, জানলা দিয়ে একবার চোখাচোখি হতেই পা দুটো আর টেনে তুলতে পারলুম না। বুকের ভেতর সে কী ঝড়! বাবার ডাকাডাকিতে কোনো রকমে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর পাশটিতে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাথা তুলে চাইব, সে শক্তি রইল না।

অন্য সব বিষয়ে দু-চারটা প্রশ্ন করে বাবা তাকে অ্যালজেবরা থেকে একটি অঙ্ক দিলেন। নিতান্ত সহজ অঙ্ক। খাতাটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে বলল, হল না, মাস্টারমশাই! বাবা হেসে বললেন, হল না ? আচ্ছা। হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিলেন এবং এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাত কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেল অক্ষরগুলো। একটা ফরমূলাও মনে পড়ল না। এত দিন পরে আমার হার হল। তার কাছে হেরে

গেলাম। শুধু হেরে গেলাম নয়, মনে মনে হার মানলাম। সেই প্রথম বুঝলাম, জীবনে হার মেনে কত সুখ।

সেই দিন থেকে বাবার ইস্কুলে পড়া আমার শেষ হল। কেউ ছাড়িয়ে দেয় নি। আমিই ছেড়ে এলাম। তুমি হাসছ, হেনাদি! কিন্তু সেদিন যদি দেখতে আমার অবস্থা, তোমার দয়া হত। একটু দেখবার জন্যে, সামান্য একটা কথা শোনবার জন্যে মনের সে কী কাঙালপনা! অথচ সামনে গিয়ে বসতে পারি না। তারও কি সেই দশা? তা না হলে এক ঘণ্টার পড়া হঠাৎ তিন ঘণ্টায় দাঁড়াল কেমন করে? কোত্থেকে এল এত মনোযোগ? লিখছে গ্রামারের প্রশ্ন, চোখ দুটো রয়েছে জানালায়। তার পাশ দিয়ে এ কাজে ও কাজে আমার যাবার-আসবার পথ। বাবা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। হয়তো খুশীও হয়েছিলেন মনে মনে। প্রায়ই বলতেন, সনৎ ছেলেটি বড় ভালো। এত ছেলে পড়ালাম, এমন একটা প্রাণ আর চোখে পড়ে নি। তার পর একদিন আড়ি পেতে শুনলাম খেতে বসে কথা হচ্ছে মার সঙ্গে। কী একটা কথার উত্তরে মা বলে উঠলেন, তুমি খেপেছ! ওরা হচ্ছে বড়লোক। ছেলে তোমার মেয়ের রূপ দেখে ভুলতে পারে, কিন্তু বাপ তোমার রুপো না পেলে ভুলবে না। সেই হিসেব করে তবে এগিয়ো।

কিন্তু হিসাব শেষ হল না। আমাদের হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। আমাদের সম্বলের মধ্যে রইল গোটা কয়েক ঘটিবাটি বাক্স-প্যাঁটরা, আমার হাতে দুগাছা হালকা চুড়ি, গলায় একটা সরু হার, সুটকেসের তলায় লুকিয়ে রাখা তার খানকয়েক চিঠি, যার মধ্যে উচ্ছ্বাস অনেক, ভরসা অতি সামান্য। তবু মাকে বলেকয়ে কিছু দিন অপেক্ষা করলাম, যদি কোনো ডাক আসে। তার পর একদিন জিনিসপত্রগুলো বিক্রি করে সামান্য কটা টাকা হাতে নিয়ে কলকাতায় দিদির বাসায় গিয়ে উঠলাম।

বিয়ের পর সেই গোড়ার দিকে দু-এক বার ছাড়া দিদি আমাদের বাড়িতে আর আসে নি। জামাইয়ের সঙ্গে বাবার সদ্ভাব ছিল না। আজ সব হারিয়ে যখন এসে তারই আশ্রয়ে উঠলাম, দিদির মুখ গম্ভীর হল। আমি ছিলাম মার পেছনে। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই এমন করে তাকিয়ে রইল, যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। পাশের ঘরে চলে গেলাম। শুনলাম, দিদি বলছে, এখনো ঘরে পুষে রেখেছ! ওর দিকে তাকাও কেমন করে? মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, না তাকিয়ে কী করি বল? উনি কি আমার কথা শুনতেন? জান তো সবই। এবার এলাম তোমাদের আশ্রয়ে। বিনোদকে বলে যত শীগগির পার, যেমন তেমন একটা জুটিয়ে দাও। গলা দিয়ে আমার ভাত নামে না।

—আমি আর কী বলব? বাড়ি আসুক; তুমিই বোলো যা বলবার—বলে দিদি তার কাজে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই জামাইবাবুর গলা পেলাম। তখনই ফিরলেন। শাশুড়ীর একগাদা কথার উত্তরে শুকনো গলায় টেনে টেনে বললেন, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু যা দিন-কাল পড়েছে···। তার পর এই তো দেখছেন, আড়াইখানা ঘর। আমাদেরই কুলোয় না।

—কী করব, বাবা, বারান্দার কোণে পড়ে থাকলেও আমাদের থাকতে হবে। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে—কই, কমলা কোথায় গেলি? তোর জামাইবাবুকে প্রণাম করলি না?

বেরিয়ে এলাম। আমার ভগিনীপতির শুকনো মুখখানা হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। একগাল হেসে বললেন, বাঃ বেশ ডাগরটি হয়ে উঠেছে তো কমলা! এসো, এসো, লজ্জা কী! কী বলব, দিদি, মানুষের হাসি যে এত কুৎসিত, এই প্রথম দেখলাম। আর সেই দুটো চোখ যেন গিলে খেতে চাইছে। একবার চেয়েই আপনা থেকে আমার চোখ নেমে এল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠল; ভয়ে নয়, ঘৃণায়। মনে পড়ল, এ চোখ কোথায় যেন দেখেছি।

হ্যাঁ, তখন আমার বয়স সবে সাত-আট বছর। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের বস্তিতে একটা লোক ছিল। তার নাম গণি মিঞা। অনেকগুলো মুরগী ছিল তার। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ও দিকটায় গেলে দেখতাম, মুরগীর খদ্দের এসেছে গণি মিঞার। ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে পাখিগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে ঝুড়ি ভরে। একটা মুরগী ছিল। ভারী সুন্দর দেখতে, আর তেমনি নাতুসনুতুস। টগবগ করে চলত। আমরা বলতাম রানী। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ওটা বেচবে না? গণি মাথা নাড়ল। তার পর কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে বলল, দেখছ না খুকী, একেবারে তৈরী মাল। ওটা কি আর বেচা যায়? একটা পরব-টরব আসুক, দু-চারজন ম্যাজবান ডাকি, তার পর···বলে কী এক অদ্ভুত জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল সেই মুরগীটার দিকে। এত দিন পরে আমার জামাইবাবুর কপালের নিচে দেখলাম সেই গণি মিঞার চোখ। বুকের মধ্যে কেমন দুরু দুরু করে উঠল। মার ধমক খেয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার কাঁধ দুটো ধরে একটু ঝাঁকানি দিলেন। সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করে উঠল।

কী সব ব্যবসা ছিল আমার ভগিনীপতির। সকালে চা-খাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। বারোটা-একটায় আসেন। খেয়েদেয়ে ঘুম। তার পর আবার বিকেলে বেরোন। ফিরতে সেই রাত বারোটা। কোনো কোনো রাতে নাকি একেবারেই ফেরেন না। থাকেন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই দিদি ঘরে চলে গেল। আমি আসবার পর তাঁর এই রুটিন বদলে গেল। সকালে বেরোতে দেরি হয়। বিকেলে বেরোতেই চান না। সময় নেই, অসময় নেই, কমলা, এটা নিয়ে এসো, সেটা দিয়ে যাও। কাছে গেলে আদরের নাম করে যা আমাকে সইতে হয় মনে হলে আজও আমার গা পাক দিয়ে ওঠে। একলা কাছে যাওয়া এড়িয়ে চলি। কিন্তু সকলের সামনেও রেহাই নেই। এমন ভাব দেখান, যেন কচি খুকী আমি,

আমাকে নিয়ে যা খুশি করা চলে। মা দেখেও দেখেন না। দিদি চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঐ সাপের মতো হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে দিই। কিন্তু জানি, সেই সঙ্গে আমাদেরও কপাল ভাঙবে। শুধু আমার হলে ক্ষতি ছিল না; সেই সঙ্গে মারও। সে কথা ঐ লোকটার জানা আছে বলেই, আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে তার দ্বিধা নেই। বাধা দিতে দিতে শেষটায় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ভাবতে শুরু করলাম, আমার এ দেহটা যেন রক্তমাংসের নয়, পাথরের। পাথরের তো কোনো বোধশক্তি নেই, মান-অপমান, লজ্জা-সম্ভ্রমের বালাই নেই। আস্তে আস্তে আমিও যেন তেমনি পাথর হয়ে গেলাম।

—একটা কথা ভেবে দেখেছ, দিদি? মেয়েমানুষের এই দেহটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ; একটু বড় হবার পর থেকেই একে নিয়ে তার ভয়ভাবনার অন্ত নেই, একে নিয়ে তার পদে পদে বিপদ, পদে পদে লাঞ্ছনা। একে সামলে রাখা, আগলে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা—সেইটাই যেন তার সবচেয়ে বড় দায়। এর ওপরে সকলের খরদৃষ্টি, আপন, পর, মেয়ে, পুরুষ, কার নয়? পুরুষের দেহটা হল তার সম্পদ, আর মেয়েমানুষের হল বোঝা। তাই পৃথিবীর সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বড় কিছুই সে করে উঠতে পারল না। এই বোঝা বয়ে বয়েই জীবন কেটে গেল।

—এটা তোর রাগের কথা, মৃদু হেসে প্রতিবাদ করল হেনা। নিজেকে দিয়ে দেখছিস। কিন্তু তোর মতো ঐ অবস্থায় ক-জন পড়ে?

—সে কথা ঠিক। আমার মতো ভাগ্য আর ক-জনের? কিন্তু তাহলেও আমার আসল কথাটা রয়ে গেল। তুমি যাদের কথা বলছ, আমার দলে যারা পড়ে না, এই শরীরটাকে নিয়ে তাদেরও ঘুম নেই। সেও এক রকমের দায়। দেহকে গুটিয়ে রাখার দায় নয়, ফুটিয়ে তোলার দায়। তাকে ঘষে-মেজে, সাজিয়ে-পরিয়ে, সাধুভাষায়

যাকে বলে, রমণীয় লোভনীয় করবার কী প্রাণপণ সাধনা! তার জন্যে কত আয়োজন, কত উপকরণ; তার পেছনে কত সময়, কত অর্থ, কত পরিশ্রম। কই, পুরুষের তো সে বালাই নেই! তাই বলছিলাম, মেয়েমানুষ জাতটাই দেহ-সর্বস্ব।

—আচ্ছা, হয়েছে। বক্তৃতা রেখে এবার নিজের কথায় এসো দিকিন! বলে, হেনা বালিশে ভর দিয়ে আরাম করে বসল। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের কোণে ঢাকা-দেওয়া কলসী থেকে একবাটি জল গড়িয়ে খেল। তারপর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, কতখানি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, সেটা ভালো করে টের পেলাম, যেদিন এল আমার চরম সর্বনাশ। এমনি বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। দিদি হাসপাতালে। সেবারটা বোধ হয় তার পাঁচ বার। আগের চারটি আগেই গেছে। কোনোটা আঁতুরে, কোনোটা ক-দিন পরে। মা তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে দেখতে গেছেন। সেখান থেকে আর কোথায় যেন যাবার কথা। একটা কী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখলাম, আমার ভগিনীপতি দরজায় খিল এঁটে দিচ্ছেন। চেঁচাতে পারতাম বৈ কি? ফল হোক আর না হোক, চেষ্টা তো করা যেত। কিন্তু চেঁচাই নি। যদি বল কেন, ঠিক উত্তর দিতে পারব না। শুধু এই দেহটা নয়, মনটাও অসাড় হয়ে পড়েছিল। সত্যিই পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

মাকে বা দিদিকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় নি। মাস দুই পরে সে কাজের ভার নিল আমার এই শরীর। দিদি এবার ফিরে এসেই বিছানা নিয়েছিল। সেখানে বসেই মাতে মেয়েতে কী সব পরামর্শ চলল কয়েক দিন। তার পর একদিন। রাত বোধ হয় বারোটা একটা হবে। আমি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে মার জায়গাটা ফাঁকা ঠেকতেই জেগে উঠলাম। ঠিক তখনই মা-ও ঘরে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন আমার পাশটিতে। তার পর বললেন, বিনোদকে তো অনেক বলে-

কয়ে রাজী করালাম। তোর দিদিরও মত আছে। তুই যেন আবার বাগড়া দিয়ে বসিস না।

ব্যাপারটা কী জানতে চাইলাম। মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বললেন, শেষকালে এই ছিল তোর কপালে! কিন্তু উপায় কী? বিয়ে ছাড়া এখন তো আর অন্য পথ নেই, মা!

মনে আছে, 'মা!' বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর কোনো কথাই বলতে পারি নি। তার পর প্রায় সমস্ত রাত ধরে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত কী বলেছিলেন মা, তার একটা বর্ণও আমার মাথায় ঢোকে নি।

মা ঠিকই বলেছিলেন। এ ছাড়া আর আমার পথ কোথায়? জামাইবাবু যে রাজী হয়েছেন, সেইটাই তো আমার পরম ভাগ্য। আমিও যে রাজী, এইটুকু শুধু জানিয়ে দেওয়া। তাই হয়তো দিতাম কিন্তু সকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে করে আমাদের সব ব্যবস্থা ভেস্তে গেল।

নিচে কাজ করছিলাম। ডাকঘরের পিওন এসে চিঠি দিয়ে চলে গেল। এমনি প্রায় রোজই দেয়। সব জামাইবাবুর চিঠি। মাকে বা আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। ওদিকে আমার কোনো কৌতূহলও ছিল না। সে দিন কী মনে হল। একটা পুরনো বিস্কুটের টিন পেরেক দিয়ে দেয়ালে গাঁথা। সেইটাই চিঠির বাক্স। তার ভিতর থেকে চিঠিখানা তুলে দেখলাম। এ কী! এ যে আমার নাম। আর এ লেখা, এ-ও তো আমার ভোলবার নয়! চিঠিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছুটে গেলাম উপরের ঘরে। দরজা বন্ধ করে খুলে ফেললাম খামখানা। বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল। কী জানি, যদি সে না হয়। ভাঁজ খুলতেই বুকটা ভরে উঠল।

মস্ত বড় চিঠি। প্রথম দিকে, এক পাতা জুড়ে, কী করে আমাকে খুঁজে পেল, তারই সব মজার কাহিনী। তার পর নতুন করে বলা

সেই পুরনো দিনের রঙীন স্বপ্ন। শেষটুকু যেন শেষ হতে চায় না। বার বার করে পড়লাম: জান কমল, আজকের মতো এমন করে আর কোনো দিন বুঝি নি, তোমাকে না পেলে আমার চলবে না। তোমাকে পাবার পথে সেদিন যে-সব বাধা ছিল, আজ তার কোনোটাই নেই। তুমিও যে বাঁধা পড় নি, সে খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু তোমার মন? সেখানে একটু জায়গা পাব তো? প্রতি মুহূর্তে দিন গুনছি, কবে তোমার ডাক আসবে।

সেই দিনই জবাব দিলাম। লিখলাম, তোমার ডাক আসবে বলে আমিও যে কত দিন থেকে পা বাড়িয়ে আছি, সনৎদা! বাঁধা পড়ি নি বটে, তবু ভয় হয়, যেখানে এসে পড়েছি, সেখান থেকে সবার সামনে দিয়ে তোমার কাছে যাবার সরল পথটা আমার খোলা নেই। তুমি এসো। যেমন করে পার, আমাকে বাঁচাও।

সনৎ কী বুঝেছিল, জানি না। ক-দিন পরেই আবার চিঠি এল—অমুক দিন, অমুক সময়ে তৈরী থেকো। তৈরী হয়েই ছিলাম। গভীর রাতে সনৎ এল ট্যাক্সি নিয়ে। হর্ন শুনেই নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। মার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। আজ তো আমার কাঁদবার দিন নয়। একবার ভেবেছিলাম, মাকে সব জানিয়ে যাব। সনতের হাতে মেয়ে দিতে হয়তো তাঁর আপত্তি হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা হয় নি। যদি ওঁরা রাজী না হন? যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায়? তাই রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে এলাম। সবাই জানল, কমলা কুলে কালি দিয়ে গেল, কমলা মরল। কিন্তু যে নরকে ছিলাম, তার চেয়ে মরণে ঝাঁপ দিয়েও সুখ। যদি বল, কলঙ্ক? যা পেলাম, তার কাছে সে কত তুচ্ছ!

সনতের পাশে বসে উঠলাম এসে তার কালীঘাটের বাসায়। যেখানে নিয়ে তুলল, বাড়ির মধ্যে সেইটাই সবচেয়ে ভালো ঘর। দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা যায়

তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের হাতের কত যত্ন, তার মনের কত সাধ। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার ঘর। আজ শুধু তোমার। যদ্দিন দুজনার না হচ্ছে, তদ্দিন এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। তার পর একটু হেসে গলা খাটো করে বলল, সে দিনের আর দেরি নেই।

পরদিন সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরের দিনও না। অথচ সাড়া-শব্দ পাই। জানতে পারি বাড়িতেই আছে। ঠাকুর চাকর ঝি-এর হাতে এটা-ওটা পাঠাচ্ছে। শুধু আসল মানুষটির দেখা নেই। তিন দিনের দিন ডেকে পাঠিয়ে বললাম, কী ব্যাপার বল তো? একটি বারও কি আসতে নেই?

ও হেসে বলল, একটি বার কেন, একশবার আসবারই তো আয়োজন করছি। তখন আবার বলবে, একটি বারও কি বাইরে যেতে নেই? আমি রাগ করে বললাম, ও সব বাজে কথা। আসলে টান যেটুকু, দূরে ছিলাম বলে। হাতের কাছে পেয়ে সব চলে গেছে। সনৎ একটু কী ভাবল, তার পর বলল, শুধু হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়, তার বেলায় হয়তো তোমার কথা খাটে। কিন্তু আমি যে আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। পেয়েছি মনের কাছে। কাজেই হারাবার ভয় নেই, আগলে রাখবারও দরকার নেই।—বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আসল কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। পাছে আমার মনে কোনো সন্দেহ জাগে, তার আশ্রয়ে আছি বলে সে তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে, তাই নিজেকে একবারে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলেও ফেলেছিল, তোমাদের বাড়িতে যেমন ছিলে, এখানেও তোমাকে ঠিক তেমনি দেখতে চাই। মনে কোরো মাস্টারমশাই বেঁচে আছেন। কাছাকাছি কোথায় অপেক্ষা করছেন আমাদের আশীর্বাদ করবেন বলে।

সে যদি এতখানি ভালো না হত হয়তো ঠকাতে পারতুম।

আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, সে কথা সনৎ বুঝতে পারে নি, কিন্তু যে নতুন ঝিটা আমার জন্যে বহাল করেছিল, তার চোখ এড়ায় নি। আমার মনের মধ্যে যে ঝড় চলছে, তার কারণটাও মোটামুটি অনুমান করতে তার ভুল হয় নি। সেও আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, চুপ করে থাকো, দিদিমণি! বিয়েটা হয়ে যাক। ভরসা দিয়ে বলেছিল, তাতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু পারলুম না। বার বার মনে হতে লাগল, প্রতারণা বলে যে একটা পাপ আছে, আর সব জায়গায় হয়তো চলতে পারে, কিন্তু সনতের বেলায় চলে না। বিয়ের আগেই ওকে সব খুলে বলতে হবে। তারপর কপালে যাই হোক। ঐ ঝিকে দিয়েই একদিন সন্ধ্যার পর তাকে ডাকিয়ে এনে কোনো রকমে নিশ্বাস চেপে বলে ফেললাম। তার সেই উজ্জ্বল মুখখানা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ বসে পড়ল। তারপর টলতে টলতে চলে গেল নিজের ঘরে। ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার সব কথা তো তোমায় বলা হয় নি, সনৎদা! দয়া করে শোনো ; তারপর আমার বিচার কোরো। কী অবস্থায় পড়ে—

এইটুকু বলতেই সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, যা শুনেছি, তার বেশি আর কিছু শুনতে চাই না, কমল! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

পরদিন সকালে উঠেই শুনলাম, সনৎ কোথায় চলে গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছে আমার জন্যে। তিন লাইনের চিঠি—

"কিছু দিনের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলুম না। আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে। যত দিন বাঁচব, তোমার সমস্ত ভার আমার। আমাকে না বলে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

তোমারই সনৎ।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, "এখানে তোমার সব ব্যবস্থাই রইল। তবু যদি কখনো কিছু দরকার হয়, জানাতে সঙ্কোচ কোরো না। নিচে ঠিকানা রইল।"

ঠিকানা কাশ্মীর। এ চিঠির উত্তরে আমি লিখেছিলাম, "আমি তোমার বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমাকে মুক্তি দাও। যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাই।"

সনৎ লিখল, "আমার ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তুমি সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছিলে। সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমাকে রাখতে দাও, কমল! তা ছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। শেষ ফল তার যাই হোক, তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?"

এ কথার আর কোনো উত্তর খুঁজে পাই নি।

সনতের বাবা-মা কিছু দিন আগে মারা গেছেন। মাথার উপর অভিভাবক কেউ নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন কেউ কেউ মাঝে মাঝে এসে উঠত ওদের বাসায়। তাদের কাছে আমি বেরোতেও পারি না, লুকিয়ে থাকতেও পারি না। কী করব ভাবছি, এমন সময় চিঠি এল, আমার জন্যে নবদ্বীপে বাড়ি ঠিক করা হয়েছে। ঝি আমার সঙ্গে যাবে। সরকার মশাই আমাদের পৌঁছে দেবেন। অত দুঃখেও আমার হাসি পেল। ঠিক জায়গায় যাচ্ছি এবার। মহাপ্রভুর দেশ। আমার মতো কলঙ্কের কালি মেখে যারা সংসারের বাইরে চলে গেছে, নবদ্বীপই তাদের একমাত্র গতি।

ওখানে গিয়েও দেখলাম, যা তোমাকে আগেই বলেছি। এই দেহটাই হল মেয়েমানুষের চিরকালের অভিশাপ। এক দল লোক পেছনে লাগল। গুণ্ডা নয়; ভদ্র লোক, মানী লোক। কেউ কেউ আবার ঝিটাকে হাত করে ফেলল। কী করে নিজেকে বাঁচাই। একবার ভাবলাম, সনৎকে লিখি। কিন্তু সে-ই বা কী করবে! হয়তো আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা তো দুনিয়ার বাইরে নয়। আর কোনো পথ না দেখে ঝিটাকে বিদায় করে দিলাম। সে শাসিয়ে গেল, এর শোধ নেবে।

তার পর একদিন নিতান্ত অকালে পেটের মধ্যে শুরু হল দারুণ

যন্ত্রণা। সইতে না পেরে নতুন ঝিকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার আসবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আট-দশ ঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলেই দেখি, পুলিশ। শুনলাম, মরা বাচ্চাটাকে ফেলতে গিয়ে আমার নতুন ঝি ধরা পড়েছে পাড়ার বাবুদের কাছে। সেই অবস্থায় রিকশ করে নিয়ে গেল থানায়। ডাক্তার ছাড়া পেলেন, ঝি-এর জামিন হয়ে গেল। আমাকে যেতে হল জেল-হাজতে।

প্রথমটা মনে হল, বাঁচলাম। নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারব। কিন্তু দু দিনেই বুঝলাম, ভুল করেছি। কথা বলবার শক্তি নেই: তবু হাজার গণ্ডা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যা বলি, কেউ বিশ্বাস করে না। কয়েদী-মেয়েরা মুখ টিপে হাসে; জমাদারনী টিটকারি দেয়। জেলরবাবু এক দিন জানতে চাইলেন কী হয়েছিল। বলতে গেলাম, আমি কিছুই জানি না। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। মুচকি হেসে চলে গেলেন। অর্থাৎ ওসব আমার জানা আছে। একজন বুড়ো ডাক্তার আসতেন। তিনি বলেছিলেন, 'হাকিমের কাছে সত্যি কথা বোলো। ছাড়া পেয়ে যাবে।' তারিখের পর তারিখ পড়তে লাগল। এক দিনও উনি আমাকে কোর্টে যেতে দিলেন না। তখন অনেকটা সেরে উঠেছি। বললাম, এবার যেতে পারব। ডাক্তারবাবু শুনলেন না। চুপি চুপি বললেন, বোকা মেয়ে! যদি ছেড়ে দেয়? বাইরে গিয়ে এ-সব ওষুধ-পথ্য কোথায় পাবে?

ডাক্তারবাবু ভরসা দিয়েছিলেন। আমারও বিশ্বাস ছিল, খালাস হয়ে যাব; বিনা দোষে শাস্তি হবে কেন? যা ঘটেছে খুলে বলব। কিন্তু হল না। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। উকিলের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার জামাইবাবু। একজন উকিল আমার হয়ে আজগুবি কাহিনী শুরু করলেন। বুঝলাম আমাকে ছাড়িয়ে নেবার মতলব। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, ওসব মিথ্যা কথা। যা ঘটেছে তার সব দায়িত্ব আমার।

হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই তোমার বাচ্চাকে অকালে নষ্ট করতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

হেনা এইখানে প্রশ্ন করল, তোর খোঁজ পেল কী করে লোকটা?

কমলা বলল, সে কথা আমিও অনেক ভেবেছি, দিদি! আজও কোনো হদিস পাই নি।

—সনতের কোনো চিঠি কি ওর বাড়িতে ফেলে এসেছিলি?

—হতে পারে। তাড়াতাড়িতে সবগুলো হয়তো নেওয়া হয় নি।

—থাক, তার পর?

—তার পর আর কী? ছোট হাকিমের কাছ থেকে গেলাম বড় হাকিমের কাছে। সেখানেও ঐ এক কথাই বললাম। বিপক্ষে সাক্ষীও কম ছিল না। আমার সেই পুরনো ঝি বলে গেল, এ ব্যাপারে আমি তার সাহায্য চেয়েছিলাম; রাজী হয় নি বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পাড়ার ক-জন বাবুও হলপ করে বললেন, ঝি-এর কাছে এ কথা তারা আগেই শুনতে পেয়েছিলেন এবং আমার ওপর নজর রেখেছিলেন, ইত্যাদি। নতুন ঝি বোধ হয় আমার কথার ওপরেই খালাস হয়ে গেল। আমাকে জেলে পাঠালেন জজ সাহেব। কিছু দিন পরে ছোট জেল থেকে চলে এলাম বড় জেলে। তার পর পেলাম তোমাকে।

অনেকক্ষণ একটানা বসে থেকে থেকে কমলার শিরদাঁড়া টনটন করছিল। ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল অনেকখানি। হেনার বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে রইল। হেনা তার মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে তার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর কমলা বলল, কী মজা দেখো, দিদি! সব ছেড়ে এলাম। সবাই

আমাকে ছাড়ল। কিন্তু আমার পূজনীয় ভগিনীপতির হাত থেকে রেহাই পেলাম না। তাঁর আদরের শেষ চিহ্ন এই কাল ব্যাধি আমার দেহে অক্ষয় হয়ে রইল।

হেনা দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলল, না, কমলা; ব্যাধি অক্ষয় নয়। ওটা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যে জিনিস তোর জীবনে সত্যিই অক্ষয় হয়ে আছে, তাকে যেন একদিন ফিরে পাস, এইটুকুই আজ কামনা করি।

কমলা আর কোনো কথা বলল না। যে সুডৌল হাতখানা পদ্মকোরকের মতো তার কপালের পাশটিতে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল, তাকেই আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে বুকের উপর রেখে চোখ বুজে পড়ে রইল।

পাঁচ

দেবতোষের মনে হল নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন, কিংবা সুশীলাই হয়তো ভুল বলছে। এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! তবু যেটা একবার শুনেছেন, সেই কথাটাই আরেক বার শুনবার জন্যে প্রশ্ন করলেন, কার কথা বলছ?

সুশীলার সুরে বিরক্তি ফুটে উঠল, বাঃ, শুনতে পাচ্ছেন না! হেনা, আপনার নার্স। একবার যেতে বলেছে আপনাকে।

ডাক্তারের মনের মধ্যে বিস্ময় এবং আনন্দ একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটোই চেপে রেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, কেন? বুড়ীটা আবার পড়ল না কি?

—বুড়ী! আপনিও যেমন! সে তো গোটা জেনানা ফাটক চষে বেড়াচ্ছে।

—তাহলে, ওর নিজের কিছু হয় নি তো?

—না, অসুখ-বিসুখ করলে, আমাকে নিশ্চয়ই বলত। তা ছাড়া, চোখ-মুখ তো ভালোই দেখে এলাম।

—তবে ?

—তবে-টবে জানি না। আপনি একবার ঘুরে যাবেন।

দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ক্যাম্প-চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তার। জমাদারনী এই মাত্র যে খবর দিয়ে গেল, সেটা পাবার পর কাগজের খবরগুলো সব যেন একাকার হয়ে গেল। আমাদের এই চোখ দুটোর কাজ শুধু চাওয়া, শুধু তাকানো। দেখে আর-এক জন; তার নাম মন। যে চোখের পেছনে মন নেই, সে অন্ধ। ডাক্তারের চোখের সামনে খোলা পড়ে রইল একটা বর্ণহীন কাগজের পাতা; মনের সামনে ভেসে উঠল একটি কুয়াশা-ঢাকা শীতের রাত আর তার পরের কতগুলো বর্ণোজ্জ্বল দিন। কিন্তু যাকে আশ্রয় করে তাঁর জীবনে এই বর্ণ-সমাবেশ, সে ধরা দেয় নি। নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে দুর্ভেদ্য কঠিন বর্মের আবরণে। এমন একটা মুহূর্তও মনে পড়ে না, যখন সে নিজের মনে বিনা প্রয়োজনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কিংবা মুখ ফুটে বলেছে এমন কোনো কথা যেটা নিছক কাজের কথার এলাকায় পড়ে না। ঐ ছোট্ট হাসপাতালের নিভৃত কোণটিতে দিনের পর দিন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছে, দুটি নিরলস নিপুণ হাতের কাজ। তার কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেয়েছেন, সাহচর্য পেয়েছেন, সান্নিধ্যও পেয়েছেন, কিন্তু মনের দুয়ার খোলা পান নি। এত কাছে থেকেও সে দূরেই রয়ে গেছে। মাঝখানে একটা বেড়া, যার এ পাশে দাঁড়িয়ে জেল-ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ, আর ও-পাশে ৩১৩ নম্বর মেয়ে-কয়েদী হেনা মিত্র। পরস্পরের কাছে এইটুকুই যেন তাঁদের পরিচয়। তার বাইরে কিংবা তার বেশী আর কিছু নয়। সম্পর্ক যেটুকু, সব শুধু কাজের: শুধু আইনের। সেই কাজের সূত্র ধরেও তাঁর কাছে কোনো ইচ্ছা, কোনো অনুরোধ সে জানায় নি। কখনো কাছে এসে বলে নি, নত মুখে লাজ-নম্র

সুরে : কাল একবার আসবেন ; কাজ আছে। আজ যে ডাক এল, এটাও হয়তো তার নিজের তরফ থেকে নয়। এর পিছনে যে প্রয়োজন, তার সঙ্গে তার নিজের কোনো সংশ্রব নেই। তবু যে সে ডেকে পাঠিয়েছে, মুখ ফুটে জানিয়েছে ওঁকে তার প্রয়োজন, এইটুকুই আজ দেবতোষের মনের মধ্যে ছড়িয়ে রইল একরাশ মিষ্টি গন্ধের মতো।

ডাক্তারের বৈকালিক ডিউটি শুরু হতে চারটা, সাড়ে চারটা। অন্য দিন সময়টা যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ে। চায়ের পেয়ালা শেষ করবার সুযোগ দিতে চায় না। আজ ঘড়ি চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সাড়ে তিনটা বাজতেই লেগে গেল সাড়ে তিন দিন। চাকরটাকে তাড়া দিয়ে ডেকে তুললেন দেবতোষ। চা তৈরী হলে কোনো রকমে গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে ধড়াচূড়া এঁটে বেরিয়ে পড়লেন। গেট পার হয়ে পা দুটো ধরতে চাইল বাঁ দিকের পথ। কয়েকটা ওয়ার্ড পেরিয়েই ফিমেল ইয়ার্ড। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। মনে হল চারপাশের লোকগুলো যেন জেনে ফেলেছে তাঁর মনের খবর। তার পর কী ভেবে আবার সেই পথেই পা বাড়িয়ে দিলেন।

আজও বুড়ী ঘরে নেই। দরজার দিকে পিছন ফিরে পা ছড়িয়ে বসে ছিল হেনা। হাতে ছিল সেলাই। সোয়েটারটা আজ শেষ করতেই হবে। ক্ষিপ্র হাতে একমনে কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফিমেল ওয়ার্ডারকে বাইরে থেকে ডাকবার জন্যে ফটকের এ-পাশে যে দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা ঝুলছে, তার মিষ্টি শব্দটা একবার তার কানে এসেছিল। সুশীলার উচ্চকণ্ঠের সাড়াও শুনতে পেয়েছিল। হয়তো রাউণ্ডে আসছে বড় জমাদার, নয়তো খাটনি বুঝে নিতে দেখা দিয়েছে গুদামী সিপাই কিংবা অন্য কোনো কাজে আর কেউ। ভাবতে ভাবতে আবার তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নিজের কাজের মধ্যে। পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘের মতো একরাশ এলো চুল। তারই

ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, সুডৌল গ্রীবার অস্পষ্ট আভাস। দুপাশ দিয়ে নেমে গেছে দুটি পেলব বাহু; উঠছে-নামছে, কাঁটা চালনার তালে তালে। বেশবাস শিথিল, হয়তো একটু অসংবৃত। হঠাৎ সিঁড়ির নিচে জুতোর শব্দ শুনতে পেয়ে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল হেনা। বুকে-পিঠে আঁচলখানা জড়িয়ে নেবার ফাঁকে চকিতে একবার চেয়ে দেখল ডাক্তারের দিকে। তার পর না পারল চোখ তুলে চাইতে, না পারল জানাতে তার প্রয়োজন। কোন এক অননুভূত সলজ্জ সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল সকল অঙ্গ।

ডাক্তারই কথা পাড়লেন, ডেকে পাঠিয়েছ, শুনলাম। কী ব্যাপার? তোমার পেশেণ্ট তো দেখছি দিব্যি পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

জড়তা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করল হেনা। ঘাড়টা তুলে মৃদু হেসে হঠাৎ বলে ফেলল, শুধু ওকে দেখতেই আসেন না কি আপনি?

চমকে উঠলেন দেবতোষ। কী বলতে চায় হেনা! এ কি শুধু সরল পরিহাস, না তাঁরই মনের গহনে অঙ্গুলি-নির্দেশ? ঐ কথা, ঐ হাসি, ঐ চাহনি—সবই যেন একটা নিগূঢ় অর্থ নিয়ে দেখা দিল তাঁর কাছে; সহসা খুলে দিল তাঁর অন্তরের একটি কক্ষের অর্গল। হেনার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে বললেন, কী বলছিলে? ওকেই শুধু দেখতে আসি কি না? তার জবাব কি আজও তুমি জানতে পার নি, হেনা?

হেনার বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। অসতর্ক কর-স্পর্শে যে স্রোতের মুখ সে খুলে দিয়েছে, ভয় হল, তাকে হয়তো আর বন্ধ করা যাবে না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই, যেন বুঝতে পারে নি, এমনিভাবে তরল কণ্ঠে বলল, বাঃ! কী যে বলেন আপনি। বুড়ী ছাড়া কি আর কারো অসুখ-বিসুখ করতে নেই? আরো তো কত জন—

—কত জন আজ থাক, হেনা, বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে বললেন

দেবতোষ, সেই একজনের কথা বলতে দাও, যাকে সত্যিই দেখতে আসি। কিন্তু শুধু দেখতে চাই, বললে কিছুই বলা হল না। তার চেয়ে অনেক বেশী আমার লোভ, অনেক বড় আমার আশা। তুমি কি জান না—

—ডাক্তারবাবু! রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল হেনা। বেদনার্ত কণ্ঠের করুণ আবেদন।

সেই করুণ চোখ দুটির দিকে চেয়ে ডাক্তার হঠাৎ থেমে গেলেন। মুহূর্তকাল বিরতির পর আবার বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জানি, যার কথা বলছি, তার ওপর আমার কোনো দাবি নেই। তবু আমাকে বলতে হবে। আজ না বললে হয়তো কোনো দিনই বলা হবে না।

—কিন্তু তার কোনো কথাই তো আপনি শোনেন নি? আপনি তো জানেন না, কী সে, কী তার পরিচয়, কী তার ইতিহাস!

—জানতে চাই না। তার দরকারও নেই। আমার কাছে সে যা, তাই। এর বেশী আর কিছুই জানবার নেই।

—আর কিছু জানবার নেই!

—না। যে কথা আমার জানবার, সে তো তুমি জান। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দেখো। তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো। তার পর বলো, কী তার উত্তর, কোথায় তার বাধা।

দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে রইল স্পন্দনহীন মূর্তির মতো। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকলেন দেবতোষ, হেনা—

—বলুন।

—চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও। যদি আজও তোমার মন তৈরী হয়ে না থাকে, আমি অপেক্ষা করব। যত দিন বলবে, তত দিন অপেক্ষা করব। আজ শুধু তোমার শেষ কথাটা জেনে যেতে চাই।

হেনার ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এল কয়েকটি অশ্রু-সিক্ত অস্ফুট শব্দ, না, না ; সে হয় না ; আমার কোনো উপায় নেই··· আমি যে—আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ব্যথাপ্লুত কণ্ঠে এই কটি কথা বলেই সে দুহাতে মুখ ঢেকে ঘরের ভিতর ছুটে চলে গেল।

সেই দুটি ছোট্ট 'না' ডাক্তারের বুকে এসে বিঁধল সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতো। বাইরের দিকে তাকালেন। মনে হল, এই আলোকোজ্জ্বল অপরাহ্নের বুকের ভিতর থেকে সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জীবনের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন ফটকের দিকে।

খাটনি-ঘরের কাছাকাছি আসতেই সুশীলা বেরিয়ে এসে নমস্কার করল। ডাক্তার নিঃশব্দে চোখ তুলে চাইলেন। সুশীলা চমকে উঠল, এ কী! আপনার কি অসুখ করেছে, ডাক্তারবাবু ?

—না ; বলো কী বলবে।

—বলছিলাম, কমলা বলে যে মেয়েটা আছে, তার অসুখ। হেনা বলেছিল তাকে একবার দেখিয়ে দিতে। আপনাকে বলে নি ?

—কী অসুখ ?

—কী জানি, কী সব পুরনো রোগ।

—কাল দেখব, বলে তেমনি আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বলছিলেন, নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, কী তার উত্তর। এত দুঃখেও হাসি পায় হেনার। নিজের মনকে কি আজও তার জানতে বাকী আছে ? সে যে কত লোভী, কত অবুঝ, তার আকাঙ্ক্ষার যে শেষ নেই! তাই আপনার অন্তরকে শুধু চোখ রাঙিয়ে এসেছে এত দিন। তার অসঙ্গত আব্দারকে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি। আজ মনে হচ্ছে, সব জোর তার নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর বোধ হয় নিজেকে সে ধরে রাখতে পারবে না।

জেল-গেটের পেটা ঘণ্টায় দুটো বেজে গেল। পাশের বিছানায়

মোনার মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে-ও তো দীর্ঘ রাত্রির সেই প্রথম প্রহর থেকে একটুখানি ঘুমের জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি! কিন্তু ঘুম আসে নি। নিমীলিত চোখের উপর কেবলই ভেসে উঠছে একখানা মুখ আর তার দুটি ক্ষমাসুন্দর চক্ষু—স্নেহে করুণায় ভাস্বর, আগ্রহে অনুরাগে প্রদীপ্ত। ঐ মানুষটা কি রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী নয়? কারাবন্দী অপরাধীর উপর মানুষের যে সহজাত ঘৃণা, স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা, সে সব কি বিধাতা তাকে একেবারেই দেন নি? তিনি তো জানেন, প্রকাশ্য আদালতের বিচারে সে জঘন্য অপরাধে দণ্ডিতা, জীবনের যে পথ ধরে এইখানে এসে সে দাঁড়াল, সে পথ পঙ্কিল, কলুষময়। তার সর্বাঙ্গে জড়ানো সেই মসীচিহ্ন কি ওঁর ঐ উদার আয়ত চোখ দুটিতে একবারও ধরা পড়ল না? সভ্য সমাজ যাকে আবর্জনার মতো আস্তাকুঁড়ে টেনে ফেলে দিল, তিনি তাকে দুহাত ধরে তুলে নিলেন, জড়াতে চাইলেন একান্ত করে, নিবিড় করে নিজের শুদ্ধ পবিত্র জীবনের সঙ্গে। প্রসন্ন সরল হাস্যে সব দ্বিধা, সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তুমি যা আছ, সে-ই তোমার পরিচয়; তার বেশী আর কিছু জানতে চাই না।

কিন্তু তিনি জানতে না চাইলেও সে তো না জানিয়ে পারে না। তিনি ভুলতে চাইলেই সে তো ভোলাতে পারে না। নিজেকে তার প্রকাশ না করে উপায় নেই। হেনার ইচ্ছা হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে নিজেকে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে দেয়, সেই পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার দেবতা, তুমি যাকে ভালোবেসেছ, সে আমি নই, সে আমার এক কল্পনা-রঙীন মিথ্যা রূপ। তোমার ঐ করুণাময় অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে তার জন্ম। সে তোমার সৃষ্টি, আমার বিধাতার সৃষ্টি নয়। হে আমার প্রিয়, তোমার কাছে যা পেলাম সে যে কত বড় পাওয়া, তা কেবল আমিই জানি। কিন্তু এ কথা কেমন করে ভুলি, তার একটা কণাও আমার পাওনা নয়? সে শুধু ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নেওয়া। আমাকে তুমি জেনে নাও। আমার অতীত,

আমার বর্তমান, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে পরিপূর্ণ আমি, তাকে তোমার সামনে তুলে ধরতে দাও। তাকে যখন দেখবে, হয়তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, ঘৃণায় ভরে উঠবে তোমার ঐ দেবচক্ষু। বুক ভেঙে গেলেও সে দুঃখ আমি সইতে পারব। কিন্তু মিথ্যা আমি, নকল আমি দিয়ে একটা দিনের তরেও তোমাকে ঠকিয়েছি, সে যন্ত্রণা আমার সইবে না।

প্রবল উত্তেজনায় হেনা বিছানার উপর উঠে বসল। বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, একথা তাঁকে জানাতেই হবে। তিনি শুনতে না চাইলেও অকপটে অসঙ্কোচে মেলে ধরতে হবে তার গ্লানিময় রূপ, খুলে দিতে হবে জীবনের যেটা অন্ধকার কক্ষ, যার মধ্যে স্তূপাকার হয়ে আছে পাপ অপরাধ আর কলঙ্কের বোঝা।

গভীর ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে এল। ধীরে ধীরে আবার শয্যাপ্রান্তে এলিয়ে পড়ল হেনা। পশ্চিম আকাশের কোন প্রান্ত থেকে এক টুকরো চাঁদ তার একটুখানি ক্ষীণ জ্যোৎস্না পাঠিয়ে দিয়েছিল খোলা জানালার পথে। সেই অপরিস্ফুট আলোয় চেয়ে দেখল আপনাকে। কেমন যেন মায়া হল নিজের উপর। বঞ্চিত জীবনের উপর এক রহস্যময় মমতা। মুহূর্ত-পূর্বে যে কঠোর সংকল্প দিয়ে নিজের মনকে সে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল, তার গ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে এল। মনে হল, থাক না ঢাকা। জীবনের যে দিনগুলো চোখের আড়ালে পড়ে আছে, থাক না তার উপরে বিস্মৃতির আবরণ। কী কাজ তাকে খুলে দিয়ে? কুয়াশার স্নিগ্ধ মায়া যদি মোহ রচনা করে থাকে কারো মনে, সূর্যের রূঢ় আলোয় তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কী লাভ? সে তো ইচ্ছা করে, ছল করে কাউকে ভোলায় নি! তবু যদি কেউ ভুলে থাকে, সে ভুল নাই বা ভাঙল! তার অনাগত জীবনের সম্পদ হয়ে থাক সেই ভুলের ফসল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, পুবদিকের জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। ধড়মড় করে উঠে পড়তেই চোখে

পড়ল পাশের খাটে বসে মোনার মা তার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, আজ তুমি হেরে গেছ, দিদিমণি! আমি তোমার আগে উঠেছি।

হেনা লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে ডাক নি কেন?

—আহা; বড্ড ঘুমুচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করলাম না। শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কথায় কথায় অমন শরীর খারাপ করে না আমার।

বিছানা থেকে নেমে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, সব তো বুঝলাম। আমাকেও ডাক নি, নিজেও বসে আছ গণেশ ঠাকুরের মতো। এদিকে গোছগাছ সব পড়ে আছে। আজ আবার বাইরের হাসপাতালে যেতে হবে, মনে আছে তো?

—আর পারি না মা! এখানেই তো বেশ চিকিচ্ছে হচ্ছে। এতেই যা হয়, হবে। এই বুড়ো হাড়ে আর টানাটানি সয় না।

—সয় না বললে হবে কেন?

—খুব হবে। তুমি ডাক্তারবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলো। তাহলেই শুনবেন। একটু থেমে উদাস সুরে বলল, তোমাদের দুজনের হাতে যদি না সারে, এ রোগ স্বগ্‌গে গিয়েও সারবে না।

তোমাদের দুজনের হাতে! হেনার বুকের মধ্যে একটা অত্যন্ত কোমল জায়গায় যেন হাত পড়ল। ব্যথায় টনটন করে উঠল সমস্ত বুকখানা। আর কোনো কথা না বলে কাপড়-জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলতলার দিকে।

দৃশ্যত সুস্থ হয়ে উঠলেও যক্ষ্মারোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকের ভাবনা সহজে ঘোচে না। উপসর্গ সব বন্ধ হয়ে গেছে। ওজন লাফিয়ে উঠছে ধাপে ধাপে। তবু ডাক্তারের হাত থেকে তার ছুটি নেই। তখনো মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে হবে রঞ্জনরশ্মির কবলে। আবার তোলা হবে আলোকচিত্র। সেই হাড়পাঁজরাগুলো আলোর সামনে তুলে

ধরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখবেন বিশেষজ্ঞ, কোথায়, কোন কোণে লুকিয়ে আছে সেই সর্বনাশা সূক্ষ্মদেহ যমদূতগুলো। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের উপর ঘনিয়ে উঠবে গাম্ভীর্যের ছায়া। তীব্র উৎকণ্ঠায় অপেক্ষমান রোগীর আত্মীয়ের দিকে মুখ তুলে বলবেন,—'নাঃ, আর একটা কোর্স নিতে হবে।' তার পর প্যাড টেনে নিয়ে লিখবেন প্রেসক্রিপশন আর তার সঙ্গে আর-এক দফা রাজসিক খাদ্যতালিকার পুনরুক্তি।

বুড়ীর এখন সেই পর্যায়। বিশেষজ্ঞের নির্দেশে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আজও তাই ছুটতে হল বাইরের হাসপাতালে। তাকে রওনা করে দিয়ে হেনার হাতে কোনো কাজ ছিল না। শরীর কাল থেকেই ক্লান্ত। তার উপরে মন ভরে আছে গভীর অবসাদে। চুপ করে পড়ে ছিল বিছানায়।

—ডাক্তার দেখা ; ডাক্তার দেখা ; এবার হল তো ? বলতে বলতে ঘরে ঢুকল কমলা, ও মা, এমন অসময়ে শুয়ে !

হেনা একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে বলল, কী করব ? কাজকর্ম নেই, তাই শুয়ে পড়লাম। বোস্ না। কী বললেন ডাক্তারবাবু ?

কমলা তার কোলের কাছটিতে বসে পড়ে বলল, কী ভীষণ ভয় হয়েছিল, জান দিদি ? কত কী হয়তো জিজ্ঞেস করবেন। কেমন করে কী উত্তর দেব ! সে সব কিচ্ছু না। খালি বললেন, কী কষ্ট হয়, বলো। আমি বললাম, গাঁটগুলোয় ব্যথা। ব্যস্।· তার পর হাতটা দেখলেন, চোখের কোণটা একটু টেনে দেখলেন। বললেন, এত দিন বল নি কেন ? রোগ কখনো পুষে রাখতে আছে ? সুশীলা মাসীমাকে বললেন, কম্পাউণ্ডারবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রক্ত নিতে হবে। যাবার সময় আর-একবার ফিরলেন আমার দিকে, কিচ্ছু ভয় নেই ; গোটা কয়েক ইনজেকশন দিলেই সেরে যাবে।···এমন মিষ্টি করে বললেন কথাগুলো ! মনে হচ্ছে, অসুখ আমার আদ্ধেক ভালো হয়ে গেছে।

হেনা হঠাৎ প্রশ্ন করল, মাসীমা কী করছে রে ?

—কেন ?

—কাজ আছে।

—ওর কাছে এখন আবার কী কাজ ?

—বিকালের দিকে একবার আফিসে নিয়ে যেতে বলব।

—আফিসে! খিল-খিল করে হেসে উঠল কমলা, চাকরি-টাকরি পেলে নাকি কিছু? সেই যে কী নাম বাবুটির? কদিন সেজেগুজে ঘোরাঘুরি করলেন। তাঁর দপ্তরে বুঝি ?

এবার হেনাও হেসে ফেলল। তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, না, ঠাট্টা নয়; জেলর সাহেবের কাছে যেতে হবে একবার।

কমলা বিস্মিত হল, জেলর সাহেবের কাছে!

—হ্যাঁ। এবার বোধ হয় সত্যিই তোকে ছেড়ে চললাম, কমলা! বলে ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

কমলা চমকে উঠল, ছেড়ে চললে! কোথায়?

—কোথায় আবার? আর কোনো জেলে। অবিশ্যি ওঁরা যদি রাজী হন।

কমলা নিশ্বাস চেপে যেন আপন মনে বলল, বুঝেছি। আশ্চর্য! ঐ মানুষের কাছ থেকেও পালাতে হয় ?

—না রে; পালাচ্ছি নিজের কাছ থেকে। নিজের ওপরে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

কমলা ক্ষণকাল তার শুষ্ক গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, সেদিন যা বলেছিলাম, আজও সেই কথাই বলব। তুমি ভুল করছ, দিদি!

—কী করব, বল, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল হেনা, বিধাতা ওঁকে অত বড় দুটো চোখ দিয়েও যখন দেন নি, আমাকে তার সুযোগ নিতে বলিস ?

—না! সেই চোখ ফোটাবার জন্যে নিজেকেই শুধু ছোট করে হেয় করে দাঁড় করাতে বলি তার সামনে।

—তোরই ভুল হল, কমলা। নিজেকে আমি ছোটও করি নি, হেয়ও করি নি, শুধু দেখাতে চেয়েছি নিজের যেটা সত্যিকারের রূপ।

—হ্যাঁ; অত্যন্ত খাঁটি দোকানদার যেমন তার খদ্দেরকে সাবধান করে দেয়, জিনিসটা দেখে-শুনে নেবেন, স্যর। ঠকবেন না যেন।

কমলার এই শ্লেষ-তিক্ত স্বর এবার তীব্র হয়ে উঠল, একবার ভেবে দেখেছ, এমনি করে কোথায় টেনে নামাচ্ছ নিজেকে, আর সেই সঙ্গে ঐ উদার সরল মানুষটাকে, যার চোখের দিকে একবার তাকালে নিজেকে শুধু নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—ইচ্ছে করে তো তাই দে না? কে মানা করছে? মুখ টিপে হাসল হেনা।

—সে কথা তো আগেই বলেছি। আমি যদি তুমি হতাম, তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে যেতাম না। না, ঠাট্টার কথা নয়, দিদি! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে মানে আরো অনেক বড়। তবু মুখ্যু ছোট বোনের একটা কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। এটা তোমার কেনা-বেচার হাট নয়। এখানে যে চোখ বুজে নিতে পারে, সেই পায়; আর যে হিসাবের খাতা খুলে বসে, সে ঠকে। কেন, নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ না? তুমি তো ওঁর কিছুই জানতে চাও নি, খুঁজতে চাও নি কোথায় লুকিয়ে আছে ওর ঠিকুজি-কুষ্ঠির ফর্দ। চোখ বুজেই তো নিয়েছ। তাই সমস্ত বুক ভরে আছে! ওঁর বেলাতেও তাই···

'বলি, খুব তো লেকচার ঝাড়া হচ্ছে, এদিকে যে কম্পাউণ্ডারবাবু সেই কখন এসে বসে আছে সুঁচ হাতে করে,' বলতে বলতে সুশীলা জমাদারনী একেবারে 'মার'-মূর্তিতে দোরগোড়ায় এসে হানা দিল।

কমলা দাঁতে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে, যাই মাসীমা। বলেই বেরিয়ে গেল।

কমলার এই শেষের কথাগুলোয় হেনার মনটা প্রথমে আবিষ্ট হয়ে এল। কিন্তু সে আবেশ কাটিয়ে উঠতেও বেশীক্ষণ লাগল না।

কথার মোহ বড় মারাত্মক জিনিস। মানুষের সঙ্গে এত বড় প্রতারণা বোধ হয় আর কেউ করে না। সত্যকে ভুলিয়ে দিতে, প্রকৃত বস্তুর উপর থেকে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করতে তার জোড়া নেই। হয়তো এই সব বড় বড় কথার ফাঁদে পড়ে কমলাও আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ভুলে গেছে, একদিন সেও পারে নি। ওর সেই প্রথম ঝি-এর পরামর্শ যদি সেদিন শুনত, সনতের কাছে লুকিয়ে রাখত জীবনের সেই চরমতম অভিশাপ, আজ তাহলে স্বামি-পুত্র নিয়ে পরম সুখে ঘর-সংসার করত। আপনার কাছে যে পরিচয়ই থাক, লোকে বলত সতী-সাধ্বী স্বামি-সোহাগিনী। সভ্য সমাজের পুণ্যবতীরা ওর পতিভাগ্যকে ঈর্ষা করত। ভবিষ্যৎ জীবনের সে উজ্জ্বল আকর্ষণ তবু ওকে নীরব থাকতে দিল না। তার কারণটা হয়তো ভেবে দেখে নি কমলা। কিন্তু কারণ অতি সহজ—ওরা যে ভালোবেসেছিল। বড় বিচিত্র বস্তু এই ভালোবাসা! সে অনেক দুঃখ সইতে পারে, অনেক আঘাত বইতে পারে, শুধু মিথ্যার সঙ্গে তার বিরোধ, প্রবঞ্চনার সঙ্গে তার আপোস চলে না।

ফটকের কাছে দড়ি-বাঁধা ঘণ্টাটা জোরে জোরে বাজতে লাগল। নিশ্চয়ই হোমবা-চোমবা কেউ। হয় জেলর, কিংবা কোনো ভিজিটর নয়তো স্বয়ং বড় সাহেব। কিন্তু আজ তো বড় সাহেবের ফাইল নয়। অদিনে অক্ষণে ফিমেল ওয়ার্ডে সুপারের আবির্ভাব বড় রকম অঘটন না হলে ঘটে না। হঠাৎ জমাদারনীর সুতীক্ষ্ণ হুঙ্কারে সমস্ত ওয়ার্ড কেঁপে উঠল—'এস্কাট্ আটেন্শন্!' সুশীলার সেই পেটেন্ট মিলিটারী কমাণ্ড। এই কমাণ্ড দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে জমাদারনী তিনটা স্বরগ্রাম ব্যবহার করে থাকে। জেলর সাহেব এলে উদারা, কোনো ভিজিটর যখন আসেন, মুদারা, আর বড় সাহেবের বেলায়, তারা। হেনার সন্দেহ হল, এটা সেই সর্বোচ্চ পরদা। ওয়ার্ডে, ওয়ার্কশপে বা কাছে-ধারে কোথাও থাকলে এখন তাকে অন্য সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে হত। আবার বসে পড়তে হত, সুশীলা যখন

হাঁক দিত, 'আজবর।' প্রথম জেলে আসবার পর জমাদার এবং জমাদারনীর মুখে এই বিচিত্র বুলি প্রত্যেক দিন শুনেও হেনা ধরতে পারে নি কথাগুলো কী এবং ভাষাটা কোন দেশের। তার পর একবার পিকেটিং না প্রসেশন, কী একটা ব্যাপারে জনকতক স্বদেশী মেয়ের জেল হয়ে গেল। তাদেরই একজন ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কথাটা হচ্ছে, স্কোয়াড্ অ্যাটেনশান্ (Squad, Attention !) আরও বলেছিল এটা নাকি হালে আমদানী। আগেকার দিনের বুলি ছিল—সরকার, সেলাম! ঐ মেয়েটির কাছেই প্রথম শুনতে পায় হেনা, 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো এই কুখ্যাত শব্দের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বহু দিনের বহু লাঞ্ছনার নির্লজ্জ ইতিহাস। সে এক দিন গেছে, যখন এই 'সরকার সেলাম' আদায় করতে গিয়ে সরকারের কত বেটন দু খণ্ড হয়ে গেছে, কত লাঠির সঙ্গে উঠে এসেছে তাজা মাংস, বুটের ঠোক্কর খেয়ে ভেঙেছে কত পাঁজরার হাড়। তবু বেয়াড়া 'স্বদেশী'কে শায়েস্তা করা যায় নি। তার পর হঠাৎ একদিন সরকার হাল ছেড়ে দিলেন এবং রাতারাতি 'সরকার সেলাম'-এর জায়গায় দেখা দিল এই স্কোয়াড্ অ্যাটেনশন্। সব দিক রক্ষা হল। শুধু মুশকিলে পড়ল জেলের যত জমাদার আর জমাদারনীর দল। কটমট বিদেশী ভাষার ঐ বিদ্‌ঘুটে কথাগুলো নানা মুখে নানা বিচিত্র আকার নিয়ে কয়েদীদের কৌতুক যোগাতে লাগল।

হেনার কানে গেল, অনেকগুলো জুতোর শব্দ নেবুগাছের ঝোপ পার হয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই সুপার সাহেব সদলবলে সামনে এসে পড়লেন। তাকে দেখিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, এটি কে? কী করছে এখানে?

জেলর সাহেব বললেন, ওই এখানকার টি-বি কেসটা দেখাশুনা করে।

—আই সী; পা ফাঁক করে, মধ্যাঙ্গ সামনের দিকে বাড়িয়ে ছোট্ট সরু লাঠিখানা পায়ের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন সুপার, বাই

দি বাই, ছাট ওল্ড উওম্যান ইজ নট কামিং ব্যাক। সিভিল সার্জেনকে বলে আমি ওখানেই ওর একটা বেড-এর ব্যবস্থা করেছি। এখানে কাউকে রাখবার দরকাব নেই। জেলবেব দিকে ফিরে ইঙ্গিতে হেনাকে উদ্দেশ করে বললেন, গিভ হাব সাম হার্ড ওয়ার্ক টু ডু।

দলবল নিয়ে ফিরে চললেন বড় সাহেব। যাবার পথে নেবু গাছগুলোর দিকে লাঠি উচিয়ে বললেন, লুকস মোর লাইক এ বোয়ার ছ্যান এ লাইম অরচার্ড। এ-সব কুঞ্জ-টুঞ্জ এখানে না থাকাই ভালো। বলে, বাঁকা দৃষ্টিতে একবাব তাকালেন দেবতোষের মুখেব দিকে।

ছু-এক জায়গায় রাউণ্ড সেরে আপিসে যাবাব পর এই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে এলেন সুপার সাহেব। বললেন, লুক হিয়ার, জেলর, ফিমেল ওয়ার্ড সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ওখানে যারা থাকে তারা কেউ সতী-সাধ্বী নয়। সেইজন্যে ওদের দৈহিক স্বাস্থ্যেব চাইতে নৈতিক স্বাস্থ্যটাই বেশী লক্ষ্য করা দরকার। ওরা নিজেরা ভালো হোক না হোক বয়ে গেল, কিন্তু আমাদেব যে-সব স্টাফ ওদের সংস্রবে আসে, তারা না বিগড়ে যায়, সেদিকে কড়া নজব দিতে হবে। আপনার কী মনে হয়?

তালুকদার অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তার পরেও মনিবকে উত্তরের অপেক্ষা করতে দেখে বলেন, নজর সব দিকেই রাখতে হয়। ওদের ভালো-মন্দটাও বাদ দেওয়া চলে না।

—ইউ আর রাইট। তবে আমার স্টাফের স্বার্থটাই আমি বেশী দেখি। আমার মনে হয়, সম্প্রতি সে বিষয়ে চিন্তিত হবার কারণ ঘটেছে। ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক সো?

তালুকদার বললেন, আমি তো সে বকম কিছু জানি না।

সুপার বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বলেন কী! ফার্স্ট এস. এ. এস. আর ঐ মেয়েটাকে জড়িয়ে কোনো কথাই কি আপনার কানে আসে নি?

—তা কিছু কিছু এসেছে। ঐ সব ব্যাপার নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, কান ভারী করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। দেখতে পাচ্ছি, সেদিকে তাদের ত্রুটি হয় নি।

—ওহ্, নো, নো, আপনি ভুল করছেন। বিশেষভাবে কারো কাছ থেকে আমি কিছু শুনি নি। তবে ওদের মধ্যে যে বেশ খানিকটা আনডিজায়ারের ঘনিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে, যাকে বলে রোমাণ্টিক রিলেশন্স্—সে কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। দি ডক্টর মাস্ট বী এ ফ্ল। ও হয়তো ঐ মেয়েটাকে একটা হিরোয়িন-টিরোয়িন ঠাউরে বসে আছে। আই অ্যাডমিট, শী হ্যাজ চার্মস অ্যাণ্ড অ্যাপিয়ার্স্ টু বী রেসপেকটেব্ল ; বাট আফ্টার অল শী ইজ এ ক্রিমিনাল!

জেলর সাহেব আর কোনো উত্তর করলেন না। মনে পড়ল, উদারপন্থী এবং অতি-আধুনিক বলে তাঁর এই মনিবটির প্রসিদ্ধি আছে। সামাজিক জীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মেলা-মেশার তিনি পক্ষপাতী, এবং সে বিষয়ে জাতি, বর্ণ বা অন্য সব কৃত্রিম বাধা স্বীকার করেন না। তাঁর নিজের মেয়ে সম্বন্ধেও নানা রকম অপ্রীতিকর জনশ্রুতি আছে। তিনি সে সব গ্রাহ্য করেন না, বরং মেয়ে এবং তার পুরুষ-বন্ধুদের খানিকটা প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকেন। এ-হেন ব্যক্তিও যে আজকার এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে উঠেছেন সেটা হঠাৎ বিসদৃশ মনে হলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তার কারণ, আফ্টার অল শী ইজ এ ক্রিমিনাল।

এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটুকু দুনিয়া থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, সর্বপ্রকারে বিভিন্ন। এখানকার যারা বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে বাইরের মানুষের মিল শুধু আকৃতির, শুধু দেহের কাঠামোয়। তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় কোনো ইস্কুলপাঠ্য কেতাবে একদিন মুখস্থ করেছিলেন ইংরেজ কবির লেখা কটা লাইন "Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage···" যিনি উচ্ছ্বাসভরে এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তিনি কোনোদিন

জেল-ফেরত কয়েদীর সাক্ষাৎ পান নি। যদি পেতেন, তাহলে বুঝতেন, অত বড় মিথ্যা কথা আর নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদ যদি কেউ ঘটাতে পারে, সে হচ্ছে ঐ স্টোন ওয়াল্‌স্‌ আর আয়রন বার্‌স্‌—এ দুটো বস্তু ভেদ করবার মতো দৃষ্টি আজ পর্যন্ত কারও চোখে দেখা দেয় নি, হয়তো কোনোকালেই দেবে না!

জেলরকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়-সাহেব মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আপনি তো দেখুন, এসব স্ক্যাণ্ডাল আমাদের বন্ধ করতেই হবে। আপাতত ওখানকার হাসপাতালটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। যদি আরো কিছু, এমন কি ড্র্যাসটিক কিছু করবার দরকার হয়, তাও করতে হবে। আচ্ছা ঐ ঘোষটাকে—

টেবিলের উপর টেলিফোন বেজে উঠল। সাহেব রিসিভার তুলে নিলেন। সেই সুযোগে জেলরও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন, বিশাল টেবিল জুড়ে জমে উঠেছে খাতা-পত্তরের পাহাড়। পাশের একটা চেয়ারে বসে আছেন দেবতোষ। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন না হলে এ সময়ে ডাক্তারের আসবার কথা নয়। তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে বললেন তালুকদার, কী হে, তোমার আবার কী দরকার পড়ল? সেই কলেরা রুগীটা বুঝি পটল তোলবার আয়োজন করছে; সদর হাসপাতালে পাঠাতে চাও? হবে না, গার্ড একেবারে নেই, মরতে হয় তো তোমার হাতেই মরুক।

—না, না। পটল তুলবে কোন দুঃখে? সে তো দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

—তবে কী? আবার একটা কুষ্ঠ কিংবা চিকেন পক্‌স্‌ জুটিয়েছ? ওসব তোমার ঐ হাসপাতালের এক কোণে রেখে দাও। 'সেল' দিতে পারব না। সব পাগল-ভর্তি।

—এসব ব্যাপার নিয়ে আসি নি, দাদা! এসেছি নিজের কাজে।

বলে, একখানা টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। তালুকদার হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে বললেন, কী এটা ?

—পড়লেই বুঝতে পারবেন।

খানিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললেন জেলর সাহেব, বুঝেছি। কলেরা নয়, কুষ্ঠও নয়। তার চেয়েও মারাত্মক কিছু।

ডাক্তার কোনো জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার চলি। আপনার মক্কেলরা সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমারও অনেক কাজ বাকী।

জেলর সাহেব হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তার চলতে শুরু করতেই প্রশ্ন করলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তোমার এই ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে কি আজকের ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক আছে ?

—না, দাদা! ছুটির কথা ক-দিন থেকেই ভাবছিলাম। কাল রাত্তিরে মন স্থির করে ফেললাম। আজ সকাল থেকেই ওটা পকেটে করে ঘুরছি।

একটু দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, অ্যাপ্লিকেশন তো দিলাম। এখন কত দিন ঝুলিয়ে রাখবেন, কে জানে ? এটা পাঠানো হবে, মঞ্জুর হবে, লোক পাওয়া যাবে কি না, পেলেও সে কবে আসবে—অন্তত মাসখানেকের ধাক্কা। তবে আপনি যদি একবার কর্তাকে বুঝিয়ে বলেন, অর্ডারের অপেক্ষা না করেই হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন। ডাক্তার সেন তো রইলেন। দরকার হলে পুলিশ হাসপাতালের মল্লিক এসে ক-দিন ঠ্যাকা দিয়ে যেতে রাজী আছে। একবার বলে দেখুন না ?

তালুকদার খানিকক্ষণ ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেব।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে

গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশবুকের বোঝা নিয়ে ব্যস্তভাবে ঢুকে পড়লেন হেড ক্লার্ক।

যে তাকিয়াটাকে আশ্রয় করে এতক্ষণ কাত হয়ে ছিলেন, এবার তারই উপর সটান শুয়ে পড়ে তালুকদার বললেন, তার পর? কী বলতেন তোমার মাস্টারমশাই?

দেবতোষ বসে ছিলেন পাশেই একটা ক্যাম্পচেয়ারে। উঠে পড়ে বললেন, দাঁড়ান, আপনার সিগারেট নিয়ে আসি।

—আর তোমার ঐ বনমালীকে বলো আর-এক কাপ চা দিতে। সত্যি, ও যে একজন ওস্তাদ চা-কর, সেটা ওর চামচে নাড়া দেখলেই বোঝা যায়।···অ্যালুসনটা বুঝলে না তো?

ডাক্তার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তালুকদার বললেন, যখন হিন্দু হস্টেলে ছিলাম, আমাদের ওয়ার্ড সারভ্যাণ্ট ছিল বংশী। একটি নতুন ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে বন্ধুর কাছে তাকে চাকর বলে উল্লেখ করেছিল। বংশী তো ভীষণ খাপ্পা। সরকারী চাকরি করে; চাকর বললে বরদাস্ত করবে কেন? তাকে ঠাণ্ডা করলেন আমাদের মহীতোষদা। ডেকে এনে বললেন, ওরে মুখ্যু, চাকর মানে চাকর নয়। ওটা সংস্কৃত কথা। চাং করোতি, ইতি চাকরঃ। তোর মতো চা করে কে?

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললেন, গল্পটা বনমালীকে শোনাতে হবে, দেখছি।

—সে কাজও কোরো না। এখন ঘাড়ে চড়ে আছে। এর পর মাথায় উঠবে। মাইনে দাও কত?

—যখন যা পারি। কোনো হিসেবপত্তর নেই।

—ওকে আমি কিডন্যাপ করব ঠিক করেছি।

—রক্ষে করুন, দাদা! তাহলে আমার চলবে কেমন করে?

—ঐ লক্ষ্মীছাড়াটাই কি চিরকাল চালাবে নাকি? লক্ষ্মী একটি জোটাতে হবে না?

—কোনো দরকার নেই। এই বেশ আছি।—বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আজ সকালেই দেবতোষের ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে। সন্ধ্যা থেকে তাঁর এই শোবার ঘরেই আস্তানা নিয়েছেন তালুকদার। ঘণ্টা দুই কোথা দিয়ে কেটে গেছে কেউ টের পান নি। আজকার বক্তা দেবতোষ। উনি শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ডুবুরি নামিয়ে তাঁর অন্তরের গহন থেকে সংগ্রহ করছিলেন যা কোনো দিন কেউ পায় নি। ডাক্তার সিগারেট নিয়ে ফিরে এলে তালুকদারও তাঁর পুরনো প্রশ্নে ফিরে গেলেন, এবার বলো তোমার সেই পাগলা মাস্টারের কাহিনী।

ডাক্তার তাঁর সেই ক্যাম্প-চেয়ারটা আবার দখল করে বললেন, আমার ওপরে ওঁর একটু বিশেষ টান ছিল, যদিও আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী জ্বালাতন করতাম। মাঝে মাঝে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, আমাদের সেই মহকুমা শহর থেকে অনেকখানি দূরে কোনো ফাঁকা মাঠে কিংবা নদীর ধারে। কত কী বলতেন। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম তাঁর মুখে—এই যে দেখছিস মাঠঘাট-গাছপালা নদীনালা, যাদের আমরা বলি বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষও এর একটা অংশ। এদের মতো সে-ও নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন। ঐ আকাশের রং যেমন বদলায়, কেন বদলায় কেউ জানে না, কেউ প্রশ্ন করে না, তেমনি মানুষেরও রং বদলায়, তার মন বদলায়। কিন্তু আমরা সে কথা মানতে চাই না। তর্কের বেলায় মানলেও কাজের বেলায় মানি না। জোর করে বলি অমুকে এ রকম হতে পারে না, তমুকে একথা বলতে পারে না। অথচ দুটোই এক, একই বিধাতার সৃষ্টি। দুয়ের মধ্যে একই লীলা একই বৈচিত্র্যের খেলা। কাল রাতে ঝড় উঠেছিল বলে, আজকের উষার হাসি তো বন্ধ থাকে না? তেমনি যে মানুষ কাল একজনের বুকে ছুরি বসিয়েছিল, আজ সে আর-একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। আসলে তারা দুটো মানুষ, যাদের

মধ্যে অনেক তফাত। কালকের বীভৎস রূপ যদি সত্যি হয়, আজকের এই মোহন রূপও মিথ্যা নয়।···গভীর আবেগের সঙ্গে এই সব কথা যখন বলতেন মাস্টারমশাই, মনে হত, এ সব শুধু কথা নয়, তাঁর মনের কোনো প্রত্যক্ষ সত্য বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাকে যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আবার ভুলে যেতাম। অন্য সকলের মতো আমিও বলতাম, পাগলা মাস্টার! কিন্তু তাঁর পাগলামির ভূত যে বরাবর আমার ঘাড়ে চেপে ছিল, বহুকাল পরে সেটা টের পেলাম, যখন এলাম আপনার এই জেলখানায়। দেখলাম খুনী, ডাকাত, পকেটমার, জোচ্চোর, গুণ্ডা বলে যাদের চিরদিন ভয় করে এসেছি, ঘৃণা করেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত কোথায়? তারাও তো খুশী হলে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে, উপকার করলে কৃতজ্ঞ হয়, ভালোবাসলে সাড়া দেয়, অপমানে ক্ষুব্ধ হয়। আমার হাসপাতালের ফালতু ফটিক বাগদী একটা বাচ্চা মেয়ের গলা টিপে মেরেছিল, এক ভরি একটা সোনার হারের জন্যে। সেদিন জমাদারের ছোট মেয়েটার ফোড়া অপারেশন দেখে কেঁদেই অস্থির। ছুটে গিয়ে কার কাছ থেকে একটা কমলালেবু এনে গুঁজে দিল মেয়েটার হাতে। সেই মুহূর্তে যে চোখ দুটো তার দেখলাম, সে তো খুনীর চোখ নয়।

দেবতোষের কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তালুকদার কোনো সাড়া দিলেন না। কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার বললেন ডাক্তার, আমার সে খ্যাপা মাস্টার আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর সেই চোখ দুটো আমার চোখের ওপর ভাসছে। সেই চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে আমি এই কয়েদীগুলোকে দেখতে চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে পড়ে, কাল রাতে ঝড় উঠেছিল বলে, আজকার ঊষার হাসি তো বন্ধ হয় না!

এবার তালুকদারের সাড়া পাওয়া গেল। চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, বাট আফটার অল দে আর ক্রিমিনাল্‌স। ডাক্তারের

মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, ক্রিমিনাল বৈ কি? জেলে যখন এসেছে।

—একজাক্টলি। বিছানার উপর উঠে বসলেন তালুকদার। তার পর বললেন, জেলেব বাইরে যে বিশাল দুনিয়া, সেখানে ঐটুকুই ওদের একমাত্র পরিচয়। জেল থেকে বেরিয়ে যখন যাবে, তখনও তারা কেবল মাত্র এক্স-কনভিক্টস। কিন্তু সে কথা আজ তোমার মাথায় ঢুকবে না। তোমার কাঁধে ভর করে আছে পাগলা মাস্টারের ভূত। চোখের দৃষ্টিই বদলে গেছে। তুমি দেখছ, হেনা মিত্র বলে যে সর্বনাশী একদিন একজনকে বিষ খাইয়েছিল, আজ আর-একজনের জন্যে সে বয়ে এনেছে অমৃত। কিন্তু ঐ বিষকন্যা যেদিন এই পাঁচিলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সারা সংসারের কাছে বিষদৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই পাবে না, তখন যদি ওকে দেখতে পাও, ওর হাতের এই সুধার ভাণ্ডটা তোমার নজরে পড়বে তো, ভায়া?

—আজ আর এ-সব কথা কেন, দাদা? মৃদু করুণ সুরে বললেন দেবতোষ। যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, পাতা উলটে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে কী লাভ?

—ভুল করলে দেবতোষ। দার্শনিকরা বলেন, জীবনটা হচ্ছে বার-বার-পড়া উপন্যাস। তার কোনো অধ্যায়ই কোনো কালে শেষ হয় না। তা ছাড়া আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেটা 'যদি'র কথা। যে-তুমি আমার সামনে বসে বকবক করছ, তার কথা নয়।

—ও, 'যদির' কথা? তাহলে বলব, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিয়েছেন। যে মানুষ একবার অমৃতের স্বাদ পেয়েছে, সে অমর। বিষ তাকে কোনো দিন স্পর্শ করবে না।

—আচ্ছা, ও-সব রূপক ছেড়ে সাদা কথায় এসো। যখন দেখবে, ঐ একটা মানুষের জন্যে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন তোমার আত্মীয়-পরিজন, আর আমাদের ভদ্র সমাজ তার দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলেন তোমার মুখের ওপর, তখন?

দেবতোষ হেসে ফেললেন, জানতে চাইছেন, তখন কী করতাম? আর যা-ই করি, যাঁরা মুখ ফেরালেন, তাঁদের মুখ দেখবার জন্যে ছটফট করতাম না, আর, যে দরজা বন্ধ হল তাও খোলবার জন্যে টানাটানি কবতাম না। কিন্তু ও-সব যদি-টদি আজ একেবারেই অবান্তব। ওগুলো আজ থাক।

বেশ রাত হয়েছিল। তালুকদার বিছানা থেকে নেমে লাঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন, তুমি তাহলে সত্যিই চললে ডাক্তার?

দেবতোষ মাথা নত করলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

—কোথায় যাবে ঠিক করলে?

ডাক্তার মাথা তুলে বললেন, ঠিক কিছুই করি নি। ভাবছি, কিছু দিন ঘুরব।

দু পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন তালুকদার। প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে কিছুই কোনো দিন জানতে চাও নি?

—জেনেছিলাম, যেটুকু আমার প্রয়োজন।

—কী সেটুকু?

—কোনোখানে ওর কোনো বাঁধন নেই।

—আমার মনে হয়, বাঁধন না থাকলেও হয়তো কোনো বাধা আছে, যা আমরা জানি না।

—জেনেও কিছু লাভ নেই দাদা! তার শেষ উত্তর পেয়ে গেছি।

—এই দেখো; আবার আমাকে দর্শনশাস্ত্র আওড়াতে হল। সংসারে শেষ বলে কিছু আছে কি?

ডাক্তারের কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

ছয়

বড় বড় জেলের বড় জমাদারের একাধিক 'রাইটার' থাকে। অনেকটা প্রাইভেট সেক্রেটারির মতো। কয়েদী হলেও তারা লেখাপড়া-জানা মাতব্বর কয়েদী। কোন নম্বরে কত আসামী বন্ধ হবে; কত গেল, কত এল; কোন কোন খাটনিতে লোক চাই, কোথায় ছাঁটাই দরকার; নতুন যারা আসছে, তাদের 'কাম পাশ' বা কাজ বন্টন, এই সব এবং এ ছাড়া দৈনন্দিন কারা-পরিচালনার আরো অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে হিসাবপত্র রাখা এবং জমাদারকে সাহায্য করাই হচ্ছে তার রাইটারদের কাজ। তাদের হাতে ক্ষমতাও প্রচুর। যারা খাটনি-বদল চায়, গম-পেষা থেকে ফুলবাগান, 'চৌকা' থেকে 'ঝাড়ু-দফা,' কিংবা 'রাস্তাচালি' (Road-repairing) থেকে 'বাতি কমান' (Lamp-lighting) রাইটারবাবুর সুপারিশ ছাড়া তাদের গতি নেই। সাধারণ কয়েদী থেকে 'পাহারা', কিংবা 'পাহারা' থেকে 'মেট' পদে যার প্রমোশন দরকার, তাকেও প্রথমটা গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঐ রাইটারের কাছে। কারা-শাসনতন্ত্রে বড় জমাদারের যে প্রতিষ্ঠা, তার অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত রাইটারের উপর।

সুশীলা বড় জমাদার নয়, জেনানা ফাটকের জমাদারনী। তার রাজ্যটা নেহাত ক্ষুদ্র, কাজকর্মও ক্ষুদ্রতর। তবু রাইটারের আকাঙ্ক্ষা তার অনেক দিনের। মহাবল সিং-এর মতো দু-তিনটা না হোক, অন্তত একটি লেখাপড়া-জানা অনুগত মেয়ে তার পায়ের কাছটিতে কম্বল বিছিয়ে বসবে, আর তার নির্দেশমতো লিখে যাবে অমুককে 'ফাটা-দরজি' (ছেঁড়া জামাকাপড় মেরামতের কাজ) থেকে ডালচাকি, তমুককে ঘাস-ছেঁড়া থেকে চালঝাড়া—এটুকু না হলে তার মর্যাদা রক্ষা হয় না। কিন্তু এমনি কপাল, লেখাপড়া জানে, এরকম কটা মেয়েই

বা জেলে আসে? কালে-ভদ্রে যদি বা এসে পড়ে তার মনের কথাটা কেউ বোঝে না। হেনা যেদিন এল, তাকে দেখে, তার চাল-চলন কথাবার্তা লক্ষ্য করে সুশীলার সেই লুপ্ত আশা আবার জেগে উঠল। মনে মনে স্থির করে ফেলল, একে আর কোনো কাজ করতে দেবে না; এর একমাত্র পদ হবে জমাদারনীর রাইটার। কিন্তু হেনাও তার অন্তরের কথাটা ধরতে পারল না। প্রস্তাবটা একরকম হেসেই উড়িয়ে দিল, 'আপনার ঐটুকু কাজ করতে আর কতক্ষণ লাগবে, মাসীমা। খাটনি বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওটা আমি দু মিনিটে করে দেব।' সুশীলা ক্ষুণ্ণ হল। কাজ তার চলে গেল ঠিকই। কিন্তু রাইটার তো হল না। যে ডাল ভাঙে, যতই লিখুক, তাকে কেউ রাইটার বলবে না।

কিছু দিন পরে ডাল-খাটনি থেকে হেনা চলে গেল টি-বি ওয়ার্ডে। তার পর বড় সাহেবের হুকুমে সে কাজ যখন তার বন্ধ হয়ে গেল, ওকে এবার কোথায় দেওয়া যায়, ভাবতে গিয়ে সুশীলার মনের কোণে হঠাৎ নতুন করে দেখা দিল সেই রাইটারের স্বপ্ন। হেনাকে ডেকে নিয়ে বলল, তোর আর খাটনি-ঘরে যেতে হবে না। কটা দিন জিরিয়ে নে। তার পর আমার এই কাজটাজগুলো একটু আধটু দেখা-শুনা করবি। আমি জেলরবাবুকে বলে সব ঠিকঠাক করে নেব। হেনা এবার বুঝল সবই, কিন্তু সায় দিতে পারল না। মনের কোণে ছুঁয়ে গেল একটুখানি ব্যথার স্পর্শ। বলল, সে হয় না মাসীমা। আগে যা করতাম, তাই করব। জেলরবাবুকে এ নিয়ে আপনি আর কিছু বলতে যাবেন না। সুশীলারও শেষ পর্যন্ত মনে হল, ওর কথাই ঠিক। এই সামান্য ব্যাপারে বড় সাহেব পর্যন্ত যখন মাথা ঘামাচ্ছেন, তখন তার মতো লোকের নাক গলানো উচিত হবে না। কর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

অনেক দিন পরে আবার যখন জাঁতার পাশে গিয়ে বসল হেনা, তখন রানীবালার ডিউটি। তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার একটুখানি নীরব হাসির আদান-প্রদান অনেকের অলক্ষ্যে হলেও হেনার চোখ

এড়াল না। অনভ্যাসের ফলে ওকে একটু ঘন ঘন হাত বদলাতে হচ্ছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কণ্ঠে বেশ খানিকটা দরদ ঢেলে বলল রানীবালা, তোমার যদি কষ্ট হয়, রেখে দাও না! বাকীটা ওরা কেউ করে দেবে।

হেনা সহজ সুরেই বলল না, না। কষ্ট হবে কেন?

—তুমি 'না' বললে কী হয়, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি। তাই ভাবছিলাম, ডাক্তারবাবুকে বলে তোমার খাটনিটা মাপ করিয়ে দেব।

কয়েকটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। কমলার কাজ ছিল না। সে বসে ছিল দরজায় ঠেসান দিয়ে। হঠাৎ বলে উঠল, দরকার হলে সেটা ও নিজেই বলতে পারবে। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

—তোমাকে তো আমি কিছু বলি নি বাছা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রানীবালা, তোমার এত জ্বলুনি কিসের?

কমলা কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই হেনার কণ্ঠে শোনা গেল চাপা ভর্ৎসনার সুর, কমলা! আর কোনো কথা না বলে সে উঠে চলে গেল। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন থমথম করতে লাগল।

বেলা গড়িয়ে গেছে। সবারই লক্ষ্য তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজটুকু সেরে ফেলা। এমন সময়ে দরজার বাইরে শোনা গেল রানীবালার গলা, এই যে নিস্তারিণী, কী খবর? নিস্তারিণীকে মেয়েরাও চেনে। ওর নাম ফালতু জমাদারনী। হাজতী-মেয়েদের যেদিন মামলার তারিখ থাকে, সেদিন ওর ডাক পড়ে তাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যাবেলা আবার পৌঁছে দেবার জন্যে। তা ছাড়া কোনো মেয়ে যখন সদর হাসপাতালে যায় কিংবা চালান হয়ে যায় অন্য জেলে, তখনও সঙ্গে যায় নিস্তারিণী।

রানীবালার প্রশ্নের জবাবে বলল, এই তো, এলাম। একটা চিঠি আছে।

—চিঠি! কার চিঠি?

—হেনা কার নাম?

—ঐ তো হেনা। কোত্থেকে এল চিঠি?

—হাসপাতাল থেকে।

হেনার হাত দুটো হঠাৎ অচল হয়ে গেল। মাথা না তুলেও বুঝতে পারল, চার দিকে সবগুলো না হোক, অন্তত কয়েকটা মুখ চাপা হাসিতে ফেটে পড়ছে। রানীবালা তাড়া দিয়ে উঠল, নাও না চিঠিখানা। ডাক্তারবাবু দিয়েছে বুঝি?

—না, না। ডাক্তারবাবু নয়, বলল নিস্তারিণী। দিয়েছে ঐ বুড়ী, কী নাম যেন!

—মোনার মা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মোনার মা।

—ও, তুমি বুঝি ঐটাকে নিয়ে আছ?

—আর বল কেন, দিদি! এরকম একটা ঘ্যান-ঘ্যানে বুড়ী জন্মে কখনো দেখি নি।

হেনার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। উঠে এসে চিঠিটা নিল নিস্তারিণীর হাত থেকে। চিঠি মানে ছেঁড়া এক টুকরা কাগজ। আঁকাবাঁকা অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লেখা। কোনো রুগীকে দিয়ে লিখিয়েছে বোধ হয়। দুটি মাত্র লাইন—'দিদিমণি, ডাক্তারবাবুকে বলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।' হেনার চোখ দুটো ছলছল কবে উঠল। এই যক্ষ্মাব্যাধিগ্রস্ত বুড়ীটাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তার মনটা যে কখন জড়িয়ে পড়েছিল, এত দিন টের পায় নি। কিন্তু বুড়ী যে ওকে কতখানি ভালোবাসে, শুধু ভালোবাসা নয়, কতখানি ভরসা করে, নির্ভর করে ওর উপর, তার পরিচয় অনেক বার পেয়েছে। তাই জেলের বাইরে গিয়েও সেই জেলেই আবার ফিবে আসবার জন্যে ছটফট করছে। সেখানকার নিয়মিত চিকিৎসা, সুদক্ষ নার্সদের সেবা-যত্ন সব ফেলে

ডাক্তারবাবু আর দিদিমণির কাছেই তার প্রাণটা পড়ে আছে। ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আর কোনো পথ চোখে পড়ে নি। এক টুকরা কাগজ পাঠিয়ে শরণ নিয়েছে সেই দিদিমণির, যে তারই মতো কিংবা তার চেয়েও অসহায়।

—ও মেয়ে, গিয়ে কী বলব বুড়ীটাকে ?

নিস্তারিণীর ডাক শুনে হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে জেগে উঠল হেনা। নিস্তার বলে চলল, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। খালি এক কথা—আমাকে দিদিমণির কাছে নিয়ে চলো।

হেনা বলল, আমি তো ওকে চিঠি দিতে পারি না। আপনি বুঝিয়ে বলবেন, ওখানে থাকলেই শীগগির ভালো হয়ে যাবে। ভালো হলেই ওঁরা এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আর বলবেন, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলে আমি ভীষণ রাগ করব।

পরদিন বিকালবেলা। সুশীলার আসবার কথা চারটা সাড়ে চারটায়। এল প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। বৈকালিক খাওয়া-দাওয়া সেরে হেনা একা-একা গেটের কাছটায় বেড়াচ্ছিল। সুশীলাকে দেখে বলল, আজ এত দেরি যে মাসীমা ?

—মিটিংএ গিয়েছিলাম।—সুশীলার চোখে-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।

—মিটিং-এ ! কোথায় মিটিং ?

—জেলখানার বড় মাঠে।

—জেলখানায় আবার মিটিং হয় নাকি ?

—আমিও তো তাই জানতাম। জেলখানায় এ সব কাণ্ড আমার তিন কুলে কেউ শোনে নি, দেখা তো দূরের কথা। আজ দেখে এলাম নিজের চোখে।

হেনারও কৌতূহল বেড়ে গেল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, কিসের মিটিং মাসীমা ?

সুশীলা যেন মনে মনে সেই দৃশ্যটা স্মরণ করে বলল, আমাদের ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছেন, কয়েদীরা তাকে বিদায় দিয়ে গেল। একটু

থেমে আবার বলল, মাঠভর্তি লোক। উনি বসে আছেন ঠিক সামনে। পাশে রয়েছেন জেলরবাবু। আর সব বাবুরাও রয়েছে। একে একে এসে মালা দিয়ে যাচ্ছে ওঁর গলায়, সেলাম করছে, কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সব দেখে এলাম। বাইশ বছর জেলখানায় আছি। কত বাবু দেখলাম। কত জেলর, ডাক্তার বদলি হয়েছে, ছুটি নিয়ে গেছে। বাবুরা মিলে অফিসে বসে চা-টা খাইয়েছে কাউকে কাউকে। কিন্তু এ রকম কয়েদীর মেলা কোনো দিন হয় নি।

হেনা আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু চেয়ে রইল দূরে ঐ আমগাছটার দিকে।

সুশীলা আবার শুরু করল, কী সুন্দর বক্তিতা দিলেন, একবার যদি শুনতিস ?

হেনা হাসল মৃদু হাসি, হ্যাঁ, আমার আর কাজ কী! জেলের মাঠে বক্তৃতা শুনতে যাই। কী বললেন ?

—সে সব কি আমি ছাই বুঝি ? কিন্তু ভারি ভালো লাগছিল। কয়েদীগুলোর কী কান্না! সক্কলের মুখে এক কথা, এ রকম বাবু আর হবে না।

দড়ি-বাঁধা ঘণ্টা বেজে উঠল। জমাদার আসছে লকআপ-এর উদ্যোগ করতে। সুশীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বহুদর্শী জমাদারনী ঠিকই বলেছে। জেলের কোনো অফিসার চলে যাচ্ছেন বদলি হয়ে, কিংবা ছুটি নিয়ে, আর কয়েদীরা দিচ্ছে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন, এ রকম ঘটনা ছিল নিতান্তই অভাবনীয়। শাসক এবং শাসিতের যে সম্বন্ধ, তার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই। এক পক্ষ হুকুম করবে, আর-এক পক্ষ তামিল করবে, তার বেশী আর কিছু নয়। কারো বেলায় কোনো ব্যতিক্রম যদি ঘটত, হুকুমের বর্ম ভেদ করে দেখা দিত অন্তরের যোগসূত্র, কর্তৃপক্ষ বিচলিত হতেন। কয়েদীরা যাকে প্রীতির চক্ষে দেখে, তার উপরে পড়ত সরকারের

সন্দেহ-চক্ষু। এক পক্ষের অনুরাগ মানেই অন্য পক্ষের বিরাগ। কয়েদী মহলে জনপ্রিয় হওয়াটা কৃতী এবং জবরদস্ত অফিসারের কাম্য নয়, চাকরির দিক দিয়েও নিরাপদ ছিল না। বন্দীরা সে কথা জানত। তাই প্রিয় ব্যক্তির প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাপ্রীতি সেটা নীরবে জানিয়েই ক্ষান্ত হত। আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সাহস করত না। দেবতোষকে নিয়ে হঠাৎ এক দারুণ দুঃসাহসের কাজ করে বসল এ জেলের কয়েদীরা। তাদের তরফ থেকে জনকয়েক প্রতিনিধি জেলর সাহেবের কাছে গিয়ে জানাল, তারা সবাই একত্র হয়ে ডাক্তারবাবুকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চায়। দেবতোষের উপর সাধারণ বন্দীদের মনোভাব তালুকদারের অজানা ছিল না। এই ব্যাপারটাকে সাময়িক হুজুক বলে লঘু করে দেখলে ভুল করা হবে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই তিনি কয়েদীদের আবেদন সুপারের কাছে হাজির করেছিলেন।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর এই ডাক্তারটিকে উপলক্ষ করে জেলের ডিসিপ্লিনে যে ভাঙন ধরেছে, এটা তারই শোচনীয় পরিণতি। হঠাৎ মনে হল, এ প্রস্তাব একটা সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ। তিনি এবং তাঁর শাসন-নীতি যাকে অবাঞ্ছিত মনে করে প্রকারান্তরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তাকেই তারা ঘটা করে দেবে ফেয়ার-ওয়েল! মেজর সাহেবের ঠোঁটের কোণে একটু ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। জেলরের দিকে ফিরে বললেন, ঐ লীডারদের জানিয়ে দিন, ওদের চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাক্‌সেপ্ট করলাম। ফেয়ারওয়েল হতে দেব না। তারপর দেখি ওদের দৌড় কতদূর।

তালুকদার মনিবের মনের কথাটা বুঝতে পেরে শান্তকণ্ঠে বললেন, তাতে জিত হবে ওদেরই।

—মানে? রুক্ষ কণ্ঠে জানতে চাইলেন মেজর।

—আপনি যাকে মনে করছেন চ্যালেঞ্জ, সেইটাই তখন সব আক্রু

খুলে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। ওদের মিটিং বন্ধ হবে বটে, কিন্তু আমাদের মুখ রক্ষা হবে না।

সুপার কিঞ্চিৎ নরম হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাহলে ওদের ঐ ছেলেখেলাটা হতে দেওয়া, মানে ইগ্‌নোর করাই আপনার ইচ্ছা ? বেশ তাই করুন।

সুতরাং মিটিং হল। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েদীরা এসে সার বেঁধে বসে পড়ল ঘাসের উপব। তাদের সামনে এক লাইন চেয়ার দখল করলেন বাবুরা। মাঝখানটিতে বসলেন দেবতোষ, তার পাশেই সভাপতির আসনে রইলেন জেলর সাহেব। সময়োপযোগী ভাষণও একটা দিতে হল। বন্দীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ উঠে দু-চার কথা বলতে চেষ্টা করল তাদের অনভ্যস্ত কাঁচা ভাষায়। যা বলা হল, তার চেয়ে অনেক বেশী রইল না-বলা। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন দেবতোষ। বললেন, আমার বন্ধুদের মতো আমি ঠিক জেলখানার লোক নই। হঠাৎ এসে পড়েছিলাম ; হঠাৎই আবার চলে যাচ্ছি। এই কটা দিন আমার চিরদিনই মনে থাকবে।

জেলখানায় চাকরি পাবার কাহিনী উল্লেখ করে বললেন, কত ভয় হয়েছিল মনে মনে। যত না ভয় তার চেয়ে অনেক বেশী লজ্জা। লোকে বলবে জেলের ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! আজ বুঝতে পারছি, এখানে না এলে জীবনের একটা বড় দিক আমার কাছে অন্ধকার থেকে যেত। বাইরের হাসপাতালে ডাক্তারি করতে গিয়ে দেখেছি, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ। এখানে এসে দেখলাম ব্যাধিগ্রস্ত মন। কিন্তু এদের ভালো করবার মতো ওষুধ আমার জানা নেই। মানুষের হাতে-পায়ে যখন আঘাত লাগে, সে ব্যথা আমরা সারিয়ে দিই, কিন্তু তার মনে যখন আঘাত লাগে, সেখানে যখন ক্ষত দেখা দেয়, আমাদের কিছুই করবার নেই। অথচ, কে না জানে, সেই আঘাত বা ক্ষত থেকেই জন্ম নেয় অপরাধের অঙ্কুর, যাকে আমরা বলি ক্রাইম। আমাদের শরীরের উত্তাপ যদি বেড়ে যায়, আমরা তাকে বলি জ্বর।

সে হল দেহের একটা সাময়িক বিকার। তার চিকিৎসা আছে, প্রতিকার আছে, যার ফলে সে বিকার চলে যায়; রুগী আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কোনো কারণে মানুষের অন্তরের উত্তাপ যখন বেড়ে যায়, তার কর্মে আচরণে দেখা দেয় বিকৃতির লক্ষণ, আমরা তার নাম দিই অপরাধ। সেই অপরাধী অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত মানুষটাকে ধরে এনে আটকে রাখি জেলখানায়। তাকে সুস্থ করবার, নিরাময় করবার, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেবার কোনো বিধান তো আমাদের শাস্ত্রে নেই। সে ডাক্তারি আমি শিখি নি। শেখবার কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও জানি না। যদি থাকত, আমাদের এই থার্মোমিটার বা স্টেথোস্কোপ দিয়ে যেমন জ্বর মাপি, হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন কিংবা ফুসফুসের শক্তি পরখ করি, তেমনি একটা কিছু যদি থাকত যা দিয়ে মাপা যায় অপরাধীর মনের দাহ, তার হৃদয় বা মস্তিষ্কের কুটিল গতি, তাহলে বোধ হয় এত বড় পাঁচিল, এত সব সিপাই-শাস্ত্রী, গুলি-বন্দুকের দরকার হত না। জেলের বদলে গড়ে উঠত আর-এক রকমের নতুন হাসপাতাল। খুলে যেত মানব-সেবার আর-একটা নতুন দ্বার।

বাবুদের লাইনে কেউ কেউ উশখুশ শুরু করলেন। কারো কারো মুখে দেখা দিল চাপা হাসি। দেবতোষ সেটা লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, আমার পক্ষে এ-সব হয়তো অনধিকারচর্চা। জেলের আইন-কানুন আমি পুরোপুরি জানি না। সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু জানিয়ে যাচ্ছি আমার অক্ষমতা। তোমাদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারি নি। তোমরা যারা আমাকে ভালোবেসেছিলে, তাদের কাছে স্বীকার করছি, সে ভালোবাসা পাবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই।

সুশীলা অত্যুক্তি করে নি। ডাক্তারের বেশীর ভাগ কথা সেও যেমন বোঝে নি, কয়েদীরাও তেমনি বুঝতে পারে নি। তবু, এই দুর্বোধ্য কথাগুলো শুনতে শুনতেই তাদের চোখের জল সেদিন বাধা

মানে নি। কথা বুঝতে বুদ্ধি লাগে, শিক্ষা লাগে। সেটা ওদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তার পেছনে সে সুর সেটা বুঝতে লাগে হৃদয়। সেখানটায় বোধ হয় কোনো অভাব ছিল না।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, তবু একটা অর্থহীন ক্ষীণ আশা হেনার মনের কোণে জড়িয়ে ছিল,—যাবার আগে একবার তিনি আসবেন। সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও ছিল, যদি আসেন আর সেই উদার চোখ দুটি তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, হেনা আমি যাচ্ছি, কী বলবে সে? হয়তো সেই দৃষ্টির সামনে মাথাটা তার আপনিই নুয়ে পড়বে। একটি বার চেয়ে দেখা হবে না, একটি কথাও বলা হবে না। বলবার বা শোনবার আর আছেই বা কী? তাই হয় তো আসেন নি। কিন্তু তার জন্যে না আসুন, আরো তো কত মেয়ে আছে এই জেনানা ফাটকে, যারা তাঁর কাছে কতরকমে ঋণী। কমলা আছে, বীণা আছে, যাদের চিকিৎসা সবে শুরু করেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেন নি। তাদের ব্যবস্থা অবশ্য তিনি করে গেছেন। নতুন ডাক্তার তাঁরই নির্দেশমতো ওষুধ ইনজেকশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু কি একবার আসতে নেই? কী ক্ষতি হত যদি মিনিট কয়েকের জন্যে একটি বার এসে দাঁড়াতেন এই ওয়ার্ডের সামনে, আর মেয়েরা এসে একে একে জানিয়ে যেত তাদের শ্রদ্ধানত অন্তরের নিঃশব্দ প্রণাম? ক্ষতি হোক আর না হোক, তিনি আসেন নি। সুশীলার কাছেই খবর পেয়েছিল হেনা তিনি চলে গেছেন। কোথায়, তা সে জানে না। এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো প্রত্যাশিত। এতে অভিযোগ করবার, নালিশ জানাবার কী আছে? তবু তার মনে হল, বুকের একটা দিক কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। তার মধ্যে কিসের একটা যন্ত্রণা, খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা বঞ্চনা! অর্থহীন বেদনায় চোখের কোণ দুটো ভিজে ওঠে।

মনে হয় এক দিন কোথাও একটা আশ্রয় ছিল। আজ আর নেই।

এক সপ্তাহের উপর হল দেবতোষ চলে গেছেন। বুড়ী ফিরে আসে নি। নেবুতলার হাতপাতাল বন্ধ। জমাদারকে বলে-কয়ে ক-দিন হল একটা সেল-এ থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে হেনা। নির্দিষ্ট খাটনি করে আর সুশীলার ফাই-ফরমাশ খেটে যেটুকু সময় বাঁচে, ঐ নির্জন ছোট ঘরটাতেই সে কাটিয়ে দেয়। সেল-এ আলোর ব্যবস্থা নেই। নিশি আসবার আগেই যেখানে নৈশ-ভোজনের পাট সেরে নিতে হয়, এবং সূর্যঠাকুর পাটে বসতে না বসতেই বন্ধ হয়ে যায় গরাদে-দেওয়া লৌহকপাট, সেখানে আলো একটা অনাবশ্যক বিলাস মাত্র। দুটো কম্বল বিছিয়ে নিতে ক মিনিট সময় লাগে। দু মিনিট? তার পর আলোর কী প্রয়োজন? লেখাপড়া? তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর সে অধিকার নেই। যদি বলেন, তবে লাইব্রেরি আছে কিসের জন্যে? ওটা শুধু রবিবারের রিক্রিয়েশান। রবিবার ছাড়াও সে সুবিধা ওদের দেওয়া হয় বছরে ন দিন, যাকে বল জেলহলিডে। সব কটাই কোনো না কোনো পর্বের দিন—তিনটি হিন্দু, তিনটি মুসলমান, তিনটি খ্রীষ্টান। সর্বধর্মে সমদৃষ্টি। অভিযোগের অবকাশ নেই কোনো তরফেই। ঐ নটা দিন খাটনির বদলে বই পড়ো কিংবা দশ-পঁচিশ খেলো। কিন্তু সব দিনের বেলায়। জেলের রাতগুলো শুধু ঘুমের জন্যে। কথা বলতে চাও, নিজের সঙ্গে বলো। গান করতে চাও, তাও নীরবে। "Strict silence should be maintained at all times."—লেখা আছে জেল কোড্-এ।

আইনে যার বিধান নেই, কিংবা তার মতো অন্য সকলের জন্যে যে ব্যবস্থা হয় নি, এমন কিছুই হেনা কোনো দিন চায় নি, দিলেও প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ এত দিন পরে তার সে কঠোর নিয়ম শিথিল করতে হল। অনেক ভেবে, অনেক ইতস্তত করে একদিন সুশীলার দরবারে পেশ করল তার আরজি, আপনার কাছে দুটো জিনিস চাইতে এলাম, মাসীমা।

সুশীলা খোশ মেজাজে ছিল। বলল, কী জিনিস,—একটা দড়ি আর একটা কলসী ?

—তা আপনি দিতে পারবেন না। দিলেও লাভ নেই। একটা পুকুর চাই, তা না হলে ওগুলো কাজে লাগবে না।

—তবে কী তোমার কাজে লাগবে শুনি ?

—একটা আলো আর একটা খাতা।

সুশীলার মুখ গম্ভীর হল। হ্যারিকেনের সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রতিটি লণ্ঠনের জন্য যে তেলের বরাদ্দ আছে, শীতকালে দু ছটাক আর গরমকালে দেড় ছটাক, তার বেলাতেও হিসাবের কড়াকড়ি। একটা ফালতু আলো চাইতে হলে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে গুদামীবাবুর সেরেস্তায় এবং প্রচুর তৈলমর্দন করেও এক ছটাক তৈল-সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই সামান্য বিষয়ে হার স্বীকার করলে এত বড় জেলের জমাদারনীর মান থাকে না। বিশেষ করে, যে কোনোদিন কিছু চায় না, সেধে দিতে গেলেও হাত গুটিয়ে নেয়, তার এই আব্দারটুকু না রাখতে পারলে মনই বা বুঝ মানে কেমন করে ? আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে এক ঝলক বিদ্যুৎ-শিখার মতো হাসপাতালের লণ্ঠনটা সুশীলার চোখের উপর ভেসে উঠল, এবং তারই আলোয় মুখের গাম্ভীর্যটাও এক নিমেষে কেটে গেল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, আলোর জন্যে ভাবনা কী ? জমাদার এলে মনে করিস, হাসপাতালে যে বাতিটা পড়ে আছে, বের করে দেব।

হেনা আশ্বস্ত হতে পারল না। বলল, কিন্তু, ওটা যদি ওঁরা ফেরত চান ? হাসপাতাল তো বন্ধ হয়ে গেছে।

—আরে না, না। ফেরত অমনি চাইলেই হল ?

মুখে ভরসা দিল বটে, কিন্তু সে বিষয়ে উদ্বেগ সুশীলার মনেও কম ছিল না। তবু, আপাতত সমাধান একটা হয়ে গেল। গোল বাধল ঐ দুনম্বরে। জেলসুপার কয়েদী-বিশেষে খাতা কেনবার

অনুমতি দিতে পারেন সরকারী খরচে নয়, কয়েদীর নিজের পয়সায়। হেনার তো কোনো টাকা-পয়সা জমা নেই। বাইরে থেকে একটা খাতা যদি তার কোনো আপনার জন জেলগেটে দিয়ে যায় তাতেও বাধা ছিল না। কিন্তু তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আইন বাঁচিয়ে প্রকাশ্যভাবে অফিস-মারফত এই সামান্য জিনিসটাও সুশীলার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও শুধু খাতা কেন, আরো অনেক কিছু তার এই একান্ত স্নেহের পাত্রীটির হাতে দেবার জন্যে সে ব্যাকুল। হেনা তার 'আপনার জন' নয়, তার হেফাজতে রাখা একজন কয়েদী মাত্র। তার সঙ্গে এই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখবেন না। বিশেষ করে বড় সাহেব এবং আরো ক-জন বাবু যে এই মেয়েটির উপর প্রসন্ন নন, সে কথা আজ আর অজানা নেই। নিজের এই অসহায় অক্ষমতা অনুভব করে সুশীলার মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। হেনার দিকে ফিরে অনেকটা যেন সান্ত্বনার সুরে বলল, খাতা দিয়ে কী করবি? বই-টই আছে, তাই পড়।

এই সান্ত্বনার আড়ালে আসল অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেনারও সঙ্কোচের অবধি ছিল না। তাই সুশীলার উত্তরে বেশ খানিকটা উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, তাই ভালো। বই-টই বরং এনে দেবেন মাঝে মাঝে। খাতা এখন থাক। আলোটাই আমার বেশী দরকার ছিল।

খাতা উপলক্ষ করে এই ছলনাটুকু দুজনের কারো কাছেই গোপন রইল না এবং হেনার অতিরিক্ত খুশির সুর আর-এক জনের বুকে গিয়ে বিঁধল। দুটো দিন সমস্ত কাজকর্ম চলা-ফেরার মধ্যে তার মনের একটা কোণ জুড়ে রইল একখানা কালো মেঘ। সে মেঘ নেমে গেল তৃতীয় দিন ভোরবেলা, যখন তার হু-হাত-লম্বা চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা মোটা বাঁধানো খাতা এবং সেদিকে তাকিয়ে হেনার মুখে ভেসে উঠল সত্যিকার খুশির আলো। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, এটা ভালো করেন নি মাসীমা। ওরা যদি জানতে পারে?

—হ্যাঁ, জানতে পেরে তো আমার সব করবে।

—তা ছাড়া, এতে জেলের ছাপ নেই, বড় সাহেবের সই নেই। তালাসি করতে এলেই তো কেড়ে নিয়ে যাবে। আমার শাস্তি হবে, সেজন্যে ভয় করি না, কিন্তু আপনাকেও পড়তে হবে কত কী কৈফিয়তের দায়ে।

সে ভাবনা সুশীলার মনেও কম ছিল না। একটু কী ভেবে নিয়ে বলল, এক সময়ে দিস খাতাখানা। লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে কেরানী-বাবুকে বলে-কয়ে যদি একটা সীল দিয়ে আনতে পারি, দেখব।

ইশ, এ খাতা আমি দিলাম আর কি! ছেলেমানুষের মতো মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল হেনা। যদি আর ফিরিয়ে না দেয়। আসুক না তালাসি—বলে, আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল খাতাখানা।

সাত

একজনের সংসার, জিনিসপত্রের বাহুল্য নেই। যেটুকু ছিল, তাও দরাজভাবে বিলিয়ে ছড়িয়ে খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। চোখে পড়বার মতো রইল শুধু একটা বড় আকারের প্যাকিং কেস। তার মধ্যে ভর্তি বই। জিনিস ছাঁটাই যতই সহজ হোক, মানুষ ছাঁটাই একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বনমালীকে দেশে যেতে হবে। কিন্তু মনিবকে একা ছেড়ে দেওয়া তার একেবারেই ইচ্ছা নয়। তাকে রাজী করাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেবতোষের পরিকল্পনা কিছু অদল-বদল করতে হল। নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার আগে কিছু দিন তার বিক্রমপুরের গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। অনেক দিন মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। কয়েক মাস আগে এখানে একবার এসেছিলেন সুলোচনা দেবী। বাড়ি ফেলে

বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় নি। ছেলেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখেন, কিন্তু যাবার জন্যে কোনোদিন পীড়াপীড়ি করেন নি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, যেদিন ওর ইচ্ছা হবে আপনিই আসবে। ভালো আছে, এইটুকু জানলেই আমার হল। সে খবরটা অবশ্য নিয়মিত জানিয়ে থাকেন দেবতোষ। সংসারে তাঁরও তো ঐ এক মা। শুধু বনমালীকে এড়ানো নয়, কটা দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাকবার জন্যে তাঁর নিজের গরজও কম ছিল না।

খালবিলের দেশ। স্টীমার-স্টেশন থেকে পঁচিশ মাইল নৌকা-পথ। সকালে রওনা দিয়ে বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ। সুলোচনা দেবী একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। উঠোনে ধান শুকোচ্ছিল, পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছিল রাধুর মা। দাদাবাবুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিতেই ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ রে, একটা খবর দিতেও পারিস নি? সারা দিন পেটে একদানা ভাত পড়ে নি। ছুটো চাল ফুটিয়ে নামাতে যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

দেবতোষ হাসতে হাসতে বললেন, কেন, দুপুরবেলা যা রেঁধেছিলে, দুজনে মিলে সব বুঝি চেঁছে-মুছে খেয়েছ? পাতে কিচ্ছু নেই?

—শোনো, ছেলের কথা! আমি কি জানি, তুই আসবি?

রাধুর মা বলল, হাঁড়িতে তো ভাত রয়েছে, মা! ডাল-তরকারি যা আছে, দাদাবাবুর হয়ে যাবে।

—সে তো যাবে। কিন্তু সেই ওবেলার শুকনো আলো চালের ভাত খেতে পারবে কেন? তুই যা, ছুটো চাল ধুয়ে আন।

—কিচ্ছু দরকার নেই মা, বাধা দিয়ে বললেন দেবতোষ, যা আছে, তাই দাও। কতকাল তোমার 'দুলা' খাই নি মনে করতে পার?

সুলোচনা হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না। ভাবলেন, কী বলে পাগল ছেলে! তাঁর মনে নেই? এই তো সেদিনের কথা, ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের পাতের ভাত-তরকারি না পেলে ছেলে কুরুক্ষেত্র

বাধিয়ে বসত। শুধু পাতের হলেই চলবে না। মেখে ডেলা পাকিয়ে রাখতে হবে। শুকনো শুকনো করে মাখা সেই 'দলা'ই ছিল দেবতোষেব কাছে অমৃত। শেষ কণাটি পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলত। অথচ অন্যের হাতের অনেক বেশী উপাদেয় রান্না তার মুখে রুচত না।

খালের ঘাটে স্নান সেরে রান্নাঘরের বারান্দায় কাঁটাল কাঠের পিঁড়ির উপর এসে বসলেন দেবতোষ। সেই আগের দিনের মতো সুলোচনা ভাত মেখে মেখে তুলে দিলেন তার পাতের উপর। দেবতোষ পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, আমি যে আসব, তুমি নিশ্চয়ই জানতে, মা! যা যা ভালোবাসি, সবই তো রেঁধেছ। মোচার ঘণ্ট, থোড়ছেঁচকি, কুমড়োর ডগা দিয়ে মটর ডাল, কুলের অম্বল—কোনোটাই বাদ পড়ে নি।

সুলোচনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি কী করে জানব, বাবা? যিনি সব জানেন, এ তাঁরই কাজ। তিনিই হয়তো আমার হাত দিয়ে এই জিনিস কটা রাঁধিয়ে রেখেছেন তোর জন্যে।

গ্রামের সঙ্গে দেবতোষের আশৈশব নাড়ির যোগ। কিন্তু এবার তার কোথায় যেন একটা বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। দুদিন যেতে না যেতেই সেটা মার চোখেও ধরা পড়ল। দেখলেন, ছেলে তেমনি মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ-খবর নেয়, অসুখেবিসুখে ডাকতে এলে যায়, যা করবার করে। তবু বোঝা যায়, এ সব শুধু অভ্যাসের টান, এ সবের মধ্যে মন কোথাও নীড় বাঁধতে পারছে না, হয়তো আশ্রয় খুঁজে ফিরছে অন্য কোনোখানে।

হ্যাঁ রে, দেবু, বনমালী ভালো আছে তো? একদিন প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

হ্যাঁ, মা, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে আর আমাকে ফিরতে হবে না। চার মাসের ছুটি নিয়েছি।

সুলোচনার মুখে হঠাৎ দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু ছেলেকে তা জানতে দিলেন না, অন্য কথা পাড়লেন, মহেশ কি ওখানেই আছে না বদলি হয়ে গেছে ?

—ওখানেই আছেন।

—তার ছেলে দুটি ?

—তারা তো ওখানে থাকে না। কোলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে।

—ওখানে আর কার কাছে থাকবে ? বলে নিশ্বাস ফেললেন সুলোচনা। আহা ! ঐ রকম মানুষ, তার কপাল দেখো।

সুলোচনা চলে যাচ্ছিলেন। দেবতোষ কী একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন দেখে ফিরে দাঁড়ালেন, কিছু বলবি ?

—বলছিলাম, এবার একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যেতে চাস ?

—প্রথম কিছুদিন কোলকাতা। তারপর, ভাবছি একবার দক্ষিণ দিকে বেরোব। তুমিও চলো না ?

সুলোচনা কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে নড়তে চান না। দেবতোষ দু-চার বার চেষ্টা করেছেন তীর্থের নাম করে মাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু ওঁর মুখে ঐ এক কথা—এই শ্বশুরের ভিটেই আমার সবচেয়ে বড় তীর্থ, বাবা ! এখানে যদি চোখ বুজতে পারি, আর তোর হাতের একটু আগুন পাই, তাহলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই কথা বলেই দেবতোষের এই ঘুরে আসার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি না দিতে পারতেন। কিন্তু এই কদিন তার মুখের দিকে চেয়ে সহজেই বুঝতে পেরেছেন, তাঁর এই আত্মভোলা ছেলেটির উদার নির্লিপ্ত মনের কোণে এমন কোনো দাগ লেগেছে, যেখানে মায়ের হাতের একটুখানি স্পর্শ তার একান্ত প্রয়োজন। কে জানে, হয়তো সেই জন্যেই সে সকলের আগে মায়ের কাছেই ছুটে এসেছে। সুতরাং ছেলের জন্যে কিছু দিন অন্তত তাঁর শ্বশুরের ভিটার মায়া ত্যাগ করা দরকার।

কর্তাদের আমল থেকে কলকাতায় ওঁদের একটা এজমালি বাসা রয়ে গেছে। দেবতোষের জ্যাঠতুতো ভাই মহীতোষ সেখানে স্থায়িভাবে বাস করে। দোতলার এক পাশে খান তিনেক ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি নিয়ে একটা অংশ সুলোচনা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন। আপাতত সেইখানে গিয়ে ওঠাই স্থির হল।

আট

এই তো সে দিনের কথা। হেনা মনে মনে স্থির করেছিল, এ জেল তাকে ছাড়তে হবে। সে অনুরোধ জানাবার আগে জেলর সাহেবের কাছে কী বলবে, কতটুকু বলবে, তা-ও সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছিল। কমলার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল, নিজের কাছ থেকে পালাতে চাই। তার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্রোত এমন জায়গায় তাকে নিয়ে এল, যেখানে আর পালাবার প্রয়োজন রইল না। যাঁকে উপলক্ষ করে সে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তিনিই নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, সমস্ত ভয়-ভাবনা-সমস্যার হাত থেকে তাকে চিরদিনের তরে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই মুক্তিই কি সে চেয়েছিল? শূন্যতা তো মুক্তি নয়? এ যেন প্রতিদিন তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। একদিন সে বন্ধন থেকে পালাতে চেয়েছিল, আজ এই নিরালম্ব রিক্ততা থেকে পালাতে চায়। আজকার প্রয়োজন যেন আরো বেশী। জেনানা ফাটকের এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে প্রতিটি ছোট-বড় পরিচিত বস্তু তাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে যেতে হবে, এখানে তোমার জায়গা নেই। জেলর সাহেব তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তার অন্তরের এই অর্থহীন ব্যাকুলতা তিনি বুঝতে চাইলেও সে বোঝাবে কেমন করে? এই বিষ বুকে করে কোন মুখে, কোন লজ্জায় সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কী উত্তর দেবে

যখন জানতে চাইবেন, কী তোমার কষ্ট? কিসের জন্য তুমি চলে যেতে চাও?

এমনি যখন তার মনের অবস্থা, তখন একদিন সকালবেলা সুশীলা এসে জানাল, জেলর সাহেব তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হেনার হঠাৎ মনে হল, তিনি বোধ হয় অন্তর্যামী। তার মনের ডাক শুনতে পেয়েছেন। সুশীলা বলল, তৈরী থাকিস। চারটার সময় উনি আফিসে এলেই নিয়ে যাব।

পথে যেতে যেতে হেনার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বুকের ভিতরে দুরু-দুরু করছে কিসের যেন আশঙ্কা। কেন ডেকেছেন, আপনি কিছু জানেন মাসীমা? শুষ্ক মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল সুশীলাকে।

সুশীলা হেসে ফেলল, ভয় নেই। ফাঁসি দেবেন না তোকে।

একটা কী ফাইল দেখছিলেন তালুকদার। ওদের সাড়া পেয়ে চোখ তুললেন। সুশীলা সেলাম করে বলল, আমি তাহলে যাই বাবা! খাটনিটা বুঝিয়ে দিয়ে এসে ওকে নিয়ে যাব।

জেলরবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। দু-তিন মিনিট পরে ফাইলটা বন্ধ করে ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, হ্যাঁ; তোমাকে ডেকেছিলাম; একটা কাজ করতে হবে।

হেনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তালুকদার বললেন, ভাবছিলাম, মেয়েদের কিছু উলের কাজ শেখালে কেমন হয়? এই যেমন ধরো—মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, মাফলার এসব যদি বুনতে শেখে, জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা করে খাবার সংস্থান হতে পারে।

হেনা ঘাড় নেড়ে জানাল, এ বিষয়ে সে একমত।

—শেখাবার ভারটা তোমাকে দিতে চাই।

—আমি পারব কি? বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল হেনা।

—কেন পারবে না? আমি তো তোমার হাতের কাজ দেখেছি। হেনা মাথা নত করল। হাতের কাজের প্রমাণটা সুশীলা লুকিয়ে

রাখতে চাইলেও জেলর সাহেবের কাছে গোপন নেই, এটুকু জানতে পেরে লজ্জিত হল। তালুকদার বললেন, জেলের সিপাইরা সরকারী খরচায় একটা করে জারসি পেয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের কিনতে হয়। ওর কিছুটাও যদি তোমরা বুনে দিতে পার, অনেক পয়সা বাঁচে। ঐ দিয়েই বরং শুরু করো। গোড়ার দিকে একটু-আধটু খারাপ হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

এ বিষয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা হল। জারসি বুনতে কত উল লাগে, কত নম্বর কাঁটা চাই, কাজটা ভালোমতো শিখতে কতটা সময় লাগবে, মাসে কতগুলো করে তৈরী হবার সম্ভাবনা—এই সব এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে এই মেয়েটির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সেটা প্রকাশ করবার দক্ষতা দেখে তালুকদার বিস্মিত হলেন। এই জাতীয় কাজে না লাগিয়ে ওকে দিয়ে যে শুধু ডাল ভাঙানো হয়েছে, সে কথা ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলেন। শেষের দিকে বললেন, তুমি তাহলে তোমার ছাত্রীর দল ঠিক করে ফেলো। একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, শেখবার আগ্রহ আছে, অন্তত বছর খানেক থাকবে, এই ধরনের গুটি পাঁচ-ছয় মেয়ে হলেই কাজ শুরু করা চলবে। কী বল ?

হেনা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, শেখাবার ভার আমি নিলাম, স্যর ! সাধ্যমতো চেষ্টা করব। কিন্তু লোক ঠিক করবার কাজটা আমাকে নিতে বলবেন না।

এ বিষয়ে ওর আপত্তিটা যে অযৌক্তিক নয়, বুঝতে পারলেন তালুকদার। বললেন, বেশ তাই হবে। ওটা আমি নিজেই এক সময়ে গিয়ে করে দিয়ে আসব।

দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুশীলার আসতে বোধ হয় দেরি হবে। ততক্ষণে তুমি বরং ঐ বারান্দায় গিয়ে একটু বোসো।—বলে, আবার একটা ফাইল টেনে নিলেন।

মিনিট তুই পরে তাকিয়ে দেখলেন, হেনা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ দেখে মনে হল, কী যেন বলবার আছে, অথচ বলতে পারছে না। কিছু বলতে চাও? কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার। হেনা চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখে-মুখে দেখা দিল অস্বস্তির রেখা। দু-একবার ইতস্তত করে হঠাৎ বেরিয়ে এল ব্যাকুল কণ্ঠ—আমি যে এখানে আর থাকতে পারছি না।

—কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন জেলর সাহেব।

—আপনি তো সবই জানেন। যে কারণে, যেমন করে ওঁকে চলে যেতে হল, তার পর আমি এখানে মুখ দেখাই কেমন করে?

মহেশবাবুর বিস্ময় কেটে গেল। যে কটি কথা শুনলেন, তারই ভিতরকার বেদনাটুকু অনুভব করে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। হেনা যেন আপন মনে বলতে লাগল, এত দুঃখ দিলাম, সব বৃথা হল। এত করে যার হাত থেকে বাঁচাতে চাইলাম, সেই দুর্নাম আর অপমানই সার হল। আমারই জন্যে সকলের কাছে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন!

—তুমি ভুল করছ হেনা, দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন তালুকদার। তাকে কারো কাছেই মাথা হেঁট করতে হয় নি। অপমান বা অমর্যাদা নিয়েও সে যায় নি। নিন্দুকের দুর্নাম তাকে স্পর্শ করে নি। যে যাই বলুক, আমার এই কথাটা তুমি নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পার।

হেনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই দৃঢ় কণ্ঠের মধ্যেই যেন সে খুঁজে পেল এক পরম আশ্বাস। তালুকদার জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখেই মৃদু-কোমল সুরে বললেন, দুঃখ দেবার কথা বলছিলে। কিন্তু দুঃখ তো তুমি শুধু দাও নি, পেয়েছ তার অনেক বেশী। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

হেনার চোখের কোল দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। দুটি জলধারা যখন গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে এল, তা-ও মুছবার চেষ্টা করল না। সেই অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখখানার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে তালুকদার আবার বললেন, তোমার সব কথা

আমি জানি না। হয়তো এমন কিছু আছে তোমার জীবনে, যার জন্যে নিজের হাতে নিজেকে আঘাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কী সে কাবণ, সে প্রশ্ন তুলব না। একটা কথা শুধু বলতে চাই। স্বেচ্ছায় যে পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলে, সেদিকে আর ফিরে তাকিও না। তাতে শুধু কষ্টই পাবে, আর কোনো ফল হবে না।

হেনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। তালুকদার বললেন, আমার এই কথাগুলো হয়তো সাধু-সন্ন্যাসীর উপদেশ কিংবা পাদরি সাহেবের সার্মনের মতো শোনাচ্ছে। তবু এর কোনোটাই মিথ্যা নয়। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বলে শুধু ওই সংসারের ডাকেই সাড়া দিতে হবে, আর তা না হলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা মেয়েমানুষকে শুধু মেয়ে বলে দেখেন, মানুষ বলে দেখেন না। ঘরকন্নার বাইরেও যে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে, তার দাবিও কারো চেয়ে ছোট নয়। তার ডাক যদি শুনতে পাও তাহলে যা পাও নি কিংবা পেয়েও নাও নি, তার জন্য এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না।

হেনার আয়ত উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে যেন একটা আবরণ উঠে গেল। তৃপ্ত কণ্ঠে বলল, না, না। আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বড্ড ছটফট করছিল মনটা। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। না, আমি আর কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকব। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতে পারব আপনার পায়ের কাছটিতে, তার পর—বলে হঠাৎ থেমে গেল।

তালুকদার মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে বললেন, কী বলছিলে বলো।

—বলছিলাম, এই জেলের মেয়াদ তো একদিন শেষ হবে। সে কথা যখনই মনে পড়েছে, ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে। কোথায় যাব ? কোথাও গিয়ে দাঁড়াব, এমন জায়গা তো আমার নেই। আজ আর সে ভয় নেই। আপনার কাছে এসে মনে হল, জায়গা আছে। একটু আশ্রয়ের ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না।

আপনার অজ্ঞাতসারে চমকে উঠলেন জেলর সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। হেনা লক্ষ্য করল, কিন্তু বুঝতে পারল না। বিস্ময়ে কুণ্ঠায় নির্বাক হয়ে রইল। অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন তালুকদার, তোমার ঐ 'আশ্রয়' কথাটা শুনে অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমাবই মতো আরেক জন —না; সে কথা এখন থাক। হ্যাঁ; তোমার কথা আমি ভেবে দেখেছি। সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, তুমি এলে আমার কাছে তোমার টিকেট নিয়ে, তখন থেকেই ভেবেছি। সেদিন কী বলেছিলাম, তোমার হয়তো মনে আছে।

—সে কথা একটি দিনের তরেও ভুলি নি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হেনা। আপনি বলেছিলেন, তোমার কথা যেমন শুনলাম, আমার একটা কথাও তেমনি তোমাকে শুনতে হবে।

—হ্যাঁ। আজও তার সবটুকু বলবার সময় আসে নি। শুধু জেনে রেখো, এখানকার কাজ শেষ হলেই তোমার ছুটি নেই। তোমাকে আমার দরকার হবে।

হেনা উল্লসিত হয়ে উঠল, আমি তার জন্যে তৈরী হয়ে আছি। কিন্তু—কুণ্ঠিত সুরে বলল, আমি পারব কি?

—কেন পারবে না? নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিও না। তাহলেই পারবে।

—আপনার দয়ায় সে বিশ্বাস হয়তো একদিন ফিরে পাব, দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু ভয় হয়, যে কাজ আপনি আমাকে দিতে চাইছেন, তার অধিকার বোধ হয় আমার নেই।

—কেন?

—তাহলে, আমার সব কথা আপনাকে শুনতে হবে।

—কী তোমার সব কথা?

—আমার জীবনের যত কিছু পাপ, যত কিছু অন্যায়, ছেলেবেলা থেকে যে দুঃখ দিয়েছি এবং পেয়েছি, যত বঞ্চনা সয়েছি, সব আমি

আপনার পায়ের কাছে নামিয়ে দেব। তার পরেও যদি মনে করেন, আমি অযোগ্য নই, আপনার দেওয়া কাজের অধিকার আজও হারিয়ে ফেলি নি, আপনার সব আদেশ আমি মাথায় পেতে নেব।

—বেশ, তাই হবে। একরাশ দ্বিধা-সংশয়ের বেড়ি পায়ে বেঁধে কাজে নামা যায় না। মনের মধ্যে খটকা যখন দেখা দিয়েছে, সে জট খুলে ফেলাই ভালো। শুনব তোমার সব কথা। ওই যে তোমার এসকর্ট এসে গেছে। সুবিধামতো আরেক দিন এসো।

সুশীলা ঘরে ঢুকল একেবারে হন্তদন্ত হয়ে। দীর্ঘ বিলম্বের জন্যে একগাদা কৈফিয়ত শুরু করতেই মাঝপথে বাধা পড়ল। জেলর সাহেব বললেন, চার-পাঁচ দিন পরে বিকেলের দিকে আর-এক বার ওকে আনতে হবে। তার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যেও।

আচ্ছা, হুজুর, সেলাম করে বলল জমাদারনী। কৈফিয়তের হাত থেকে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাবে একেবারেই আশা করে নি।

তালুকদার উঠে দাঁড়ালেন। হেনা এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তাঁর পায়ের কাছে, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সুশীলার সঙ্গে।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উনিও বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় বিরাট হাঁক-ডাক করে মহাবল সিং এসে হাজির। সঙ্গে জন দুই সিপাই আর এক দল কয়েদী। একটা জোয়ান লোককে দু-দিক থেকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে দুজন মেট। গায়ের জামাটা ছিঁড়ে গেছে। চুল উশকো-খুশকো; চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন। জেলর সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাইতেই সে বুট ঠুকে সেলাম জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিযোগ পেশ করল, কাম নেহি করতা হ্যয়। ফিন্ মেটকো ভি গালি দিয়া।

লোকটাও উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে মেরেছে হুজুর!

এই দেখুন···বলে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পিঠের উপর, বাহুর পাশে চওড়া দাগ। কোথাও কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

—কে মেরেছে? প্রশ্ন করলেন জেলর।

—ঐ মেট, বলে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে মারল পাশের একজন মেটের দিকে।

—মেরেছ ওকে? মেটকে জিজ্ঞাসা করলেন তালুকদার।

—কাজ করে না। তাই বলতে গিয়েছিলাম। মা-বোন তুলে গালাগাল দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করুন সিপাই বাবুকে।

—তার পর?

মেট নিরুত্তর। জেলর সাহেব প্রশ্ন করলেন, মেরেছ কি না জানতে চাইছি। মেট একবার জমাদার একবার সিপাইদের মুখের দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে বলল, একটা থাপ্পড় মেরেছি হুজুর!

সকলের অজ্ঞাতে জেলর সাহেবের ওষ্ঠের কোণে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই চিরন্তন "এক থাপ্পড়।" জেলের ডিসিপ্লিন রক্ষার প্রাথমিক ভার যাদের উপর সেই সব সর্দার কয়েদীর নাম মেট। কেতাবী নামটা বেশ গালভরা—কনভিক্ট ওভারসিয়ার। তাদের পোশাকের প্রধান অঙ্গ একটি চামড়ার বেল্ট, তার সঙ্গে লাগানো পিতলের চাপরাশ। কারণে, অকারণে এই বস্তুটি তারা শাসন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে প্রহারটা অস্বীকার করে না, তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়, মেরেছি এক থাপ্পড়। যদি জানতে চান, দাগ হল কেমন করে, সদুত্তর পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

রাউণ্ডে যাওয়া বন্ধ রেখে জেলর আবার তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। মহাবল সিং ঢুকল তার বাদী, আসামী, সাক্ষী-সাবুদের দলবল নিয়ে।

ক-দিন পরে সকালের ডাক দেখতে গিয়ে একটু আশ্চর্যই হলেন

তালুকদার। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তাঁর বড় একটা থাকে না। আজ একেবারে একসঙ্গে হুখানা। একখানা লিখেছেন দেবতোষ— কোলকাতায় এসে আস্তানা নিয়েছি। ক-দিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্য অভিযান শুরু করব, এই রকম সদিচ্ছা আছে। শুধু পুরী ওয়ালটেয়ার নয়, মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম পক্ষিতীর্থম, চাই কি রামেশ্বরম পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারি। মা-ও হয়তো সঙ্গে যাবেন। অর্থাৎ দস্তুরমত তীর্থপরিক্রমা। কবে ফিরব, জানি না। মা আপনার কথা প্রায়ই বলেন···ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিখানা পড়ে চিন্তার ছায়া পড়ল মহেশের মুখে। খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন।

দিন চারেক পরে সকালের দিকে ওদের বাসায় যখন পৌঁছলেন তালুকদার, দেবতোষ ঘরেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো দাদা! পর পর হুখানা চিঠি! তালুকদার বললেন, একখানায় ভরসা হল না। যদি হঠাৎ ফসকে যায়? একটা জরুরী কাজে বেরোতে হবে তোমাকে নিয়ে। তোমার তীর্থযাত্রা হয়তো হু-চারদিন পেছিয়ে যেতে পারে।

দেবতোষ কিছু বলবার আগেই সুলোচনা এসে পড়লেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে বেরিয়েছেন। শান্ত সমাহিত মুখখানার উপর একটি শুচিশুভ্র তন্ময়তা তখনো যেন লেগে রয়েছে। মহেশ উঠে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, বোসো বাবা, আগে তোমার খাবারটা নিয়ে আসি। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। দেরি হবে না।

তালুকদার বললেন, খাবার এখন থাক, মা! ওটা বরং ফিরে এসে ধীরে-সুস্থে হবে। তার আগে, অনুমতি করেন তো আপনার এই ছেলেটিকে একটু খাটিয়ে নিয়ে আসি।

—সেজন্যে আবার অনুমতি কিসের বাবা? তুমি বড় ভাই; দরকার হলে ওর কান ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে বলতে হবে কেন?

দেবতোষ গম্ভীরভাবে বললেন, ধরতে হলে বাঁ কানটা ধরবেন, দাদা !

—কেন, ডানটা কী অপরাধ করল ?

—ওটা মা আর নিতাই পণ্ডিতমশাই দুজনে মিলে এত টেনেছেন যে আঠারো বছরেও তার ব্যথা মরে নি।

মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

বেরোবার মুখে সুলোচনা বললেন, তুমি কোথায় উঠেছ, মহেশ ?

প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে তালুকদার বললেন, যেখানেই উঠি, দুপুরবেলা মায়ের প্রসাদ পেয়ে তবে যাব। সেজন্যে ভাববেন না।

সুলোচনা খুশী হয়ে বললেন, কিন্তু ফিরতে যেন অনেক দেরি করে ফেলো না।

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হল না। শিয়ালদ স্টেশনে রেলে চড়ে ওঁরা নামলেন এসে বেলঘরিয়ায়। সেখান থেকে রিকশ নিয়ে খানিক বাদে গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়লেন। খুলে দিল একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বিধবা মেয়ে। ওঁরা ভিতরে ঢুকতেই প্রণাম করে মহেশের পায়ের ধুলো নিল। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছে শান্তি ?

—জ্বরটা একভাবেই চলছে।

—চলো, দেখে আসি।

পাশেই একখানা ছোট ঘর। তক্তপোশের উপর একটি মেয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে। বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ। রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ। মাথার কাছে বসে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করছে। পায়ের দিকটায় একখানা টুলের উপর বসে একজন বর্ষীয়সী। মহেশবাবুকে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়াল এবং ছোট মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ডাক্তার রুগ্নীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মহেশ ইংরাজিতে বললেন, এই মেয়েটির চিকিৎসার ভার

তোমাকে নিতে হবে, দেবতোষ! এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আসা। কই, উমা কোথায় গেল?

—এই যে, যাই, বলে এগিয়ে এল সেই বিধবা মেয়েটি।

তালুকদার বললেন, ইনি ডাক্তার। যা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেন, সব বুঝিয়ে দাও। এখন থেকে উনিই ওকে দেখবেন। তুমি তা হলে যা দেখবার দেখে নাও দেবতোষ! তার পর কথা হবে। আমি ওদিকে আছি।

রোগিণীকে মোটামুটি পরীক্ষা করবার পর ডাক্তারকে ভিতরের দিকের বারান্দায় মহেশবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একটা মোড়ার উপর তিনি বসে আছেন, আর তাঁর সামনে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আটটি নানা বয়সের মেয়ে। সকলের পরনেই মোটা তাঁতের শাড়ি, আর তাঁতে-বোনা ছিটের তৈরী জামা। পাশে একটা খালি মোড়া পড়ে ছিল। তার উপর দেবতোষকে বসতে বলে মহেশ প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলে তোমার রুগী?

—টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্লাইড না নিয়ে ঠিক বলতে পারছি নে। আগে জানলে ও সব সরঞ্জাম নিয়েই বেরনো যেত।

—আমার কি সে সব খেয়াল ছিল?

উমা বলল, আমাদের ডাক্তারবাবুকে খবর দিলে রক্ত নেবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

—তিনি এখনো রক্ত নেন নি? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল দেবতোষ।

—না। বলে গেছেন, অন্য ডাক্তার এসে নিতে চাইলে, যা কিছু দরকার পাঠিয়ে দেবেন।

তালুকদার বললেন, তিনি হচ্ছেন হোমিও। তোমাদের এই সব রক্তারক্তির মধ্যে নেই।

—তিনিই বুঝি দেখছিলেন? জানতে চাইলেন দেবতোষ।

তালুকদার বললেন, হ্যাঁ। তাঁর ওষুধে বিশেষ কাজ হল না দেখে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই খবর পেয়েই তো তোমাকে নিয়ে এলাম।

হোমিও ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল। তালুকদার বললেন, ততক্ষণ চলো, তোমাকে সবটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

বারান্দার কোলে উঠোন। তার ধার ঘেঁষে একখানা লম্বা ধরনের টিনের চালা। এক দিকে খান চারেক তাঁত আর তার সরঞ্জাম, আর এক দিকে দুটো সেলাইএর কল। কোণের দিকে উল বোনার সরঞ্জাম। তাঁতগুলোতে টানা চড়ানো। তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, আর একটাতে মনে হল শাড়ি। মেশিন দুটোতে আটকে আছে আধ-সেলাই জামা। দেখে বোঝা যায়, সবগুলোতেই কাজ চলছিল ; যারা করছিল, এই মাত্র উঠে গেছে। পাঁচিলের ধারে একটা ছোট চালায় দুটো ঢেঁকি। একটাতে ধান ভানা হচ্ছে। তার সামনে গোবর-নিকানো আঙিনায় বসে একটি বুড়ী ডালের বড়ি দিচ্ছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। একটি মেয়ে কানে কানে কী বলতেই আনন্দে কলরব করে উঠল, কই, কই, আমার বাবা কোথায় ? আহা কতদিন দেখি নি। মেয়েটি আবার ফিসফিস করে কী বলল। বুড়ী খুশী হয়ে ঝুঁকে পড়ল আগের কাজে।

খিড়কির দরজা পার হয়ে ওঁরা পড়লেন গিয়ে বাগানে। কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিঘে তিনেক জমি। ছোট ছোট প্লট করে শাক-সবজির চাষ হচ্ছে। বেগুন কুমড়ো, লাউএর মাচা। একখানা খেতে দুটি মেয়ে পুঁইএর চারা লাগাচ্ছে।

তালুকদার চলতে চলতে দু-একটা কথা বলছিলেন। দেবতোষ শুধু দেখছিলেন বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখ মেলে। বারান্দায় ফিরে এসে বসতেই উমা একখানা থালার উপর দু'গেলাস ডাবের জল নিয়ে ধরল ওঁদের সামনে।

তালুকদার বললেন, তোমাদের নতুন গাছের ডাব বুঝি ?

—হ্যাঁ, এই প্রথম পাড়া হল।

—কাকে দিয়ে পাড়ালে ?

উমা জবাব দিল না। দেবতোষ লক্ষ্য করলেন সলজ্জ হাসিতে তার মুখখানা ভরে উঠেছে। বোঝা গেল, কাজটি সে নিজেই করেছে, কিংবা ওর মতো কাউকে দিয়ে করিয়েছে। যে মেয়েটি রুগীর মাথায় হাওয়া করছিল বেরিয়ে এসে বলল, শান্তিদি আপনাকে একবার ডাকছে, কাকাবাবু।

তালুকদার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, চলো যাচ্ছি।

ওঁরা দুজনেই উঠে এলেন। কাছে এসে দাঁড়াতেই কম্পিত হাতখানা ধীরে ধীরে খাটের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিল শান্তি। মহেশ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, থাক থাক। অসুখের মধ্যে কি প্রণাম করতে আছে ? আমি এমনই তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।

শান্তি ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, আমি আর বাঁচব না, কাকাবাবু !

—পাগল ! তাহলে এদের দেখবে কে ? এই তো ডাক্তার বলছেন, ভয় পাবার মতো কিছুই হয় নি। শুধু অতিরিক্ত খেটে আর অনিয়ম করে করে এই অসুখ ডেকে এনেছ।

শান্তি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। অতি কষ্টে হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে কী একটা বলতে গেল। দেবতোষ এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেলে বললেন, থাক আর কথা বলবেন না। নিয়মিত ওষুধপত্তর খেলে ক-দিনেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

শান্তির চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

ফেরবার পথে পাশাপাশি রিক্সয় বসে দুজনেই অনেকক্ষণ নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে রইলেন। স্টেশনের কাছাকাছি এসে প্রথম মৌন ভঙ্গ করলেন তালুকদার। বললেন, মেয়েটাকে টেনে তুলতে সময় লাগবে। কী বল ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তাহলে? তোমার তীর্থ যে সিকেয় উঠল।

দেবতোষ হেসে উঠলেন।

—ও কি, হাসলে যে?

—হাসবার কথা যে দাদা। এত দিন কোনো কাজেই তো আপনার লাগি নি। কখনো লাগতে পারি, সে আশাও কোনো কালে ছিল না। আজ যদি হঠাৎ যে সুযোগ এসে থাকে, তার চেয়ে তীর্থের নাম করে টো-টো করে ঘোরাটাই কি আমার বড় হল?

—শুধু তোমার কথা নয়, মার কথাও ভাবছি।

—মা তো যাচ্ছিলেন শুধু আমাকে আগলাবার জন্যে।

—কী রকম?

—কী জানি? ওঁর হঠাৎ মনে হল আমাকে এবার কাছে কাছে রাখা দবকার।

মহেশ ওঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, আমার যে একটা কাজ জুটে গেল, এতে বোধ হয় উনি খুশীই হবেন। আমাকে নিয়ে আজকাল ওঁর বেজায় ভাবনা—বলে, জোরে হেসে উঠলেন।

তালুকদার যোগ দিলেন না। চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ।

রেলের কামরায় একদম ভিড় নেই। দুজনে আবার গিয়ে বসলেন পাশাপাশি। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ক-দিন আছেন তো?

—কেন? আর থাকবার দরকারটা কী?

—আমার দিক থেকে কোনো দরকাব নেই। পেশেণ্ট আমি একলাই সামলাতে পারব। ব্লাড রিপোর্টটা যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে পাওয়া যায়, কাল সকালেই আবার যেতে হবে। আশ্রমের নাম-টাম তো দেখলাম না। বাড়িটা আবার চিনতে পারব তো?

—আশ্রম কাকে বলছ?

—তবে কী বলব ? হোম ?

—না হোমও নয়, আশ্রমও নয়। বলতে পার আশ্রয়। ওরা সব এক্স-কন্‌ভিক্টস্।

—এক্স-কন্‌ভিক্টস্! ডাক্তারের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্তৃত হল।

—হ্যাঁ। তোমার আমার মতো ভদ্রঘরেই ওদের জন্ম। সেই-খানেই মানুষ। তারপর একদিন ছিটকে এসে পড়ল জেলখানায়। কিন্তু জান তো, আমাদের দেশে যারা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মায়, তারা যদি কোনো কারণে একবার ঘরের বাইবে এসে পড়ে, আর ফিরে যেতে পারে না। বেরোবার রাস্তা আছে, ঢোকবার দরজা নেই। ওরাও তাই আর ঘরে ফিরতে পারে নি। যে গিয়েছিল সেও জায়গা পায় নি। এমনি আরো কত আছে! কে তার খোঁজ রাখে ?

শেষের কটি কথায় কেমন একটা উদাস সুব লেগে রইল। গাড়ির বাইরে রৌদ্রদীপ্ত মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তালুকদার। ডাক্তার একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, এদের কথা তো কোনো দিন বলেন নি, দাদা!

—তেমন কোনো উপলক্ষ হয় নি। আর, বলবার মতো আছেই বা কী ? তবে এবার যখন তোমাকে এর মধ্যে আসতে হল, তখন শুনবে বৈ কি ? সব কথাই বলব।

তালুকদার যে মেসটাতে উঠেছিলেন, দেবতোষ নিজে গিয়ে সেখান থেকে ওঁর বিছানা আর সুটকেসটা নিয়ে এলেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না। দোতলার বারান্দায় একটি সদ্য পাট ভাঙা সতরঞ্চি বিছিয়ে রেখেছিলেন সুলোচনা। তার উপরে দুটি ঝালর-দেওয়া তাকিয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন, এঃ, মস্ত ভুল হয়ে গেছে দাদা! আপনার সিগারেট তো আনা হয় নি!

তালুকদার পকেটে হাত দিয়ে বললেন, তোমার ভরসা করে তো

আসি নি যে ভয় দেখাচ্ছ। আমার সম্বল আমার সাথেই থাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ধোঁয়ার রস তো পেলে না, ভায়া! এ যে কী বস্তু, জানবে কেমন করে?...বলে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ডাক্তার কী একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর মনে হল সেই রিংগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যেন তারই মধ্যে উনি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। এমনি করে কেটে গেল অনেকক্ষণ। তারপর গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তালুকদার, আজ থেকে তেরো বছর আগের কথা। নতুন প্রমোশন পেয়েছি—ডেপুটি থেকে পুরোপুরি জেলর। ছোটখাটো একটা জায়গায় থাকতে পাব, এই আশাই করেছিলাম। হঠাৎ হুম করে বদলি করে দিল একটা মস্ত বড় ফার্স্ট ক্লাস ডিস্ট্রিক্ট জেলে, যেখানে ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। বড় দায়িত্ব পেলাম। সরকারের ওপর কৃতজ্ঞ হবার কথা। কিন্তু আমার হল প্রাণান্ত। সারা দিনরাত খেটে কূল পাই না। যখন বাসায় ফিরি, দেহে সাড় নেই, মন থাকে খিচড়ে। ঘরে মীরা একা। তার সঙ্গে কোনো দিন দু-একটা কথা হয়, কোনো দিন হয় না। ছেলে দুটো ছোট ছোট। তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না। বাইরে স্বস্তি নেই, ঘরে শান্তি নেই। এমনি করে দিন যায়। এমন সময় একদিন জেলে একটি নতুন কয়েদীর আমদানি হল। অল্পবয়সী মেয়ে। কিন্তু গেটে এসে যখন দাঁড়াল, মনে হল এক ঝলক জ্বলন্ত আগুন। আগুনের অনেক রূপ। কখনো সে তুলসীতলার সন্ধ্যাদীপ, কখনো দেওয়ালির আলোকমালা, কখনো আবার সর্বগ্রাসী দাবানল। মেয়েমানুষের রূপটাও বোধ হয় অগ্নিধর্মী। কেউ মঙ্গলপ্রদীপ, কেউ আলেয়া, কেউ বা প্রলয়ের মশাল। এই মেয়েটাকে বোধ হয় শেষের দলে ফেলা চলে। নাম কল্যাণী। কিন্তু ঘরে বাইরে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই সে দিয়ে যায় নি। সে দোষ অবিশ্যি তার নয়। দোষ যদি কারো হয়ে থাকে, সে তার বিধাতার, যিনি সেই হতভাগীর সর্বাঙ্গে অসহ্য রূপের শিখা

জ্বালিয়ে এমন ঘরে এমন পরিবেশে তাকে পাঠিয়ে দিলেন যেখানে ঐটাই হল তার অভিশাপ। কে জানে এটা তাঁর খেয়াল না কৌতুক!

নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে গরিবের ঘরে জন্ম। তার এক প্রতিবেশীর কাছে শুনেছি, বছর দশেক বয়স হতেই ওর বাপ-মা ওর ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ করে দিলেন। তাকে দেখলেই নাকি পাড়ার ছেলে-বুড়োর মাথা ঘুরে যেত। তারপর শুরু হল বিয়ের চেষ্টা। ভালো ঘর জুটবে কী? যারাই দেখতে আসে ভয় পেয়ে যায় ঐ রূপ দেখে। পাড়ার গিন্নীরা বলাবলি করতেন, মেয়েমানুষের অত রূপ ভালো নয়। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। একজন ইংরেজ কবি পৃথিবীসুদ্ধ সুন্দরী নারীদের সম্বন্ধে ঐ রকম একটা মন্তব্য করে গেছেন। যাক সে কথা। শেষ পর্যন্ত কল্যাণীর বর জুটল। অনেক দূরে ঐ রকম এক পাড়াগাঁয়ে। কনের বয়স পনেরো-ষোলো। বর তিরিশ-বত্রিশ। গ্রামের হাটখোলায় একটা মুদি-দোকান আগলায়, কোনো রকমে সংসার চলে।

বিয়ের পরে দেখা গেল, বর বেচারা দোকান ফেলে বাড়িতেই ঘুর-ঘুর করছে। অভিভাবকেরা প্রমাদ গনলেন। পাড়ার দু-চারজন মুরুব্বি গোছের লোক পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে বিদেশে পাঠাও চাকরি করতে। তাঁদের গায়ে আগুনের আচ লেগেছিল। মহকুমা শহরে চাকরিও একটা জুটিয়ে দিলেন তাঁদের মধ্যে কে একজন। তারপর শুরু হল নানা রকম পতঙ্গের আনাগোনা। বৌ পুকুরে নাইতে গেলে সেখানে ছিপ ফেলবার হিড়িক পড়ে; মন্দিরে গেলে সেদিন গ্রামসুদ্ধ লোকের ভক্তি উথলে ওঠে। অন্ধকার রাতে ঘরের পিছনে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, বাসন মাজতে গেলে গায়ে এসে পড়ে উড়ো চিঠি। শ্বশুর-শাশুড়ী জানতে পারলেন, এবং সব কিছুর জন্যে বৌকেই দায়ী হতে হল। স্বামী বেচারা মাঝে মাঝে আসে। শোনে সবই। কিন্তু সে নিরুপায়। কোনো এক মুরুব্বির

কাছে পাড়তে গিয়েছিল কথাটা। ধমক খেয়ে চলে গেল চাকরিস্থলে।

এদিকে যত দিন যায়, বৌয়ের দিকে আর তাকানো যায় না। পেট ভরে ডাল-ভাতও জোটে না, তবু ফেঁপেফুলে উঠছে স্বাস্থ্যের জোয়ার। একটি শিশু যদি আসত ওর কোলে, হয়তো ওরই মধ্যে দেখা দিত একটুখানি ভাঁটার টান। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই। পতঙ্গের দল বেড়েই চলেছে। তারই মধ্যে একটি একেবারে সোজা-সুজি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে বসল। অর্থাৎ গভীর রাতে ঝাঁপের বেড়া কেটে ঢুকে পড়ল ওর শোবার ঘরে। গায়ে হাত দিতেই ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল না, চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবার চেষ্টাও করল না। বালিশের নিচে থাকত একটা ধারালো কাটারি। আস্তে আস্তে উঠে অন্ধকারে বসিয়ে দিল কোপ। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার আর একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ। এইটুকুই তার মনে আছে। তারপর কী হল সে জানে না। জানবার মতো অবস্থা যখন হল, চোখ খুলতেই দেখল বারান্দার এক কোণে পড়ে আছে, জবজব করছে চুলের বোঝা, আর চারদিকে গিজগিজ করছে লোক। ধড়মড় করে উঠে বসতেই চোখে পড়ল উঠোনের এক কোণে পড়ে আছে একটা লাশ। কাঁধের আদ্ধেকটা নেমে গেছে, গলাটা ঝুলে পড়েছে এক পাশে। তবু চিনতে কষ্ট হল না। প্রবীণ ব্যক্তি, গ্রাম্য সম্পর্কে ভাশুর হন কল্যাণীর।

তারপর যা হয়ে থাকে। থানা, পুলিশ, উকিল, মোক্তার, হাকিম, আদালত, শেষ পর্যন্ত আমার জেলখানা।

দেবতোষ আপত্তি জানালেন, কিন্তু এ কেস-এ তো তার জেল হবার কথা নয়। সে যে মেয়ে; খুন যদি করে থাকে আত্মরক্ষার জন্যেই করেছে।

তালুকদার বললেন, তুমি তো বলছ আত্মরক্ষা, সাক্ষীরা তা বলল কই? গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তিরা দল বেঁধে হলপ করে বলে এল,

মেয়েটার চরিত্র খারাপ। নিয়মিত খদ্দের ছিল জন কতক। ভাশুর ছিলেন পথের কাঁটা; তাই তাদেরই একজনের সঙ্গে সড় করে বেচারাকে ডাকিয়ে এনে খুন করেছে। হাকিমও বোধ হয় আগুন দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। তাই ছেড়েও দিলেন না, ফাঁসি দ্বীপান্তরও দিলেন না, ৩২৬ ধারায় দুবছর জেল দিয়ে শ্যাম আর কুল দুটোই বজায় রাখলেন।

জেলে আসবার পরদিন সে নিজে থেকেই ঢুকে গেল ঢেঁকিশালে। ভদ্রঘরের রূপসী তরুণী; সেলাই-টেলাই গোছের একটা নরম কাজ দিতে চেয়েছিলাম। রাজী হল না। বলে বসল, ও সব করতে গেলে গতর থাকবে কেন? ফিরে গিয়ে আবার তো সেই ঢেঁকিই ধরতে হবে। কিন্তু জেল থেকে ফেরবার পর ঢেঁকিঘরটাও যে খালি পাওয়া যায় না, সে কথা তখনো জানতে পারে নি কল্যাণী।

যত দিন জেলে ছিল, খোঁজ-খবর কেউ নেয় নি। চিঠিও দেয় নি, দেখা করতেও আসে নি। যেদিন খালাস হল, খোরাকি, পথখরচ আর ক্লড মার্টিন ফাণ্ড থেকে সামান্য কিছু বখশিশ দিয়ে একটি মেয়েছেলের সঙ্গে ওকে শ্বশুরবাড়িতেই পাঠিয়ে দিলাম। এসকর্ট ওকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল।

তার দিন তিনেক পর রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরছি। দেখলাম সদর দরজার পাশে অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, কে? মাথা তুলে বলল, আমি কল্যাণী।

—তুমি এখানে?

—কোথায় যাব! ওরা ঘরে নিল না, মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিল।

—বাপের বাড়ি গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম। মা নেই; বাবা রাখতে চাইলেন না।

তার পর যা বলল, তার মানে, আশ্রয় দিতে রাজী ছিল অনেকেই, পীড়াপীড়িও করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু সে যে কী আশ্রয় সেটা বুঝতে পেরে সেখানে আর দাঁড়ায় নি।

ওকে নিচে বসতে বলে ওপরে গেলাম। মীরা ক-দিন থেকে জ্বরে ভুগছিল। সেই দিনই তুটো পথ্য পেয়েছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আবার নেমে এলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম হাঁড়িতে সামান্য কিছু ভাত-তরকারি পড়ে আছে। তাই বেড়ে দিতে বললাম। কল্যাণী যেন তৈরী হয়েই ছিল। বলবার অপেক্ষাও রাখল না। খাওয়ার ধরন দেখে চাকরটারও বুঝতে অসুবিধা হল না যে অন্তত তুদিন কোথাও কিছু জোটে নি। তার পর চাকরকে সিপাইদের গারদে শুতে পাঠিয়ে, তারই ঘরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সদর বন্ধ করে ওপরে উঠে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠেই মীরাকে সব খুলে বললাম। সে খানিকটা চুপ করে থেকে শুধু বলল, আমাকে একবার ডাকলেই পারতে।

বললাম, বড্ড ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর ডাকাডাকি করি নি।

নিচে এসে দেখলাম কল্যাণী এরই মধ্যে স্নান সেরে একরাশ ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেছে, যেন এ বাড়িতে সে নতুন আসে নি; এটাই তার নিজের সংসার। আমাকে দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, একটু দাঁড়ান, দাদা! অর্থাৎ সম্বন্ধও একটা পাতিয়ে ফেলেছে রাতারাতি। আমি ফিরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এসে প্রণাম করল। বললাম, কী হল? হঠাৎ প্রণাম কেন?

তেমনি মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনি যে ক-টা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে একখানা কাপড় কিনেছি। নতুন কাপড় পরে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।

এবার নজরে পড়ল, তার পরনে একখানা লালপেড়ে নতুন শাড়ি। বললাম, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ-সব কী করছ তুমি?

—কী সব! বলে মুখ তুলে তাকাল।

রান্নাঘরের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছিল। সেই দিকটায় আঙুল দেখালাম। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, বাঃ, আমি

থাকতে ও রাঁধবে কেন? ব্যাটাছেলে রান্নার কী জানে! 'ব্যাটা-ছেলে', মানে আমার চাকরটি, দেখলাম বেজায় খুশী। নিজের অধিকার সানন্দে ছেড়ে দিয়ে দিদিমণির ফাইফরমাজ খাটতেই ব্যস্ত।

কল্যাণী বলে উঠল, বৌদি কোথায়, দাদা? শুনলাম, তাঁর অসুখ। ওপরে যেতে পারি? আর কেউ নেই তো?

চাকরকে দিয়েই ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিলাম। তার আগে ওর স্বামীর আর বাপের ঠিকানাটা জেনে নিলাম। ও হেসে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী হবে? চিঠি লিখবেন তো? ওরা কেউ আসবে না।

দুদিনও লাগল না। আমার সংসারের সব ভার চলে গেল কল্যাণীর হাতে। এমন অনায়াসে যে আমরা কেউ জানতেই পারলাম না। ছেলে দুটোকে শিখিয়ে দিল, আমি তোমাদের পিসী। একদিনের মধ্যে তারা ওর ন্যাওটা হয়ে গেল। তাদের খাওয়ানো-পরানো, ইস্কুলে পাঠানো, মীরার সেবা-যত্ন ওষুধ-পথ্য, তার ওপরে রান্নাবান্না—সারা দিন যেন চরকির মতো ঘুরছে। একবার ওপরে থেকে নিচে, আবার নিচে থেকে ওপরে। দিনে-রাতে দুবেলাই আমার ফিরতে দেরি হয়। মীরাকে তার আগেই খাইয়ে দেয়। কোনো আপত্তি শোনে না। তার পর আমি এলে থালা সাজিয়ে ধরে দেয়, পাখা নিয়ে সামনে বসে। কোনো জিনিস ফেলে রাখবার উপায় নেই।

কিন্তু আগুন চাপা থাকে না। তাকে বেঁধেও রাখা যায় না। পতঙ্গ মহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুরুষ নয়, এক ধরনের স্ত্রী-পতঙ্গ। যে সব শুভাকাঙ্ক্ষিণী প্রতিবেশিনীর দল নিতান্ত দুঃসময়েও কোনো দিন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ান নি, তাঁরা এসে যখন তখন ভিড় করতে লাগলেন। আমার রুগ্ণা স্ত্রীর জন্যে তাঁদের দরদ উথলে উঠল। কত উপদেশ, কত শাস্ত্রবচন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপলক্ষ ঐ একটি। একদিন বিকেলে আফিসে বেরোচ্ছি, মীরার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে এল, একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিনিয়ে বিনিয়ে

বলছেন, জান তো মা, ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে প্রলয় ঘটতে কতক্ষণ! এখন শক্ত না হলে পরে আর কেঁদেও কূল পাবে না।

সব শুনলাম, সব দেখলাম। দেখলাম মীরার মুখে হাসি নেই, চোখে কিসের যেন ছায়া। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওষুধ, পথ্য যত্নআত্তি, কোনো কাজে লাগছে না। এদিকে কল্যাণীর কথাই ঠিক হল। তার পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল কোনো দিক থেকেই কেউ উচ্চ-বাচ্য করল না। যে সব রেসক্যু-হোম বা অবলা আশ্রম-টাশ্রমের খোঁজখবর সংগ্রহ করেছিলাম, বার বার লেখালেখি করেও কারও কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। কল্যাণীর মামলা চলবার সময় একজন স্থানীয় সাপ্তাহিক কাগজের তরুণ সম্পাদক তার বীরত্বের প্রশংসা করে তিন-কলম জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর শরণ নিলাম। তিনি একবার ওকে দেখতে চাইলেন, সাংবাদিক পরিভাষায় যার নাম ইনটারভিউ। উদ্দেশ্য বোধ হয় যাচাই করা, কল্পনার বীরাঙ্গনার সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি! কল্যাণীর সঙ্গে সম্পাদক মশায়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম। তার পর তিনি এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ প্রার্থনা শুরু করলেন যে কল্যাণীকে আর তাঁর সামনে বেরোতে রাজী করানো গেল না।

মীরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত ওর কোনো ব্যবস্থা হল কিনা। কিছু দিন থেকে প্রশ্নটা বড় ঘন ঘন আসতে লাগল। একদিন সবে আফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছি, শুকনো মুখে এসে বলল, কল্যাণীর কিছু করতে পারলে?

আফিসের কতগুলো ব্যাপারে মনটা তিক্ত হয়ে ছিল। কড়া জবাব বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, দেখছই তো কোনো চেষ্টাই বাকী রাখছি না। একটা জায়গা-টায়গা না পেলে ঘাড় ধরে রাস্তায় তো বের করে দেওয়া যায় না?

মীরা ক্লান্ত চোখ তুলে শুধু একবার তাকাল। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল নিজের ঘরে।

এরই কয়েক দিন পরের ঘটনা। বরাবর নিয়ম ছিল, আমার রাতের খাবারটা ওপরে আমার শোবার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। বাড়ি ফেরবার পর, সুস্থ থাকলে মীরা এসে থালা-বাটিগুলো গুছিয়ে-টুছিয়ে দিত, আর অসুস্থ থাকলে আমি নিজেই নিয়ে-থুয়ে খেয়ে নিতাম। কল্যাণী এসে সব উলটে দিল। অপেক্ষা করে থাকত, কখন আমি ফিরি। আর ঠিক তখনই ওর কড়ায় ঘি পড়ত এবং লুচি ছাড়ার শব্দ পেতাম। অন্য সব উপকরণ আগে থেকেই সাজিয়ে রাখত। আমার হাত-পা ধোওয়া শেষ হতে না হতেই দেখতাম থালা নিয়ে ওপরে উঠে আসছে। অনেক দিন আপত্তি জানিয়ে বলেছি, খাবারটা এখানে রেখে দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পাব। কষ্ট করে বসে থাকবার দরকার কী? লুচিগুলোও তো আগেই ভেজে রাখা চলে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, না, তা চলে না। থালাটা আসনের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলত, আপনি তো জানেন, এতে আমার কষ্ট হয় না। এক কথা আর কত বার বলব?

নিষ্ফল জেনে ও নিয়ে আর কথা-কাটাকাটি করি নি। ঐ ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিলাম। সেদিনও নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিলাম। রাত এগারোটা বেজে গেছে। কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। উঠে মুখ ধুতে যাব; চৌকাঠ পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ বলে উঠল ধরা গলায়, আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কী করেছি? থমকে দাঁড়ালাম। দীর্ঘায়ত ঘনপল্লব ছুটো কালো চোখের তারা একভাবে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কিছু একটা বলা দরকার। বলতেও যাচ্ছিলাম। কল্যাণী বসে পড়ে ছুহাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এক পাশে পড়ে থাকতে দিন। আপনাদের ছেড়ে, বীরু-নীরুকে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না।

পা ছাড়তে চায় না। নিচু হয়ে বাঁ হাতে ওর কাঁধের পাশটা

ধরে সরাবার চেষ্টা করে বললাম, এ-সব কী পাগলামি হচ্ছে! ওঠো; আজই তো আর যাচ্ছ না কোথাও।

হঠাৎ একেবারে কানের কাছে ফেটে পড়ল তীক্ষ্ণ স্বর—নিচে যাও কল্যাণী! চমকে উঠলাম। ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কল্যাণীও তাড়াতাড়ি উঠে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। জ্বলন্ত চোখ মেলে সেদিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মীরা, এই জন্যেই বুঝি কোথাও ওর জায়গা হয় না?

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ তখনো মিলিয়ে যায় নি। চাপা ভর্ৎসনার সুরে বললাম, মীরা! ভ্রূক্ষেপও করল না। ঠিক সেই সুরেই আবার বলল, আর একটুখানি সবুর করতে পারলে না? আমি আর ক-দিন!

ভীষণ উত্তেজনায় দুর্বল শরীর থরথর করে কাঁপছিল। মনে হল এখনই পড়ে যাবে। এগিয়ে ধরতে গেলাম। ছিটকে সরে গেল। তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে ছুটে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সে রাতটা আমার কাটল সবটাই প্রায় পায়চারি করে—কখনো বারান্দায় কখনো ছাদের ওপর। ভোরের দিকে একটু গড়িয়ে নিয়ে যখন নিচে নামলাম, চাকর এসে খবর দিল, কল্যাণী নেই। বুকের ভিতর কেমন একটা ধাক্কা লাগল। তারপর নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ ভালোই হল। এতদিন ধরে আমি যে সমস্যা মেটাতে পারি নি, সে নিজেই তার সমাধান করে দিয়ে গেছে। আফিসে বেরোচ্ছি; ঐ চাকরটাই একখানা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এল। বলল, রান্নাঘরের তাকের ওপর পাওয়া গেছে। ওপরে কাঁচা মেয়েলি হাতের পেনসিলে লেখা—বৌদিদি! একবার ইচ্ছা হল, দেখি কী লিখে রেখে গেছে। কিন্তু হাতটা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলাম। বললাম, তোর মার কাছে দিয়ে আয়। সে চিঠিতে কী ছিল, আজও আমি জানি না।

আফিসে যাবার পরেই কানে গেল দলে দলে সিপাইরা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কে বললে খুঁজতে? তারও জবাব পেলাম হাবিলদারের কাছে, মাইজী কা হুকুম।

খোঁজ পাওয়া গেল, পরদিন বিকাল বেলা জেল থেকে খানিকটা দূরে কাদের একটা বাগান, তার ভিতর দিকে একটা এঁদো পুকুর, সেইখানে।

তুমি তো একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করে থাক ডাক্তার। আমি ভাই, ও রসে বঞ্চিত। শুনেছি, তোমাদের কবিরা শত কণ্ঠে নাকি মৃত্যুর মহিমা কীর্তন করে গেছেন। মরণ বড় সুন্দর; শীতল কোল পেতে সে তাপিতকে আশ্রয় দেয়, এমনি সব ভালো ভালো কথা তাঁদের বইতে লেখা আছে। তাঁরা কী দেখেছেন জানি না। কিন্তু মৃত্যু যে কত ভয়ঙ্কর, কত কুৎসিত সেদিন আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। বিশ্ব-বিধাতার অনুপম সৃষ্টি এই যে নারীর রূপ, মৃত্যুর স্পর্শে তার কী বীভৎস বিকৃতিই না ঘটতে পারে! তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কতগুলো ডোম ধরাধরি করে কল্যাণীর দেহটা আমার বাড়ির সামনে এনে নামাল। ওপর থেকে মীরার চোখে পড়তে পারে সে খেয়াল হয় নি। হঠাৎ তার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম, অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডাক্তার এল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু কাঁপুনি দিয়ে এল জ্বর। মাঝে মাঝে ভীত রক্তাক্ত চোখ মেলে তাকায় আর চমকে চমকে ওঠে।

সেই শুরু। তার পর চলল একটানা ব্যর্থ চিকিৎসার পালা। ছোট বড় কত ডাক্তার দেখলেন। ওষুধের খালি শিশিতে ঘরের তাক বোঝাই হল। ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাতে পায়ে আর জায়গা রইল না। তবু রোগ ধরা দিল না। তার পর এলেন এক কবিরাজ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় চার রকম ওষুধ আর কটমট অনুপান চালালেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত তিনিও হাল ছাড়লেন।

আমি বুঝেছিলাম, মীরাকে বাঁচাতে হলে সকলের আগে ঐ বাড়ি

আর তার অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে ওকে সরাতে হবে। কিন্তু বদলির জন্যে বার বার করুণ আবেদন জানিয়েও কর্তাদের মন ভেজাতে পারি নি। তার পর বহু চেষ্টায় পেলাম ছুটি। ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শিমুলতলায় কয়েক মাস কাটিয়ে ছুটির শেষে জয়েন করলাম খুলনায়। নদীর পারে দোতলা বাড়ি। চওড়া খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঠিক সামনেই দেখা যেত বিশাল ভৈরব, আর তার ওপারে সুপারি, নারকেল, আম-কাঁঠালের বাগানে-ঘেরা গ্রাম। সেখানেই পড়ে থাকত দিনের বেশীর ভাগ। একদিন বলল, ওগো, শোনো, এ জায়গাটা আমার বড্ড ভালো লেগেছে। এখানে আমাদের কিছু দিন রাখবে তো ?

আমি পাশে বসে তার রক্তশূন্য শীর্ণ হাতখানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বললাম, রাখবে বৈ কি ? এই তো সবে এলাম। এবার তুমি চটপট ভালো হয়ে ওঠো দিকিন।

মীরা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। এ যে শুধু ছলনা, সেও জানত, আমিও জানতাম।

আর কিছু দিন যেতেই বারান্দায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বিছানা থেকে তোলা বারণ। জানালার ধার ঘেঁষে খাট পাতা। তারই ওপরে শুয়ে শুয়ে সারা দিন কাটে। যখনই সময় পাই, পাশে এসে বসি। সেদিনও শিয়রের কাছে বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। রাত বোধ হয় দশটা। ছেলেরা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। মীরা শুয়ে আছে চোখ বুজে। একটা হাত শিথিলভাবে পড়ে আছে আমার কোলের ওপর। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। তার পর আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মিনিট কয়েক আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমার মাথাটা তুলে ধরে একটু বসিয়ে দাও না ? আর শুয়ে থাকতে পারছি না। কোনো রকম নড়াচড়া ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে পারলাম না। পিঠের কাছে গোটাকয়েক বালিশ দিয়ে হালকা দেহটা একটুখানি ওপরের দিকে

তুলে দিলাম। আবার কিছুক্ষণ তেমনি তাকিয়ে থেকে বলল, একটা কাজ করবে? সিন্দুক খুলে আমার গয়নার বাক্সটা এনে দাও না? বাধা দিয়ে বললাম, একটু ঘুমোও দেখি। এত রাত্রে গয়না দিয়ে কী হবে? মীরা চিরদিন ভাবী শান্ত, ভারী অনুগত। শুধু মেনে নেওয়াই ছিল তার স্বভাব। অনেক দিন ভুগে ভুগে আজকাল তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে উঠত। বলল, আঃ, তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না। বলছি, নিয়ে এসো না বাক্সটা? আর আপত্তি না করে এনে দিলাম। ওর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ডালাটাও খুলে দিলাম ওর সামনে। অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল।

বড়লোকের মেয়ে। বিয়ের সময় অনেক টাকার গয়না দিয়েছিলেন ওর বাবা। ওর কাজ ছিল মাঝে মাঝে সেগুলো ভাঙা আর নতুন করে গড়ানো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রাণ ধরে গায়ে তুলত না একখানাও। তাই নিয়ে একদিন কত অনুযোগ করেছি। হেসে বলত, আমার বড্ড লজ্জা করে। কখনো বলত, কী হবে সঙ সেজে। আর কি সে বয়স আছে? একবার বড় রাগারাগি কবেছিলাম এই নিয়ে। ও তখন নেহাত ছেলেমানুষ। কোনো এক জমিদারের বাড়ি নেমন্তন্ন। আমাকেও যেতে হবে। হাতে একসেট সোনার চুড়ি আর গলায় একটা সাধাবণ নেকলেস পরে বেরিয়ে এল। আমার মেজাজ গেল চড়ে। জিদ ধরলাম, জড়োয়া পরে না এলে আমি কিছুতেই যাব না। এর পরে আর না পরে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অন্ধকারে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার সবচেয়ে বড় অলঙ্কার যে আমার সঙ্গেই চলল সেটা বোঝ না? আর গয়না দিয়ে কী হবে?

সেই রাতটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। বললাম, এ সব তো চিরদিন বাক্সেই রয়ে গেল। আজ পরবে দুখানা? এসো না পরিয়ে দিই?

দূর—বলে আবার হাসল সেই সলজ্জ হাসি। তারপর বলল, ঐ নেকলেসটা আর ঐ বালাজোড়াটা দাও তো আমার হাতে। তাই দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে ও-দুটো আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আলাদা করে রাখো। আমার বীরু-নীরুর যখন বৌ আসবে, আমি তো থাকব না ; এই দিয়ে তুমি তাদের মুখ দেখো।

তুমি তো জান, ডাক্তার, চিরদিনই আমি কাঠখোট্টা মানুষ। চোখের জলটল আমার আসে না। সেদিন কিন্তু দুটো চোখ আমার ঝাপশা হয়ে উঠল। বললাম, তুমি চলে যাবে, আর বীরু-নীরুর বৌ দেখবার জন্যে পড়ে থাকব আমি একা ? সে অভিশাপ আমাকে দিও না, মীরা! মীরা আর কিছু বলল না। দেখলাম, তারও দু-চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কোঁচার খুট দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। একটু শান্ত হবার পর বলল, আর বাকী গয়নাগুলো আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম।

চমকে উঠে তাকালাম ওর মুখের দিকে। এ কী বলছে মীরা! ও যখন থাকবে না, ওর ঐ গয়না দিয়ে আমি আর-একজনকে সাজাতে বসব! যাবার সময় এই আঘাতটাই কি রেখেছিল আমার জন্যে! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মীরা বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের কথা। হাতের ওপর একটুখানি চাপ দিয়ে বলল, তুমি রাগ করছ? শোনোই না কী বলছি। তুমি যা ভাবছ, আমি তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারি না। ওগো, এতদিনেও কি তোমাকে চিনতে পারি নি ?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না। আমি কিছুই ভাবছি না মীরা! বলো, তুমি কী বলবে।

মীরা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, এ গয়না তো তোমাকে এমনি এমনি দিচ্ছি না! এ রইল আমার জরিমানা। যে অপরাধ তোমার কাছে করেছি, এ শুধু তার একটুখানি দণ্ড।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এর কী উত্তর দেব, বলো ? আমার

চেয়ে কে বেশী জানে, এই যে আজ সে নিতান্ত অসময়ে মৃত্যুর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, এব মূলে এমন কিছুই নেই, তোমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে, ব্যাধি। এর পেছনে আছে শুধু একটা রাত আর তাকে আশ্রয় করে একটি মেয়ের মরণাহত বীভৎস রূপ। আমার দু ফোঁটা সান্ত্বনা আর দুটো স্তোকবাক্য সেখানে কী করতে পারে! তবু বললাম, আমার কাছে তো তুমি কোনো অপরাধ কর নি। যদি কিছু করে থাক, সে শুধু একটা ভুল। ঐ অবস্থায় সব মেয়েই তা করত। তার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। মন থেকে সব দাগ তুমি মুছে ফেলে দাও।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার মাথাটা আমার কাঁধেব ওপর নামিয়ে দিয়ে বলল, ওগো, আমি জানতাম, যাবার আগে তোমার ক্ষমা আমি পাবই। কিন্তু, তুমি ক্ষমা করেছ বলেই তো আমার অপরাধ মুছে যায় না। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথাটা রাখো। আমার শেষ সাধটুকু পূর্ণ করতে দাও।

বললাম, বেশ দাও তোমাব গয়না। কিন্তু তুমিই যদি না বইলে, তোমার এই সোনার তাল দিয়ে আমি কী করব?

মীরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দেহের সবটুকু ভার আমার ওপব ছেড়ে দিয়ে সেই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু যেন শেষবারের মতো অনুভব কবতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ সেইভাবে কাটিয়ে আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে ধীবে ধীরে বলল, ঐ অভাগী মেয়েটা, যে শুধু শত্রুতাই করে গেল আমার সঙ্গে, ওব মতো য.রা বিনা দোষে জেলে আসে, তার পর বেবিয়ে গিয়ে সংসারে কোথাও ঠাঁই পায় না, পায় শুধু লাঞ্ছনা, এইগুলো দিয়ে তাদের একটা উপায় কোরো। এক ফোঁটা আশ্রয়ের অভাবে আর কেউ যেন অমন করে প্রাণটা না দেয়।—বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল আমার বুকের ওপর। আমি বাধা দিলাম না। এই কান্নার তার প্রয়োজন ছিল। আরো

কিছুক্ষণ পরে বুকের গুরুভার যখন একটু হালকা হয়েছে, আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে কাতর সুরে বলল, বলো, আমার কথা রাখবে ?

ওর রুক্ষ চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, রাখব। এবার তুমি ঘুমোও।

মীরার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের ওপর একটি পরম তৃপ্তির আভা ফুটে উঠল। অস্পষ্ট আলোতেও সেটা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

মাসখানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল !

নয়

কিছু কেনাকাটা এবং দু-চার জায়গায় দেখাশোনার দরকার ছিল। সে দিনটা তাতেই গেল। পরদিন ডাক্তার ধরে নিয়ে গেলেন বেলঘরিয়ায়। পথে যেতে যেতে বললেন তালুকদার, আজ তো তুমি একাই আসতে পারতে। আমার দরকার পড়ল কিসে ?

ডাক্তার বললেন, বাঃ, আপনাকে নিয়ে আবার ভালো করে সবটা দেখতে হবে না ? আজ যে চোখ দিয়ে দেখব, কাল তো তা ছিল না।

রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়েছে শান্তির টাইফয়েড। তার জন্যে যা কিছু করা দরকার, সে সব সেরে নিয়ে মহেশের সঙ্গে চারদিকটা আবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন দেবতোষ। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির গয়নাই কি আপনার একমাত্র সম্বল ?

তালুকদার বললেন, গোড়াতে তাই ছিল। বারো হাজার টাকা পেয়েছিলাম গয়না বিক্রি করে। তারপর আরো কিছু কিছু জুড়তে হয়েছে।

—এবং এখনো হচ্ছে।

—না, এখন আর বড় একটা পেরে উঠি না। ছেলে দুটোর বোর্ডিং-খরচা, তা ছাড়া—বলেই থেমে গেলেন।

দেবতোষ বললেন, তা ছাড়া যে আরো দু-চারটি পোষ্য আপনার আছে, তার কিছু কিছু খবর আমিও রাখি।

তালুকদার সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, এখন তো এদের আর পুঁজির দরকার নেই। নিজেদের খরচ কুলিয়ে বরং কিছু কিছু জমাতেও পারে। তিনটি মেয়ে আর একখানা তাঁত নিয়ে শুরু করেছিলাম। আজ বারোটি মেয়ে কাজ করছে। ওয়ার্কশপটাও তাই বাড়াতে হয়েছে।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, বৌদির কি কোনো ছবি আছে?

—না, কোনো দিন ফটোগ্রাফারের সামনে নিতে পারি নি। ঐ এক কথা—আমার বড্ড লজ্জা করে।

. সামনের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে, যেন কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার, কে জানে এটাও হয়তো বিধাতার অভিপ্রায়। তা না হলে মীরা শুধু ছবি হয়েই থাকত আমার কাছে; এমন করে এখানকার সব কিছুর মধ্যে তাকে পেতাম না।

সেই বুড়ী আজও বড়ি দিচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেখানটায় গিয়ে তালুকদার বললেন, কেমন আছ, পিসী!

বুড়ী একগাল হেসে বলে উঠল, এসেছ বাবা? কাল ওদের কাছে শুনলাম তুমি চলে গেছ। ভাবলাম, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে?

—কাল আর সময় হল না। আজ আবার এলাম।

—বেশ করেছ, বাবা! তোমার দয়াতেই আমরা এতগুলো মেয়েমানুষ দিব্যি খেয়ে-পরে সুখে আছি। তা না হলে—

—আমার জন্যে বড়ি রেখেছ তো?

—রেখেছি বৈ কি, বাবা। উমার কাছে আলাদা ঠোঙায় করে রাখা আছে। মনে করে নিও কিন্তু।

—নিশ্চয়ই নেব। সেবার যেগুলো দিয়েছিলে, দুটো চারটে করে এক মাস বসে খেলাম।

বুড়ীর শীর্ণ মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

স্টেশনের পথে তালুকদার বললেন, যা দেখছি, এই টাইফয়েডের ধাক্কা সামলাতেই তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

ডাক্তার অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললেন, কী বলছেন? ছুটি? আশীর্বাদ করুন দাদা, ছুটি আমার অক্ষয় হোক।

—তার মানে?

—তার মানে, গোলামি আর করতে চাই না। ভাবছি, এরই কোনো একটা গলির মধ্যে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বসে পড়ব।

—ও দুর্মতি ছাড়ো। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এম.বি-র ছড়াছড়ি। তোমার মতো ক্যাম্বেল-ওয়ালাকে পুঁছবে কে?

নিজেকে দেখিয়ে বললেন, এরকম বিনি পয়সার মক্কেল দিয়ে তো পেট চলবে না।

—খুব চলবে, দাদা! দুটো তো মোটে পেট। তার খাঁই আর কতটুকু?

তালুকদার গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, দেবতোষ! মেয়েগুলোকে দেখবার চালাবার কেউ নেই। ঐ শান্তিই যা হোক করে চালিয়ে নিয়েছে এত দিন। কাজকর্ম দেখাশুনা করা, তারও ভার ছিল ওরই ওপর। ও যবে থেকে পড়েছে, এখানকার অবস্থা প্রায় অচল। আমি যে মাঝে মাঝে এসে দেখব, তাও সম্ভব নয়। কাজেই তোমাকে পাওয়া আর হাতে স্বর্গ পাওয়া একই কথা। কিন্তু তাই বলে তোমার মতো একটি ছেলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে

এমনি একটা তুচ্ছ কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, তাও আমি হতে দেব না, ভাই! ও-সব পাগলামো কোরো না।

দেবতোষ হেসে ফেললেন, কিছু মনে করবেন না দাদা! আপনার কথা শুনে আমাদের অ্যানাটমির প্রফেসর ডাক্তার ঘোষের প্রথম লেকচারটা মনে পড়ল। আপনার এই 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' কথাটা তিনিও সেদিন অন্তত বার পাঁচেক আউড়েছিলেন। কিন্তু একটা অত্যন্ত সোজা কথা তিনি হয়তো জানতেন না, আপনি জেনেও চেপে যাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এই, যা কিছু উজ্জ্বল, তাই সুন্দর নয়। তার চাকচিক্যে চোখ ভুলতে পারে, মন ভোলে না।

তালুকদার সাহেবের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন দেবতোষ, আপনি কী ভাবছেন, আমি জানি। টাকাটা যে ভয়ানক কাম্য বস্তু, সেটা অস্বীকার করি না। তবে এ-ও জানি, ওটাই সব নয়। দু-একজন ভাগ্যবান ব্যক্তির খবর আমি রাখি, ডাক্তার হিসেবে যে কেরিয়ার তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সেটা সত্যিই উজ্জ্বল। সারা জীবন ধরে নেশার ঝোঁকে তাঁরা শুধু ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা মোটা অঙ্কের ডান দিকে শূন্যের পর শূন্য যোগ করে গেছেন। তারপর শেষ বয়সে যখন মনের পাতায় চোখ ফেরালেন, দেখা গেল বাঁ দিকের অঙ্কটা মুছে গেছে, পড়ে আছে শুধু ঐ শূন্য-গুলো। কিন্তু আমার শুধু শূন্য দিয়ে চলবে না, দাদা! এমন কিছু চাই যাতে মন ভরে।

তালুকদার এখনো কোনো সাড়া দিলেন না দেখে একটু আশ্বাসের সুরে বললেন দেবতোষ, আপনার ভয় নেই। এই মুহূর্তেই কিছু স্থির করে ফেলি নি। তবে হঠাৎ একদিন যদি শুনতে পান, বন্ধুরা আফশোস করে বলছে, মুখ্যু ডাক্তার এমন সাধের চাকরিটা রাখতে পারল না, শুনে যেন চমকে উঠবেন না।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে নিশ্বাস ফেলে বললেন তালুকদার, তোমার কপালে দুঃখ আছে, তা বুঝতে পারছি। তবে আপাতত সে

কথা ভাবছি না। ভাবছি, জেল-মহলে এতদিন মহেশ তালুকদারের নাম ছিল, 'মেয়েধরা'। অনেক সুনাম কুড়িয়েছি। এবার বোধ হয় 'ছেলেধরা' বলেও কীর্তি রেখে যাব।

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে দেবতোষকে একটা কী কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন সুলোচনা। তারপর আহ্নিক সেরে বারান্দায় এসে বসলেন মহেশের সামনে। কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললেন, আমার দেবুর একটি বৌ এনে দাও, বাবা! তুমি ছাড়া এ কাজ আমার আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—বেশ তো মা, আমি খোঁজে রইলাম। এ আর এমন শক্ত কী।

—জানো, মহেশ, এতদিন ওর বিয়ে নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাই নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, একজন চাই যে ওর ভার নেবে, ওকে বুঝবে, সব সময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে। মাকে দিয়ে সে কাজ চলে না। তা ছাড়া আমি আর ক-দিন?

—সে কথা বললে কিন্তু ঝগড়া করব, মা! ছেলের বিয়ে দিন। মনের মতো একটি বৌ নিয়ে অনেক দিন ঘর করুন। দু-চারটি নাতি-নাতনীর মুখ দেখুন। তবে তো আপনার ছুটি।

সুলোচনা হাসলেন, অতখানি আমি চাই না বাবা! দেবু আমার স্থির হয়ে বসেছে, এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে না, এইটুকু দেখে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।

সুলোচনা উঠে যাচ্ছিলেন। মহেশ বললেন, কিন্তু কী রকম মেয়ে আপনার পছন্দ, তা তো বললেন না, মা!

—শোনো কথা! কী রকম আবার। ওর মন যাকে চায়, যাকে পেলে ও সুখী হবে, তাকেই আমার পছন্দ। সে যে মেয়েই হোক, আমার কাছে তার একমাত্র পরিচয় সে আমার দেবতোষের বৌ। এর বেশী আমার আর কিছু জানবার নেই, বাবা!

ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মুখের আদল অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন তালুকদার, এত দিন দেবতোষকে দেখে আশ্চর্য লাগত। অত বড় একটা দরাজ মন। যত দেখেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। আজ আর হই না। দেখলাম, ওটা ও মাতৃগর্ভ থেকেই নিয়ে এসেছে।

সুলোচনা লজ্জা পেয়ে যেন শুনতে পান নি, এমনিভাবে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন।

পরদিন সকালের দিকে ট্রেন। চা-এর আগেই জামা-কাপড়টা সুটকেসে ভরে নিচ্ছিলেন তালুকদার। একটা লালচে গোছের কাগজ হাতে করে দেবতোষ ঘরে ঢুকলেন। আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে মহেশ বললেন, টেলিগ্রাম এল বুঝি?

—এল নয়; যাবে।

—যাবে!

—হ্যাঁ; এখন না পাঠালে ঠিক সময়ে পৌঁছবে কেন? ছুটি তো আপনার আজকেই শেষ।

মহেশ কাপড় গোছানো বন্ধ করে বললেন, তোমার মতলবটা কী বলো তো ডাক্তার? কাল তো একটা বাজে অজুহাত তুলে, যাওয়া বন্ধ করলে। আজকে আবার কোন ছল নিয়ে এসেছ?

—দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নেই, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই বলে গেছেন। কিন্তু দাদা, আজকের ব্যাপারে আমি শুধু আজ্ঞাবহ। বিশ্বাস না হয়, যাঁর আজ্ঞা তাঁকেই ডেকে নিয়ে আসছি।

—থাক; তোমাকে আর কষ্ট করে ডাকতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। মার সঙ্গে বোঝাপড়ার দরকার হলে আমি নিজেই করে নিতে পারব।

ওঁকে আর যেতে হল না। তার আগে সুলোচনাই এসে পড়লেন। ডালাখোলা সুটকেসটার দিকে চেয়ে দেবতোষকে বললেন, তুই বলিস নি বুঝি?

—বললাম তো। মানছেন কই? ওঁর নাকি ভয়ানক দরকার, না গেলেই নয়।

মহেশ ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, ডাক্তাররা জ্যান্ত মানুষকে মরা বলে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে, সবাই জানে। কিন্তু চোখের ওপর রাতকে দিন বানিয়ে দেয়, সেটুকু জানতে বাকী ছিল!

সুলোচনা হাসিমুখে বললেন, ঠিক বলেছ, বাবা! ঐ জন্যে ওর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু তোমার কোনো কাজের ক্ষতি হবে না তো?

—কিছু না। আর যদি হয়ও, সে ক্ষতির চেয়ে লাভটাই কি বেশী নয়? আর একটা দিন মায়ের কাছে থাকতে পেলাম।

সুলোচনার মুখখানা মাতৃগৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কতটুকুই বা থাকতে পার মায়ের কাছে। এসে অবধি ছুটোছুটির তো আর বিরাম নেই। এখনি আবার আমার সঙ্গে বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবেন, মা?

সুলোচনার মুখের উপর একটুখানি করুণ ছায়ার স্পর্শ লাগল। মুহূর্তকাল নতমুখে থেকে বললেন, কাল অনেক রাত পর্যন্ত দেবুর কাছে সবই শুনলাম। তখন থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমার সঙ্গে গিয়ে একবার ওদের দেখে আসব।

—আপনি যাবেন ওদের কাছে! বিস্ময়ে আনন্দে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন তালুকদার।

—কেন যাব না বাবা? আমার মীরা মা বেঁচে থাকলে সেই তো সব করত। সে নেই বলে, তার এই কাজটুকু যাতে কোনো দিকেই অসম্পূর্ণ থেকে না যায়, আজ আমাদের সবাইকে তাই দেখতে হবে।

মহেশ দাঁড়িয়ে রইলেন অভিভূতের মতো। সুলোচনার মৃদুকণ্ঠ আবার শোনা গেল, দেবুকে তাই বলেছিলাম, তুমি যা করছ, তার

তুলনা হয় না। ঐ আশ্রয়টুকু না পেলে ওরা ভেসে যেত, কিংবা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত, যার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তোমরা পুরুষ মানুষ। যতই দাও, মেয়েদের সব অভাব মেটাতে পার না। খানিকটা থেকে যায়, যা তোমাদের হাতের বাইরে। সেটা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ বাবা! আমরা যে রাক্ষসের জাত। আমাদের ক্ষিদে কিছুতেই মিটতে চায় না।

মহেশের চোখের উপর জেগে উঠল অনেক বছর আগেকার একটি রাত। তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। কানে এল তার ব্যাকুল কান্না। হঠাৎ চমকে উঠলেন সুলোচনার কণ্ঠস্বরে। উনি বলে চলেছেন, আমার তো করবার কিছু নেই; সে শক্তিও নেই। তবু আমাকে দেখে যদি ওদের মনে এইটুকু বিশ্বাস জাগে যে ওটা শুধু ইস্কুল নয়, আশ্রয় নয়, ভাত-কাপড় আর একটু মাথা গুঁজবার জায়গা—এই দিয়েই তোমরা ওদের ধন্য কর নি, আরো কিছু আছে ঐ ঘর ক-খানির মধ্যে, যাতে মেয়েমানুষের মন ভরে, যা ওরা দু-হাত দিয়ে আকড়ে ধরতে পারে, সেই জন্যেই আমার যাওয়া। যদি না বুঝে থাকে, সেই কথাটাই আমি ওদের বুঝিয়ে দেব। এইটুকু ছাড়া আমার আর কী করবার আছে?

মহেশ বললেন, মা, আজ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নেই।

সুলোচনা হেসে বললেন, শোনো ছেলের কথা! কী অপরাধ করলে তুমি?

—ওদের কোনো কথাই আপনাকে বলি নি। হয়তো আজও কিছু না জানিয়েই চলে যেতাম। দেবতোষ আমাকে সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

—তাতে কোনো অপরাধ হয় নি, বাবা! এ কি বলে বেড়াবার জিনিস?

—কেন যে বলি নি, আমার সব কথা শুনলে হয়তো বুঝতে

পারবেন। একথা আমার মনে হয়েছিল, দেবতোষকে তাই বলছিলাম সেদিন, এই মেয়েগুলোর যে অভাব, সে শুধু অন্ন-বস্ত্রের নয়, শুধু আশ্রয়ের নয়। যে ঘর ওরা একদিন ছেড়ে এসেছিল, তার পর আর ফিরে পায় নি, গিয়ে দেখেছে দোর বন্ধ, সুখে, দুঃখে, ভক্তি, ভালোবাসায় ভরা সেই ঘরের আস্বাদটুকু যদি ওদের দিতে না পারলাম, তাহলে তো কিছুই হল না! সেই কথা মনে করেই লোক-লস্কর, ইট-কাঠ জড়ো করে আশ্রম বা হোম্ না বানিয়ে, ছোট একটা গৃহস্থ-পল্লীর মধ্যে ঐ বাড়িটুকুতে এনে ওদের তুলেছিলাম। মনে মনে এই আশা ছিল, আপনার জনের কাছে জায়গা না পেলেও পরের কাছে, প্রতিবেশীর কাছে মানুষের যে স্বাভাবিক পাওনা, সেটুকু থেকে ওরা বঞ্চিত হবে না। কিন্তু মা, সে আশা আমার সফল হয় নি।

সুলোচনা বললেন, আশাটা তোমার অতিরিক্ত ছিল বলেই সফল হয় নি, বাবা!

—কিন্তু তখনো আমি হাল ছেড়ে দিই নি। আমার দু-একটি আত্মীয়া—নাম বললে, আপনি না চিনলেও দেবতোষ চিনবে—আমরা যাকে বলি, সমাজ-কল্যাণ বা সেবাব্রত সেখানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা আছে। অনাথ-আতুর নিয়ে তাঁরা বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালিয়ে থাকেন। তাঁদের দু-একজনকে ধরে আমার ঐ বেলঘরিয়ার গলিতে নিয়ে এলাম। মেয়েদের ডেকে এনে বসিয়ে দিলাম ওঁদের পায়ের কাছে। ওঁরা অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। পাপী-তাপী বিপথগামী মানুষের উদ্ধারের জন্যে যে-সব বড় বড় কথা বলে গেছেন মহা-পুরুষেরা, তারই কতকগুলো আওড়ে গেলেন। যখন চলে গেলেন, মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, তারা শিখল হয়তো অনেক, কিন্তু পেল না কিছুই। তার পরেও তাঁরা এসেছেন। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি না হয়। তাঁরা যে ওদের বিশিষ্ট অতিথি, ওদের আশ্রয়দাতার পরম শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়া।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি এখনো আসেন?

—না, মা! দু-চার বার এসেই এ-সব ছোটখাট ব্যাপারে নজর দেবার মতো উৎসাহ তাঁদের চলে গেল। আমিও বেঁচে গেলাম।

দেবতোষ বললেন, আপনি ভুল করেছেন, দাদা! লেগে পড়ে থাকলে ওঁদের হাত দিয়ে একটা মোটা রকম ডোনেশন-ফোনেশন আদায় করতে পারতেন। আর কিছু না হোক, গোটা কয়েক ঢেঁকি আর কুলো বাড়ানো যেত, দুটো পয়সা আসত। যাক সে সব বকেয়া কথা। আপাতত সবচেয়ে দরকারী কথা হল, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

—অ্যাঁ, তাই নাকি! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুলোচনা, যাই, তোমাদের চা নিয়ে আসি। ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে!

—কিচ্ছু বেলা হয় নি মা! চায়ের জন্যেও আমাদের কোনো তাড়া নেই।

—উঁহুঁ, ওটা একবচনই রাখুন, দাদা, মাথা নেড়ে বললেন দেবতোষ। আটটার সময় চায়ের তাড়া নেই, এতখানি অপবাদ আমাকে অন্তত দেবেন না।

মহেশও রীতিমত তেড়ে উঠলেন, দেখো ডাক্তার, বেশী ঘাঁটিও না, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। বনমালীর রাজ্যে যখন ছিলে, কী রকম আটটার সময় চা জুটত, আমার তো আর জানতে বাকী নেই ভায়া!

সুলোচনা বললেন, বল কী বাবা, এ দিকে তো দেখি বনমালী বলতে অজ্ঞান!

—তা হলে কী হবে? মাসের মধ্যে অন্তত দশ দিন বনমালীর ভাঁড়ারে মা ভবানীর রাজত্ব। সকাল আটটায় কেটলিতে জল ফুটছে; হঠাৎ দেখা গেল চা নেই। ছুটল আমার নিধিরামের কাছে। চায়ের সমস্যা মিটল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার এল ছুটতে ছুটতে। কী ব্যাপার? দুধ নেই। এইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে তিন দফাও ছুটতে হয়। চা করতে হলে চিনিও তো চাই।

বলে, হেসে উঠলেন। সুলোচনা ব্যথিত স্বরে বললেন, তবু ঐ হত-ভাগাটাকে কিছুতেই তাড়াবে না।

দেবতোষ বললেন, ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস কর, মা? সব বাড়িয়ে বলছেন।

—বাড়িয়ে বলছি! আমার সব নোট করা আছে হিসেবের খাতায়। দয়া করে বিলটা এখনো পাঠাই নি।

—বিলের কথা যখন তুললেন দাদা, তাহলে বলতে হয়, ওটা এ তরফ থেকেও যেতে পারে, এবং তাতে বোধ হয় আমারই লাভ।

—কী রকম?

—আজ্ঞে, বনমালী যদি নিধিরামের কাছে দশ বার গিয়ে থাকে, নিধিরাম বনমালীর শরণ নিয়েছে অন্তত সতেরো বার। চা-টা চিনিটা তো আছেই, মাঝে মাঝে ডাল চড়িয়ে দেখা গেল নুন নেই।

—নুন নেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নুন নেই।

দুজনের মিলিত হাসির শব্দে ঘর ভরে উঠল। সুলোচনাও মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন চায়ের জোগাড়ে।

চা-পর্ব শেষ হবার পর সুলোচনা বেলঘরিয়া যাবার উদ্যোগ করতে যাচ্ছেন, এমন সময় মহেশ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, মায়ের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

সুলোচনা ফিরে দাঁড়ালেন।

মহেশ বললেন, বলছিলাম আমি আজ থাকি। আপনি দেবতোষকে নিয়ে যান।

—কেন! সবিস্ময়ে বলে উঠলেন সুলোচনা।

একটু ইতস্তত করে বললেন তালুকদার, আমাকে সঙ্গে দেখে ওরা যদি আপনাকেও আমার সেই বড় বড় আত্মীয়াদের দলে ফেলে, সেটা তো আমি কিছুতেই সইতে পারব না। অথচ তার জন্যে ওদের দোষ

দেবারও কিছু নেই। তাই বলছিলাম, আপনি নিজেই যান। আমি থাকি।

কথাগুলো সহজ সুরেই বললেন তালুকদার। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত বেদনাটুকু সুলোচনার অন্তর স্পর্শ করল। উত্তরে একটি কথাও বললেন না। শুধু তাঁর স্নিগ্ধ চোখ দুটি অপরূপ কারুণ্যে ভরে উঠল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি তেমনি নিঃশব্দে দেবতোষের সঙ্গে রিকশায় গিয়ে উঠলেন।

দশ

যারা জেল খাটে তাদেরও ছুটি আছে, সপ্তাহান্তে একদিন। কিন্তু যারা জেলের জন্যে খাটে, তাদের ও বালাই নেই। পালপার্বণে তাদের ভারী প্রোগ্রাম, রবিবারে বিশেষ রুটিন। নিতান্ত দায়ে পড়ে দু-চার দিন যদি বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, মুলতুবি কাজগুলো বসে থাকে ওত পেতে, ফিরে এলেই চেপে বসে। বেশ কিছুদিন আর ঘাড় তোলবার অবসর দেয় না।

জেলর সাহেব ফিরে আসবার পর সুশীলা একটু ফুরসত খুঁজছিল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে। কিন্তু দুটি বেলায় তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করেছে, হয় তিনি ডুবে আছেন কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে, নয় তো তাঁকে ঘিরে রয়েছে ডেপুটি বা কেরানীবাবুদের দল। দিন পাঁচ-ছয় পর বিকাল বেলা ডিউটিতে যাবার পথে হঠাৎ একটু ফাঁক দেখে ঢুকে পড়ল একদিন। তালুকদার মুখ তুলতেই বলল, হেনা একটু আসতে চায়, বাবা! ক-দিন ধরেই বলছিল। যা ভিড়, আমি আনতে সাহস করি নি।

মহেশের মনে পড়ল, শেষ যেদিন তার সঙ্গে দেখা, হেনাকে কথা

দিয়েছিলেন, একদিন তার সব কাহিনী শুনবেন। তার জন্যে সময় হয়তো আছে, কিন্তু মনের একটা প্রস্তুতি দরকার। সুশীলাকে বললেন, আজ তো হয় না। ওকে একটু সময় দিতে হবে। তুমি বরং—বলে ডায়রি খুললেন, তারিখটা নির্দিষ্ট করে দেখার জন্যে। সুশীলা বলল, ও বলছিল, ওর যা কথা পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে।

মহেশ ডায়রি বন্ধ করে বললেন, ও, তাহলে এখনই নিয়ে এসো।

হেনা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তালুকদার বললেন, তোমার সেদিনের কথা আমার মনে আছে। তার জন্যে আরেক দিন ডাকব। তা ছাড়া আর কিছু বলবে ?

হেনা মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করল, না, আর কিছু নয়। সেই জন্যেই এসেছি। ভেবে দেখলাম, ওটা আমার বলা হবে না।

তালুকদার জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। বলতে যাচ্ছিলেন, বেশ তো, নাই বা বললে। কিন্তু তার আগেই বলে উঠল হেনা, আপনার কাছে বসে নিজের মুখে স্বচ্ছন্দে বলে যাব, তেমন কথা তো আমার নয়। এ এমন কথা, যা বলতে গেলে বোধ হয় সব মেয়েরই জিভ আটকে যাবে। তবু, না বলেও আমার উপায় নেই। তাই এত অপরাধের পর আর-একটা অপরাধ করে বসলাম—বলে, আঁচলের আড়াল থেকে একটা বাঁধানো খাতা বের করে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। তারপর আবার পিছনে সরে গিয়ে বলল, মুখ ফুটে যা বলতে পারি নি, অথচ যা না বলেও আমার স্বস্তি নেই, লজ্জার মাথা খেয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়েছে এই খাতার পাতায়। প্রতি মুহূর্তে সে যে কী কঠিন পরীক্ষা, সে শুধু আমিই জানি। কী করব ? এ ছাড়া যে আমার আর কোনো পথ ছিল না।

খাতাখানা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলতেই জেলর সাহেবের দুটি চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ভরা প্রসন্ন দৃষ্টি। মানুষের হস্তাক্ষরের

সঙ্গে মুক্তার তুলনা এত দিন কবিজনোচিত কল্পনা বলেই তাঁর ধারণা ছিল। আজ মনে হল, কথাটার মধ্যে অত্যুক্তি যদি বা থাকে, তা সামান্যই। হেনার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি পাতাগুলো উলটে যেতে লাগলেন। হেনা কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি কী দেখছেন, আমি জানি।

—কী বলো তো ?

—খাতাটা ঠিক পথ দিয়ে আমার হাতে আসে নি। ওতে আপনার আফিসের ছাপ নেই।

—তাই নাকি! হুঁ, তাই তো দেখছি। কিন্তু গেল কী করে ?

—তার জন্যে যা কিছু অপরাধ সব আমার। যে শাস্তি দেবেন, খুশী মনে মাথা পেতে নেব।

—কিন্তু শাস্তিটা তো তোমার একার পাওনা নয়? আর একজনকে পাচ্ছি কোথায় ?

'আরেক জন'-এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হেনাব সমস্ত মুখখানায় হঠাৎ একরাশ আবির ছড়িয়ে গেল। সেইটুকু লুকোবার জন্যে সে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। একথা আর বলা হল না, আপনার অনুমান মিথ্যা। খাতা আমি তাঁব কাছ থেকে পাই নি।

জেলর সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি খুব ভালো আলপনা দিতে পার, না ?

—আলপনা! সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল হেনা।

—হ্যাঁ।

—না তো ? আলপনা আমি কোনো দিন দিই নি।

—তা হবে। খাতাটা খুলে সকলের আগে ঐ কথাই আমার মনে হয়েছিল।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। তার সুন্দর লেখার সুখ্যাতি সে আগেও অনেক শুনেছে। কিন্তু এমন সুন্দর করে তা কেউ

বলে নি। একটি লাজনম্র আনন্দের স্নিগ্ধ আলোয় তার আনত মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল।

সেদিন জেলর সাহেবের সান্ধ্য আফিস সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সংক্ষেপে সেরে নিয়ে খাতাখানা হাতে করে বসলেন গিয়ে দক্ষিণের বারান্দায়। প্রথম দৃষ্টিতে যে আলপনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, সেটা এর লিপিসজ্জার সৌষ্ঠব। কিন্তু অক্ষরের ফ্রেম পার হয়ে যতই ভিতরে ঢুকলেন তালুকদার, দেখতে পেলেন, এই খাতাটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যে শঙ্কা, বেদনা, লজ্জা, লাঞ্ছনার বিচিত্র আলেখ্য, সে-ও এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা বঞ্চিতা নারীর নিভৃত মনের আলপনা। শেষ পাতাটি যখন শেষ হল, যেমন-তেমন করে-বলা এই অগোছালো, ইতস্তত ছড়ানো কাহিনীগুলো তিনি মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কত কথা সে বলতে গিয়েও বলতে পারে নি। বারে বারে তার ছিঁড়েছে, হারিয়ে গেছে খেই। সেই না-বলা কথার ফাঁকটুকু তিনি ভরে দিলেন নিজের ভাষায়, মমতার স্পর্শ দিয়ে জুড়ে দিলেন তার ছিন্নসূত্র। এমনি করে যে-হেনাকে তিনি দেখেন নি, বিভিন্ন পটভূমিকার উপর গড়ে-ওঠা তারই একটি অখণ্ড রূপ তাঁর চোখের সুমুখে ভেসে উঠল।

* * *

দুর্দান্ত খেয়ালী নদী আড়িয়ালখাঁ। তার উত্তর পারে খানিকটা জায়গা নিয়ে অনেকগুলো বড় বড় টিনের ঘর। পাশ দিয়ে চলে গেছে ধুলোর রাস্তা। নগর নয়, শহর নয়, আশেপাশের লোকেরা বলে গঞ্জ। নামটা কিন্তু ভয়ানক জমকালো—বাহাদুরনগর। হয়তো কোনো কালে কাছে-ধারে কোথাও সত্যিকার নগর বসিয়ে রাজত্ব করতেন কোনো রাজা কিংবা নবাব বাহাদুর। তাঁর পর একদিন লেলিহান রসনা বিস্তার করে ছুটে এল আড়িয়ালখাঁ। একে একে

গ্রাস করল তার সকল কীর্তি। যাবার সময় উগরে রেখে গেল খানিকটা উচ্ছিষ্ট—যাকে বলে চর। তারই উপরে গড়ে উঠেছে এই গঞ্জ। দূর-দূরান্তর থেকে পাল তুলে ছুটে আসে বড় বড় সওদাগরী নৌকা, বয়ে আনে কত রকমের পণ্য—তেল, গুড়, লবণ, তামাক, নারকেলের দড়ি, তার সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার নানা চটকদার বিদেশী বিলাস। ফেরবার পথে নিয়ে যায় এ দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ—ধান, পাট, সর্ষে, কলাই। এই বাহাদুরনগরের একটা জীর্ণ ভাঙা ঘাটের পাশে, হাট-বাজারের কোলাহল থেকে দূরে ঝুরিনামা বটের ছায়ায় হেনা এসে বসত তার দাদার সঙ্গে। গঞ্জের পিছনে, নদী থেকে খানিকটা দূরে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল একসার টিনের বাড়ি—থানা, তার পাশে ডাকঘর, ডাক্তারখানা, আর একটু তফাতে রেজিস্ট্রেশন আফিস। ওদের বাবা ছিলেন ঐ ডাকঘরের ব্র্যাঞ্চ পোস্টমাস্টার, সদাশিব মিত্র। বিপত্নীক বৃদ্ধ। সংসারে দুটি মাত্র তাঁর আসক্তি—একটা পুরনো আমলের গড়গড়া, আর এক সেট বৈষ্ণব-সাহিত্য। আফিসের সঙ্গেই বাসা। খানদুয়েক থাকবার ঘর। উপরে টিন, মাটির মেঝে, ছ্যাচা বাঁশের বেড়া। বড় ঘরটার মাঝখানে পার্টিশান। তার এক দিকে থাকতেন তিনি আর এক দিকে হেনা। ছোট ঘরটাতে থাকত তার দাদা। আফিসের কাজটুকু শেষ হলেই তিনি তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসতেন। বাঁ হাতে নল, আর ডান হাতে কখনো বিদ্যাপতি, কখনো চণ্ডীদাস, কখনো বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত। একাধারে সরকারী পিয়ন এবং বেসরকারী বাহন শম্ভু এসে মাঝে মাঝে কলকে পালটে দিত।

মা যখন মারা যান, হেনার বয়স হবে সাত। দাদা তার বারো-তেরো বছরের বড়। বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার পর পাশের খবর বেরোল। কিন্তু অজয়ের আর বেরোনো হল না। জড়িয়ে পড়ল ঐ বোনটিকে নিয়ে। সংসারে স্ত্রীলোক নেই। ওকে খাওয়ানো

পরানো, আগলে রাখা, ভুলিয়ে রাখা, সব দাদার হাতে। বেশ খানিকটা বড় হবার আগে পর্যন্ত দাদাই তার চুল বেঁধে দিত। বড় হয়ে যখন নিজে বাঁধতে শিখেছে, তখনো ফিতে কাঁটা নিয়ে মাঝে মাঝে তার ঘরে গিয়ে হাজির হত, চুলটা বেঁধে দাও না দাদা! অজয় হয়তো তখন পড়াশুনা করছে। তেড়ে উঠে বলত, পালা। তার পর কোনো কোনো দিন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত। বোনকে কাছে ডেকে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলত, হ্যাঁরে, মার কথা তোর মনে পড়ে?

হেনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠত, মায়ের কথা মনে পড়ে নয়, দাদার হাতের নিবিড় স্পর্শে। মনে মনে বলত, কেমন করে পড়বে? তুমি ছাড়া আর কোনো মাকে তো আমি জানি না?

মেয়েদের একটা মাইনর ইস্কুল ছিল ওদের বাড়ির কাছেই। বই-খাতা নিয়ে হেনা সেখানে পড়তে যেত। ভালো ছাত্রী বলে তার নাম ছিল। হেড মিস্ট্রেস সুরমাদি খাতির করতেন, স্নেহও করতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আলাদা করে পড়াতেন। কিন্তু হেনার আসল স্কুল ছিল তার দাদার ঘর। কত বই ছিল অজয়ের। বেশীর ভাগ প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, মহাপুরুষ এবং মনীষীদের উপদেশ। একটু যখন বড় হয়েছে, মাঝে মাঝে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করত। ভারি ভালো লাগত শ্রীম-কথিত কথামৃত, স্বামীজীর বীরবাণী, ভগিনী নিবেদিতার অপূর্ব জীবনকথা। কী সব সমিতির সভ্য ছিল তার দাদা। কোথায় কলেরায় গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, কোথায় বন্যায় তিন হাজার লোকের আশ্রয় নেই, কোথায় হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গেছে একটা গোটা বাজার, খবর পেলেই দাদা আর তার দু-চারটি বন্ধু ওষুধপত্তর চাল কম্বল ঘাড়ে করে ছুটত। এমন দিন গেছে যখন হয়তো একনাগাড়ে দশ-বারো দিন অজয় বাড়ি আসে নি। ভারী ভাবনা হত হেনার। কিন্তু বাবা একটি বারও জানতে চাইতেন না, তার কী হল। খোঁজ-খবর নেবার

কথা বলতে গেলে নিশ্বাস ফেলে বলতেন, কিছু দরকার নেই, মা! যখন তার সময় হবে, আপনিই আসবে।

মাঝে মাঝে অজয়ের কোনো কাজ থাকত না। তখন হেনাকে ডেকে নিয়ে পড়াত, কত গল্প বলত দেশ-বিদেশের। কোনো কোনো দিন বিকেলবেলা সঙ্গে করে নিয়ে যেত সেই ভাঙা ঘাটে। আড়িয়াল-খাঁর বুকের উপর নানা আকারের নৌকার ভিড়। ওপারে গাছ-পালায় ঘেরা গ্রামের ছবি। হেনা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। একদিন ওদের সামনে দিয়ে দু-ধারে ঢেউ তুলে চলে যাচ্ছিল একখানা সুদৃশ্য স্টীম-লঞ্চ। বোধ হয় কোনো পাটের সাহেবের বাহন। হেনা হাত তুলে বলল, দেখো দাদা, কী সুন্দর স্টীমারখানা!

অজয় কী ভাবছিল। গম্ভীব ভাবে বলল, হ্যাঁ, ওটা হল সামনেব সীন। ওর উলটো দিকটা তেমনি কুশ্রী।

হেনা বুঝতে না পেরে দুটি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ধবল দাদার মুখের উপর। অজয় বলল, আমাদের বাবোয়ারী তলায় দুর্গা-প্রতিমা দেখেছিস তো? কী চমৎকার দেখতে! পেছনে গিয়ে একদিন উঁকি মেরে দেখিস।

—কী সেখানে? প্রশ্ন করল হেনা।

—একগাদা দড়ি-দড়া, নোংরা বাখারি আর ছেঁড়া চট। ওগুলো না হলে প্রতিমা তৈরি হয় না।

—বাঃ, তা হবে কেমন করে?

—ঠিক তেমনি। ঐ যে স্টীমারটা দেখে তোর চোখ ঝলসে গেল, ওর উলটো পিঠ আছে। সেখানে রয়েছে আমাদের কয়েক লক্ষ নোংরা ভাঙা ঘর আর ছেঁড়া কাঁথা। তার ওপর মুখ থুবড়ে খাবি খাচ্ছে একপাল কঙ্কাল। তাদের রক্ত আর মাংস দিয়ে তৈরী হয়েছে ঐ ময়ূবপঙ্খী।

এ কথার কী উত্তর দেবে হেনা! এসব যখন বলত, দাদার মুখে ফুটে উঠত কেমন একটা অদ্ভুত হাসি! সে হাসি দেখলে ভয়-ভয় করে, বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

কোনো কোনো দিন বাড়ি ফেরার পথে গঞ্জের ঐ সারি সারি টিনের শেডগুলো দেখিয়ে বলত, আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছা করে জানিস হেনা? ঐ টিনগুলো সব আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিই।

হেনা চমকে উঠত। তারপর আশ্চর্য করুণ কণ্ঠে বলত অজয়, ঐ আপদ যেদিন আসে নি, কী শান্তিই না ছিল আমাদের খোড়ো ঘরে। রোগ নেই, অভাব নেই, দেশ জুড়ে ঝলমল করছে আনন্দ। এই ঢেউ-টিনের ঢেউ লেগে সব ভেসে গেল। হেনার ইচ্ছা হত জিজ্ঞাসা করে, কী করে গেল। কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারত না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অজয় আবার তুলত সে কথা।

কিসে গেল জানিস? ঐ পাট। সাহেবরা আর তাদের দিশী চেলারা বলে বেড়ায় পাট নাকি বাংলার সম্পদ। সম্পদই বটে! ওরই লোভে রাতারাতি খেপে উঠল মানুষগুলো। যেখানে যত ছিল খেত-খামার, ভিটে, ডাঙা, সব ভেঙে চষে অন্ধের মতো ছড়িয়ে গেল পাটের বীজ। পাটের বীজ নয়, সর্বনাশের বীজ। দেশের খাদ্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, তার জায়গায় এল গোছা-গোছা করকরে নতুন নোট। তাই দিয়ে কিনল বিলাতী ঢেউটিন, জার্মান আলোয়ান, জাপানী ছাতা আর দিশী কুইনাইনের বড়ি। নোটের বাণ্ডিল আর কদ্দিন? ঐ টিনেও আজ টান ধরেছে। গাছতলা ছাড়া আর গতি নেই। তাই বা কোথায়? গাছ তো গেছে সেই প্রথম চোটে।

বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অজয়। পাশের একটা আগাছা জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে বলল, তুই দেখিস নি, হেনা! এইখানে ছিল একটা মস্ত বড় কলমের বাগান। ছেলেবেলায় কত দিন আম কুড়োতে এসেছি। কী মিষ্টি আম! আর তেমনি জাম হত ঐ কোণের দিকে একটা গাছে। গোটা অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো খেয়ে ছড়িয়ে শেষ করতে পারত না। তারপর একবার

গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে দেখি, সব ম্যাজিকের মতো উড়ে গেছে। তার জায়গায় লম্বা লম্বা পাট। ঐ যে এঁদো পুকুরটা দেখছিস, ডালিমের রসের মতো জল ছিল। পাট পচিয়ে পচিয়ে ওর ঐ দশা। এই তো সেদিনের কথা। আজ পাটও নেই। পড়ে আছে শুধু আশসেওড়া আর শিয়ালকাঁটার বন।

এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা, আর পাট বুনছে না কেন?

—দর নেই যে। কিন্তু এদিকে ধান-চালের বাজার আগুন।

—এবাব তাহলে চালের দাম কমবে, না দাদা? খুশী হয়ে বলল হেনা। ঐ বস্তুটির চড়া দর যে একটা সাংসারিক দুশ্চিন্তার কারণ, সেটা বোঝবার বয়স তার অনেক আগেই হয়েছিল। অজয় সায় দিল না, তেমনি চিন্তিত মুখেই বলল, তা আর হয় না। এ বড় মজার জিনিস। একবার চড়ে বসলে আর টেনে নামানো যায় না।

. —কেন?

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলত অজয়, বড় হ; লেখাপড়া শেখ। তারপর নিজেই বুঝতে পারবি।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল হেনা। ইস্কুলে যায় আসে। সঙ্গী, সাথী বলতে ঐ দাদা আর তার লাইব্রেরি। সমবয়সী মেয়েরা খেলাধূলা ছুটোছুটি করে। ও থাকে এক পাশে। ওদের সঙ্গে কোথায় যেন ওর মস্ত বড় অমিল। মনের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা। চারদিকে অভাব, দৈন্য, রোগ, শোক। এর কি কোনো শেষ নেই? আছে বৈ কি? একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন মানুষের কোনো দুঃখ থাকবে না। কবে, কেমন করে আসবে সেদিন, এই তার চিন্তা। মেয়েরা তাকে• এড়িয়ে চলে। আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সেদিকে ওর খেয়াল নেই। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।• নিতান্ত ছোটটি নয়। সে কথা তাকে কেউ মনে করিয়ে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে এখনো যেন তার ঘুম ভাঙে নি।

নিজের দেহ-সজ্জার দিকেও চোখ পড়ে নি। এমনি সময়ে একদিন ছুটির পরে তার ডাক পড়ল হেড মিস্ট্রেস সুরমাদির ঘরে। দু-একটা মামুলি কুশল প্রশ্নের পর তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শাড়ি নেই, হেনা?

—হ্যাঁ; আছে তো। এবার পুজোয় একটা সুন্দর শাড়ি দিয়েছেন বাবা।

—বাবাকে বোলো, আরো শাড়ি কিনে দিতে। কাল থেকে আর ফ্রক পরে এসো না, কেমন?

—কেন? বলেই অকস্মাৎ কিসের লজ্জায় হেনার সমস্ত দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে খুলে গেল তার দৃষ্টির আবরণ। এ যেন নিজেকে নিজের আবিষ্কার। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় কেন যে লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেন যে বন্ধুরা গা টেপা-টিপি করে নিজেদের মধ্যে, আর তাকে দেখলেই চুপ করে যায়, সব যেন অন্ধকারে হঠাৎ জ্বলে-ওঠা বিদ্যুৎ-শিখার মতো তার চেতনার মধ্যে চমক খেলে গেল।

প্রথম শাড়ি পরে দাদার ঘরে গিয়ে প্রণাম করতেই কৃত্রিম বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল অজয়, আরে, হেনা! আমি ভাবছিলাম এ আবার কোন্ ভদ্রমহিলা এলেন আমাদের বাড়ি?

—যাও, বলে মাথা নিচু করে দাঁড়াল হেনা। কুয়াশা-মুক্ত অরুণাভাসের মতো তার মুখে সেই লজ্জার স্পর্শটুকু অজয়ের চোখেও নতুন লাগল। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, হঠাৎ আজ পেন্নামের ঘটা কেন?

—বাঃ, ঘটা আবার কিসের? নতুন কাপড় পরলাম, তাই।

—ও-ও, আমি মনে করেছিলাম, এটা বুঝি নোটিশ।

—কিসের নোটিশ! ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—নোটিশ, মানে, তোমাদের বাড়ি আর পোষাচ্ছে না, চললাম এবার নিজের ঘরে।

—তুমি ভারী অসভ্য হয়েছ, দাদা! বলেই পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

এই যে নবজন্মের আস্বাদ এল হেনার মনে, খাতার পাতায় তার একটুখানি আভাস দিয়েই সে চলে গেছে অন্য কথায়। তালুকদার সাহেবের মানস চক্ষে সেই ছবিটি স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তিনি তো জানেন, এ হচ্ছে সেই চিররহস্যময় বয়ঃসন্ধি, যখন নিজেকে দেখে নিজেরই বিস্ময় লাগে। মনে হয়, যেন ঘুমিয়ে ছিলাম, রাতারাতি জেগে উঠে দেখি, আরেক দেশে এসে পড়েছি। যা কিছু দেখছি, তাই রঙীন, তাই স্বপ্নময়। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ অবাক হয়ে দেখে, তাদের সেই ক্ষীণাঙ্গী চঞ্চল কিশোরী মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেল। তার জায়গায় যে এল তার প্রতি অঙ্গে দেখা দিয়েছে জোয়ারের জাগরণ। শুধু তনুরেখায় নয়, পূর্ণতার নবরূপ এসেছে তার গতিতে, তার চলার ছন্দে, তার কণ্ঠে, তার হাব-ভাবে লীলায়। যেখানে সেখানে সে ঝড়ের মতো এসে পড়ে না। যখন তখন শোনা যায় না তার উচ্ছল হাসির কলধ্বনি। চোখের দিকে তাকালে চকিত লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। একলা বসে ভাবে, কিন্তু ভেবে পায় না কী করবে তার নতুন-পাওয়া নিজেকে নিয়ে, কোথায় রাখবে তার এই হঠাৎ-ভরে-ওঠা লাবণ্যের সম্ভার। নির্জন ঘরের জানালা দিয়ে স্বপ্নময় দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয় দূরে-দূরান্তরে! কী দেখে সে জানে না। কথায় কথায় সে আনমনা। কারো ডাক শুনলে চমকে ওঠে। অকারণে বুক ছাপিয়ে ওঠে উদ্বেল আনন্দ। কখনো বুক ভেঙে আসে অব্যক্ত বেদনায়। কেমন করে জানবে সে, কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে বিদায় নিয়ে গেল তার কৈশোর, হৃদয়ের কানে কানে এসে গেল যৌবনের লিপি!

দেহমনের এই রূপান্তর বিশ্বপ্রকৃতির দান। সব মেয়ের জীবনেই আসে। হেনারও এসেছিল। কিন্তু এই নিতান্ত সহজ বস্তুটি যদি কোনো বিশেষ রূপ নিয়ে থাকে তালুকদারের চোখে, তার কারণ, এই

মেয়েটির জীবনে এটা শুধু আবির্ভাব মাত্র। এল, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিণতির পথ দিয়ে তাকে সার্থকতায় নিয়ে গেল না!

মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যাওয়া অজয়ের বরাবরকার নিয়ম। ইদানীং সেটা ঘন ঘন ঘটতে লাগল। এমনি একটা দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পর একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এলে, হেনা আর চুপ করে থাকতে পারল না। চা-খাবার খাইয়ে কাপ-ডিশগুলো তুলে নিতে নিতে বলল, বড্ড যে শীগগির শীগগির ফিরলে এবার?

অজয় হাসতে লাগল, জবাব দিল না। হেনা রেগে উঠল, গা জ্বালা করে বাপু, তোমার ঐ হাসি দেখলে। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, এবার কেমন করে বেরোও।

—কেন? বুড়ী হলি, এখনো তোকে আগলে রাখতে হবে না কি?

—রক্ষে করো। আমার জন্যে যে তোমার কত দরদ, তা জানা আছে। কিন্তু বাবার কথাটাও কি একবার ভাবতে নেই?

অজয় গুছিয়ে বসে বলল, বাবার জন্যেই তো দেরি হল।

হেনা বিস্ময়ে চোখ তুলল—বাবার জন্যে!

—হ্যাঁ রে! তবে শোন, সব বলছি। আমাদের এক পিসীমা আছেন জানিস তো?

—পটুয়াখালীর পিসীমা?

—হ্যাঁ; তুই তাঁকে দেখিস নি। আমিও দেখেছি মোটে একবার, সেই ছেলেবেলায়। সেইখানে গিয়েছিলাম।

—হঠাৎ অ্যাদ্দিন পরে পিসীর কথা মনে পড়ল যে?

—মনে পড়ল কি আর সাধে? ঐ পিসীই আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা।

বলবার ধরন দেখে হেনা হেসে উঠল। অজয় তেমনি গম্ভীর সুরে বলল, তোমার তো হাসবারই কথা। ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। তখন বাবাকে আগলাবে কে?

হেনার মুখের উপর চকিতে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, কেন? তোমার বৌ।

—আমার বৌ! হো-হো করে হেসে উঠল অজয়।

—হাসলে যে? বৌ কি কোনো দিন আসবে না?

—দাঁড়া, আগে তোকে পার করি, তবে তো?

—কেন, আমি কি তোমার বৌকে জলবিছুটি দেব, যে এ আপদ বিদায় না করে নিশ্চিন্ত হতে পারছ না? বলতে বলতে গলাটা হঠাৎ ধরে গেল হেনার। চোখ দুটোও ছলছল করে উঠল। অজয় হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এই দেখো, মেয়ের অমনি ফ্যাঁচফ্যাঁচ শুরু হয়ে গেল। আরে, আমার আসল প্ল্যানটা আগে শোন।

হেনা মুখ তুলে তাকাল। অজয় বলল, পিসীমা এসে বাবার দেখাশুনার ভার নিলে আমরা দুজনেই চলে যাব কোলকাতায়।

হেনার সিক্ত চোখের পাতায় ফুটে উঠল হাসির ঝলক। উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠল, আমিও যাব, দাদা?

—যাবি না তো করবি কী? মাইনর পাশ করে বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়েছ। এবার তিন-হাত একটা ঘোমটা টেনে হাতা-বেড়ি নিয়ে কারো হেঁসেলে ঢুকলেই জীবন সার্থক হয়ে গেল! সেটি হবেক্ না, বাপু। যাকে সত্যিকার লেখাপড়া বলে, তাই শিখতে হবে। বিয়ে তোমার দিচ্ছি না এত শীগগির।

—আহা, সেই ভাবনায় যেন আমার ঘুম নেই!

আরক্ত মুখে ওইটুকু বলেই কাপ-ডিশগুলো তুলে নিয়ে লঘুপায়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

বাবার সঙ্গে মোটামুটি একটা আলোচনা হল অজয়ের। মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে চেষ্টা না করে তাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পড়াবার প্রস্তাবে সদাশিববাবুর মনে মনে সমর্থন ছিল না। কিন্তু ছেলে-মেয়ের কোনো সংকল্পে তিনি কোনো দিন বাধা দেন নি।

আজও দিলেন না। বিশেষত, অজয় যখন জানাল, একটা চাকরি সে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে এবং ওদের দুজনের সমস্ত খরচ সে-ই চালাতে পারবে, তখন বাধা দেবার কোনো যুক্তিও তিনি খুঁজে পেলেন না। স্থির হল, দু-চার দিনের মধ্যেই অজয় পটুয়াখালী গিয়ে পিসীমাকে নিয়ে আসবে, সঙ্গে আসবে তাঁর একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, রাখাল। এখানকার ইস্কুলে তার পড়বার ব্যবস্থাও অজয় ঠিক করে ফেলেছিল। তারপর কলকাতা গিয়ে চাকরি। প্রথমটা উঠতে হবে কোনো মেসে। একটা ছোটখাটো বাসা পাওয়া গেলেই নিয়ে যাবে হেনাকে। বছর তিনেক পরে সদাশিব যখন রিটায়ার করবেন, তিনিও গিয়ে থাকবেন ওদের কাছে।

অনেক দিন পরে বিকেলবেলা দাদাকে নিয়ে গঞ্জের ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল হেনা। থানা আর পোস্ট-আফিসের মাঝখানে যে জায়গাটা পড়ে আছে, তারই এক কোণে দুখানা চালাঘর তৈরি হচ্ছিল। সেদিকে দেখিয়ে বলল, ওটা কী হচ্ছে, জান দাদা?

—কী জানি! কোনো মেজো কিংবা সেজো দারোগার কুঠি হবে, হয়তো!

—বলতে পারলে না। এখানে এসে উঠবেন একজন ইন্‌টারনী।

—ইন্‌টারনী! খানিকটা কৌতূহল হল অজয়ের। তুই জানলি কী করে?

—বাঃ, সব্বাই তো জানে। সিপাইরা কবে থেকে বলে বেড়াচ্ছে, স্বদেশী বাবু আসছে। সুরমাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্বদেশী বাবু কী জিনিস। উনি বললেন, ইন্‌টারনী। আচ্ছা দাদা, ওদের স্বদেশী বাবু বলে কেন?

—তা জানিস না? গোটা কয়েক স্বদেশী পটকা ছুঁড়ে ওঁরা বিদেশী সরকার উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেন, তাই ওঁদের নাম স্বদেশী বাবু।

—তোমার তো সবই ঠাট্টা। শুধু স্বপ্ন দেখেন কেন বলছ! বিদেশী কি একটাও মরে নি ওঁদের হাতে?

—তা মরেছে। কিন্তু ঐ একটার বদলে তারা কটা মেরেছে, তার খবর রাখিস? শুধু যদি মেরে ফেলত, আমার আফশোস ছিল না। কিন্তু রোলার চালিয়ে থেতলে, ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাড়-পাঁজরা, পঙ্গু করে দিয়ে গেছে, যাকে আমরা বলি দেশের যুবশক্তি। আজ যদি ঐ সাদা চামড়াগুলো হঠাৎ তলপি-তলপা নিয়ে চলেও যায়, যে ক্ষতি রেখে গেল, তার পূরণ কোনো দিন হবে না। কী লাভ হল ঐ পটকা ছুঁড়ে বলতে পারিস?

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও, কেমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল হেনার মনে। এই যে একদল ছন্নছাড়া মানুষ, সংসারে অন্য দশ জন যা কামনা করে, সব ফেলে, কেবল মাত্র দেশকে ভালোবাসে বলেই বরণ করে নিল এমন একটা পথ, যার পদে পদে ছড়িয়ে আছে শুধু দুঃখ, দৈন্য, মৃত্যু আর লাঞ্ছনা, এদের জন্যে তার শ্রদ্ধা ছিল যতখানি, তার চেয়ে বেশী ছিল মমতা। এদের কাউকে সে কোনো দিন দেখে নি। শুধু একদিন গভীর রাত্রে সুরমাদির বাড়িতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে শুনেছিল একজনের চাপা কণ্ঠস্বর। সে রাতটি ওর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। দাদার কথায় হঠাৎ তাই মনে পড়ে গেল। একটু আঘাতও বোধ হয় লাগল ওর অন্তরের সেই কোমল স্থানটিতে। সেটা প্রকাশ না করে বলল, তুমি খালি লাভ-ক্ষতি দিয়েই ওদের বিচার করছ, দাদা। কিন্তু সেইটাই কি সব? আর কিছু নেই? ইতিহাসে পড়েছি, নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে কত লোক শত্রুর কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। হার-জিতের কথা ভেবে দেখে নি। তাদের আমরা বলি বীর। সে গৌরবটুকুও কি এদের আমরা দিতে পারি না?

বিস্মিত হল অজয়। যাকে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে জেনে এসেছে, তার মুখের এই কটি আশ্চর্য কথা শুনে শুধু নয়, তার চেয়েও বেশী, তার দুটি স্নেহসিক্ত স্বপ্নময় চোখের দিকে তাকিয়ে। সেইখানে দৃষ্টি রেখেই বলল, নিশ্চয়ই পারি। সে গৌরব তাদের অবশ্য পাওনা।

শুধু গৌরব কেন, তাদের জন্মে আমাদের গর্বেরও শেষ নেই। কিন্তু তবু বলব, মৃত্যুর মুখে লাফিয়ে পড়াটাই বীরত্ব নয়। ফলাফলের কথাটাও ভাবতে হয়। তা না হলে তার নাম হঠকারিতা। আমরা যাকে দেশপ্রেম বলি, তার মধ্যে আবেগের বন্যা যেমন আছে, তার চেয়ে বেশী চাই বুদ্ধির বাঁধ। তা যদি না থাকে, শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তার নাম প্রাণশক্তির অপচয়।

এসব কথার উত্তর দেবার মতো বিদ্যা বা বুদ্ধি হেনার অবশ্যই ছিল না। তাই সে চুপ করেই রইল। কিন্তু দাদার যুক্তিটা পুরোপুরি মেনে নিতেও তার প্রাণ সায় দিল না। প্রথম যৌবনের জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, বুদ্ধির গৌরব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু যা আমার প্রিয়, যা কিছু আমি ভালোবাসি, তার জন্মে সামনে পেছনে না তাকিয়ে নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিয়েও যে কী সুখ, দাদা তা বুঝল না।

অজয়ের কাছে তার এই একান্ত স্নেহের পাত্রী ছোট বোনটির নীরব মনের বেদনাটুকু অস্পষ্ট রইল না। সস্নেহে তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে গভীর কণ্ঠে বলল, কী জানিস, হেনা, আমি এদের ঠিক বুঝতে পারি না। মানুষের মৃত্যু যে কী করুণ, কত শোচনীয়, সেটা আমি এত দেখেছি যে মরণের কথা ভাবতেই আমার ভয় হয়। মনে হয়, থাক পড়ে আমার দেশের মুক্তি। তার জন্মে প্রাণ না দিয়ে আর না নিয়ে একটি মানুষকেও যদি বাঁচিয়ে তোলা যায়, তার চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই। তারই মধ্যে রইল আমার দেশের কল্যাণ। ওদের অনেককে আমি জানি। শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু ওদের ঐ পথে আমার প্রাণের সাড়া পেলাম না। ছেলেবেলা থেকে মানুষের রোগ-শোক দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদ-আপদের মধ্যেই জড়িয়ে পড়লাম। সেই টানেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ি। বাবার জন্মে, তোর জন্মে যতটুকু আমার করবার, করতে পারি না! সে কি আমার কম দুঃখ! মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞা করি, না, আর যাব না। তোদের নিয়েই জড়িয়ে থাকব।

হঠাৎ আবার কোত্থেকে ডাক আসে। সব ভেস্তে যায়—বলতে বলতে হেসে ফেলল অজয়। অপ্রতিভ হাসি! তার মধ্যে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুর।

দাদার অন্তরেব এই গোপন কক্ষটির খবর হেনার চেয়ে কে বেশী জানে? কিন্তু আজকার মতো এমন করে তার অর্গল কোনো দিন খুলে যায় নি। দাদার কাছে যা কিছু শোনে, সবার মধ্যেই থাকে একটা তরল স্নিগ্ধ পরিহাস। এমন গভীর সুর এই প্রথম শুনতে পেল হেনা। মনটা কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলবার কথা কিছুই খুঁজে পেল না। শুধু যে হাতখানা ছিল ওর কাঁধের উপর, তারই কটি আঙুল দু-হাতে জড়িয়ে ধরে দাদার একান্ত কাছটিতে সরে এসে দাঁড়াল।

রাতে শোবার পর চারদিকটা যখন নিঝুম হয়ে গেছে, হেনার মনের মধ্যে ফিরে এল সেই স্মরণীয় রাত। এই তো বছর খানেক আগেকার কথা। বিকেল বেলা সুরমাদি ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই পড়াশুনা আর গল্পগুজব করবার পর যখন ফেরবার সময় হল, চারদিকটা ভেঙে এল ঝড়-জল। আর থামবার নাম নেই। তার মধ্যেই এক সময়ে দুজনে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। প্রায় দশটা যখন বাজে, ঝড় থামল। কিন্তু বৃষ্টি তখনো চলছে। ছাতা আর লণ্ঠন দিয়ে চাকরের সঙ্গে হেনাকে পাঠাতে গিয়ে কী ভেবে আবার থেমে গেলেন সুরমাদি। অন্ধকার নির্জন রাস্তা। বললেন, থাক, আজ আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। শুয়ে পড়ো। তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

চাকর গেল চিঠি নিয়ে। সুরমা নিজের শোবার ঘরের ও পাশটায় তক্তপোশের উপর তার বিছানা করে দিলেন। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল হেনা। হঠাৎ মাঝরাতে কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা খোলা। ওপাশের বিছানা খালি পড়ে আছে। সুরমাদি নেই। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। কিন্তু সাড়া না দিয়ে পড়ে

রইল নিস্পন্দের মতো। বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে, হঠাৎ কানে গেল চাপা গলায় কে কথা বলছে। পুরুষ মানুষের স্বর। বলছে, ও মেয়েটি কে দিদি?

—ও আমার এক ছাত্রী। এখানকার পোস্টমাস্টারের মেয়ে।

—জেগে নেই তো?

—না; ও ঘুমুচ্ছে। কেন, জেগে থাকলই বা?

—বাপ রে! পোস্টমাস্টার মানেই সরকারের লোক। বাপকে গিয়ে বলে দিলেই হল! পুলিশ পিছু নিতে কতক্ষণ?

—ও মোটেই সে রকম মেয়ে নয়।

—তাহলেই রক্ষে।

—তা ছাড়া, এখানকার পুলিশ তো তোকে চেনে না। অত ভয় করিস কেন?

—ভয়-টয় আমরা করি না দিদি! ভাবনা শুধু কোমরে যে বস্তুটি আছে, তার জন্যে। ওরা দূর থেকেই গন্ধ পায়। একেবারে শিকারী বেড়ালের মতো।

বলে হেসে ফেলল ছেলেটি। সুরমা বললেন, এসব বিপদ মাথায় নিয়ে আসিস কেন আমার কাছে?

—বাঃ, কত দিন দেখি নি তোমায় বলো তো? সত্যি দিদি, মাঝে মাঝে বড্ড মন কেমন করে।

সুরমার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার শোনা গেল ছেলেটির কথা, চোখের জল এসে গেল তো? ঐ জন্যেই তোমাকে কিছু বলি না। এখন কান্নাকাটি রেখে ওঠো দিকিন। কিছু খেতে-টেতে দাও। সেই সকাল থেকেই আজ হরিবাসর।

সুরমা ধরাগলায় বললেন, তুই একটু বোস! চট করে দুটো চাল ফুটিয়ে দিই।

—আবার চাল ফোটাতে যাবে! তাহলেই হয়েছে। কেন, হাঁড়িতে কিছু নেই তোমার?

—আছে দুটো পান্তাভাত। চাকরটা সকালে খাবে বলে রেখেছি। সে তুই খেতে পারবি না।

—তুমিও যেমন! মোটে মা রাঁধে না, তা তপ্ত আর পান্তা! ঐ পান্তাই আমার পোলাও কালিয়া। যাও, শীগগির নিয়ে এসো। আর সময় নেই। ভোর হয়ে এল।

এর পর আর কোনো কথা শুনতে পায় নি হেনা। আলোটাও সরে গেল। সুরমা বোধ হয় রান্নাঘরে গেলেন ভাইকে নিয়ে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখনো সুরমাদির বিছানা খালি। হেনা উঠে এসে দেখল, বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে তিনি বসে আছেন। চোখ দুটো ফুলো-ফুলো। তার নিচে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। চুলগুলো উশকো-খুশকো। হেনার দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, রাত্তিরে বেশ ঘুম হয়েছিল তো? হেনা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। তারপর প্রণাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ছাত্রীর সুনিদ্রার খবর নিলেন সুরমাদি। কিন্তু একটি নিদ্রাহীন রাত্রির করুণ ইতিহাস যে ঐ মেয়েটি নিঃশব্দে বয়ে নিয়ে গেল তার নিভৃত অন্তরের মধ্যে, সে খবর তিনি কোনো দিন জানতে পারেন নি।

পিসীমাকে আনতে যাবার দিন এসে গেল। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি করে ডাল ভাত আর একটা তরকারি নামিয়ে দিল হেনা। তারই এক ফাঁকে দাদার ব্যাগে তার দুটো কাপড়-জামাও গুছিয়ে রেখে এল। খেয়ে-দেয়ে যাবার উদ্যোগ করছে অজয়, ঠিক এমন সময়ে দুজন বন্ধু এসে হাজির। কয়েক মিনিট কী সব কথাবার্তা হল তাদের সঙ্গে। তার পর হেনাকে ডেকে বলল, হঠাৎ একটা অন্য কাজ পড়ে গেল। এখনি বেরোতে হচ্ছে! বাবাকে বলিস, তিন-চার দিন পরে ফিরব।—বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের সঙ্গে।

তিন-চার দিনের পর আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। এরকম কত বার গেছে অজয়। বলেও যায় নি কবে ফিরবে। যদি বা বলে গেছে, সে কথা রাখতে পারে নি। তবু, তেমন কিছু ভাবনা হয় নি হেনার। এবার তার মনে পড়ল দুশ্চিন্তার ছায়া। বাবাও একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কিছু খবর দিয়ে গেছে কি না। সকাল হলেই হেনার কেমন যেন মনে হয়, আজ দাদা আসবে। দুপুরবেলা তার চাল নেয় না। যখনই আসুক, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বেশী রাত্রে এসে বোনকে কিছুতেই রাঁধতে দেবে না। তাই সন্ধ্যাবেলা ভাত চড়াতে গিয়ে দাদার চালটাও নিতে হয়। সকালে সেটা বিলিয়ে দেয়, কিংবা নিজেই খেয়ে নেয়। এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না, তখন এল চিঠি।

মাইল দশেক উজানে অনেকটা জায়গা নিয়ে শুরু হয়েছিল আড়িয়ালখাঁর ভাঙন। গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে চলেছে সর্বনাশী। মানুষের অন্ন সংগ্রহের মাটিটুকু কেড়ে নিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয় নি, নিঃশেষে ভেঙে দিচ্ছিল তার মাথা গুঁজবার ঠাঁই। প্রলয়ঙ্করী নদীর অন্ধ আক্রোশ থেকে বাঁচবার জন্যে যথাসর্বস্ব নিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে পালিয়ে যাচ্ছে অসহায় মাটির জীব। সেখানেও অন্ন নেই, মাথার উপর নেই এতটুকু আচ্ছাদন। সুযোগ বুঝে মহা উল্লাসে ছুটে এসেছে ব্যাধির পাল। চারদিকে শুরু হয়েছে মৃত্যুর তাণ্ডব।

সরকারী তদন্ত তখনো শেষ হয় নি। তথ্য-সংগ্রহের তোড়জোড় চলছে। মাল-মসলা যোগাড় হলে চোস্ত ইংরেজিতে তৈরি হবে পাকা হাতের রিপোর্ট। উচ্চ থেকে উচ্চতর মহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চলবে তার বিচার বিশ্লেষণ। তারপর হয়তো মঞ্জুর হবে কিঞ্চিৎ সাহায্য। ইতিমধ্যে সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে গোটাকয়েক ছেঁড়া তাঁবু আর কিছু বাঁশ দড়ি চাটাই সংগ্রহ করে এরই কোনোখানে অজয় গড়ে তুলেছিল তার রিলিফ ক্যাম্প। সম্বলের মধ্যে ছিল, দূর শহর থেকে ভিক্ষা করে আনা কয়েক বস্তা চাল আর কিছু পুরনো

কাপড়। অর্থবলের অভাব বাহুবল দিয়ে যতটা পূরণ করা যায়, এই ক্ষুদ্র দলটির তা-ই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

নদী এগিয়ে আসছে। খানিকটা দূরে থাকতেই, ঘর-দুয়ার ভেঙে মালপত্র গোরুবাছুর গুছিয়ে নিয়ে সরে যেতে হবে। সেইখানে হল ওদের প্রথম প্রয়োজন। ঠিক সময়টিতে না এলেই একটা সম্পন্ন গৃহস্থ রাতারাতি ফকির হয়ে যাবে। একদিন সন্ধ্যার মুখে এমনি একটা ঘর খালি করে জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছিল অজয় আর তার দুজন সঙ্গী। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কয়েক গজ তফাতে গর্জন করছে আড়িয়ালখাঁ। পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে তার গৈরিক স্রোত। একবার চোখ পড়লে, মাথা ঘুরে যায়। যেখানটায় ওরা কাজ করছিল তার পাশেই ফাটল। যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়বে বিশাল মাটির চাপ। কোথায় তলিয়ে যাবে, চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাবে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ওরা ফাটলের এপারে এসে দাঁড়াল। বছর দেড়েকের একটি ঘুমন্ত শিশু কোলে করে দাঁড়িয়ে ছিল ঐ বাড়ির একটি মেয়ে। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, ওমা, আমার খোকনের ঘোড়াটা তো আনা হয় নি! ঐ যে পড়ে আছে বারান্দার কোণে। বলে দু পা এগিয়ে গেল।

থাম্! খেঁকিয়ে উঠলেন তার বাবা। ঘোড়া না হাতি! সর্বস্ব গেল। গুষ্ঠিসুদ্ধ কোথায় দাঁড়াবে, কী গিলবে তার ঠিক নেই, উনি ওঁর ছেলের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। অজয়ের দিকে চেয়ে বললেন ভদ্রলোক, চলো ভাই কোথায় যেতে হবে।

ধমক খেয়ে নিরস্ত হল মেয়েটি। আস্তে আস্তে যেন আপন মনে বলল, আহা, ঘুম ভেঙে বড্ড কাঁদবে ঘোড়াটা না দেখলে। কথাটা অজয়ের কানে গেল। চোখে চোখ পড়তেই দেখল, ওরই দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। একেবারে ছেলেমানুষ। বোধ হয় মা হয়েছে এই প্রথম। কী মনে হল অজয়ের। বলল, দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি খোকনের ঘোড়া। সকলে না না করে উঠল।

ওর সঙ্গীরাও চেঁচিয়ে উঠল, যাবেন না অজয়দা। অজয় শুনল না। বারান্দায় পৌঁছে ঘোড়াটা তুলতে যাবে, হঠাৎ প্রলয় শব্দে শিউরে উঠল অতগুলো মেয়েপুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পিছিয়ে গেল কয়েক হাত। পরমুহূর্তে দেখা গেল, কোথাও কিছু নেই। শুধু পায়ের নিচে উন্মত্ত আবেগে মাথা খুঁড়ে চলেছে আড়িয়ালখাঁ।

চার লাইনের চিঠি। এত সব কথা তাতে ছিল না। ছিল শুধু আসল খবরটুকু। অজয়ের বন্ধু গোবিন্দই সেটা জানিয়েছিল, বাকীটুকুও তার মুখ থেকে শোনা। অনেক দিন পরে আর-একটা কথা বলেছিল গোবিন্দ, সেই মেয়েটি তোমারই বয়সী হবে। দেখতেও খানিকটা যেন তোমার মতো।

তার পর কত দিন কেটে গেছে। আজও কোনো কোনো দিন গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনে পড়ে যায় গোবিন্দর সেই শেষের কথাটা। সমস্ত বুকখানা যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে। সমস্ত যুক্তিতর্ক ছাপিয়ে কেবলই মনে হতে থাকে, দাদার এই অপঘাত মৃত্যুর সমস্ত দায়িত্ব যেন তারই। ছোট বোনটাকে এত ভালো যদি না বাসত, হয়তো এমন করে নিজেকে বিসর্জন দিত না।

চিঠিখানা এসেছিল সদাশিববাবুর নামে। পড়ে, নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে তুলে দিলেন হেনার হাতে। তার পর শম্ভুকে ডেকে অন্য দিনের মতোই তামাক দিতে বললেন। হেনা প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে নি। বাজপড়া মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তার পর কখন ভেঙে পড়েছিল বাবার কোলের উপর, তার ঠিক মনে নেই। সদাশিববাবু একটি কথাও বলেন নি, এক ফোঁটা জলও পড়ে নি তাঁর চোখ থেকে। বাঁ হাতে ছিল গড়গড়ার নল। কম্পিত ডান হাতখানা মেয়ের মাথার উপর রেখে একটানা তামাক টেনে চলেছিলেন।

অজয়ের মৃত্যুর পর ছ-সাত মাস চলে গেছে। পিসীমার আর আসা হয় নি। এসেছে শুধু রাখাল। এখানকার হাইস্কুলে ভর্তি

হয়েছে। সেই ব্যবস্থাই করে গিয়েছিল অজয়। ছেলেমানুষ। আলাদা ঘরে একা শুতে ভয় পায়। তাই হেনা তার পার্টিশন-করা কামরাটুকু ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজে চলে এসেছে দাদার ঘরে। অজয়ের লাইব্রেরি তেমনি আছে। তেমনি সাজানো আছে তার নিত্য ব্যবহারের দু-চারটি ছোটখাট জিনিস। বস্তু হিসাবে অতি সাধারণ; কিন্তু হেনার কাছে তারা অমূল্য। সব কটা জিনিস নিজের আঁচল দিয়ে ঝেড়ে-মুছে আবার ঠিক জায়গায় সযত্নে গুছিয়ে রাখা তার দৈনন্দিন কাজ। সংসারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী সময়টা এইখানেই সে কাটিয়ে দেয়। বন্ধু-বান্ধব বড়-একটা কোনো দিনই ছিল না। আজ একেবারেই নেই। কখনো-সখনো সুরমাদি যখন ডেকে পাঠান, শম্ভু কিংবা রাখালকে সঙ্গে নিয়ে দু দণ্ড কাটিয়ে আসে। ওইটুকু বাদ দিলে তার প্রায় সর্ব সময়ের সঙ্গী দাদার বইগুলো।

কদিন ধরে শম্ভুর অসুখ। সব কাজ পড়েছে হেনার একার হাতে। বাবার সকালের খাবারটুকু ঠিক সময়ে করে উঠতে পারে নি। শম্ভু না থাকায় ওঁকেও সকাল সকাল যেতে হয়েছে আফিস-ঘরে। একটু বেলা হলে চা আর ডিশে খানিকটা হালুয়া নিয়ে বাবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। সদাশিব লিখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, এসব আবার এখানে কেন নিয়ে এলি, বল তো? ডাকলেই গিয়ে খেয়ে আসতাম।

—হুঁ; তা যেতে বৈ কি? আটটায় ডাকলে দশটায় যাবার সময় হত।

—কী করব মা? আগের মতো আর খাটতে পারি না।

আগে আগে এ-সব কথা যখনই বলতেন সদাশিব, হেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, কী দরকার তোমার বুড়ো বয়সে এত খাটনির? পেনশন নিয়ে নাও। দাদা আছে কী করতে। তিনটে তো মোটে মানুষ। আজ আর সে কথা বলবার মুখ রাখেন নি ভগবান। তাই বাবার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তার শীর্ণ ক্লান্ত মুখখানার দিকে

তাকিয়ে রইল। মেয়ের কাছে অশক্তদেহের দুর্বলতা প্রকাশ করে সদাশিবও যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, শম্ভুটা সেরে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও কেমন আছে দেখলি?

—আজ আর জ্বর আসে নি। কাল ভাত দেব, ভাবছি।

—তাই দিস। তুই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি! এইখানে রেখে যা। হাতের কাজটা সারা হলেই খেয়ে নেব।

হেনা মাথা নেড়ে বলল, না; তা হবে না। ততক্ষণে সব ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে। আগে খেয়ে নিয়ে যা করবার করো। বলে থালাটা এগিয়ে দিল বাবার সামনে।

—আসতে পারি?

চমকে উঠল হেনা। অপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠ। জানালার ওপারে দৃষ্টি পড়তেই তার সমস্ত বুকখানা কেঁপে উঠল শুধু বিস্ময়ে নয়, তার সঙ্গে জড়ানো কিসের একটা ভয়ে। সাধারণ চেহারার ভদ্রবেশী যুবক। কিন্তু কী আশ্চর্য দুটি চোখ! যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি উজ্জ্বল। মনে হল ওরা শুধু বাইরেটা দেখেই থেমে যায় না, মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে জেনে নেয়, কী আছে তোমার অন্তরের অন্তরালে। নিমেষমাত্র চোখোচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেনা চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। বাইরে গিয়েও অনুভব করল সার্চ-লাইটের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ঐ চোখ দুটো যেন সেখানেও তাকে অনুসরণ করছে।

সদাশিব চায়ে চুমুক দিয়েছিলেন। কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, কে?

—আমি বিকাশ।

—ও, আপনি? আসুন, আসুন।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন সদাশিববাবু। ফিরে আসতে আসতে বললেন, সেদিন দারোগা সাহেবের বাড়িতে আলাপ হবার পর থেকে রোজই ভাবি আপনার ওখানে যাব। তা আর হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া বলতে কি, ঠিক সাহসও হয় নি। কী জানি কর্তারা আবার—

—সে আশঙ্কা আছে বৈ কি? আমার পক্ষেও এটা রীতিমত দুঃসাহস। তবে আজকের মতো দারোগা সাহেবের অনুমতি নিয়েই এসেছি।

পাশের চেয়ারটায় বিকাশকে বসিয়ে সদাশিব বললেন, একটু চা আনতে বলি?

—শুধু চা নয়, যদি আপত্তি না থাকে, তার সঙ্গে কিছু খাবার। আপনার ঐ হালুয়া দেখে আমাব লোভ হচ্ছে। বলে, হেসে উঠল বিকাশ।

সদাশিব স্মিতমুখে বললেন, বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের? ওরে, রাখাল—

রাখাল আসতেই বললেন, তোর দিদিকে বলে এক ডিশ হালুয়া আর চা নিয়ে আয়।

'দিদি' নিজেই সব শুনতে পেল। আগন্তুকের সম্বন্ধে গভীর বিস্ময় এবং তীব্র কৌতূহল নিয়ে সে ঘরের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

বিকাশ বলল, আমার প্রস্তাব শুনে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে গেছেন। গৃহস্বামী খাবার জন্যে অনুরোধ করবেন, আব অতিথি 'না' 'না' করতে থাকবে, ভদ্র-সমাজে এইটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমরা যে সমাজের বাইরে। তা ছাড়া 'খাবার' জিনিসটা আমাদের জীবনে এত অনিশ্চিত যে, হাতের কাছে ভালো কিছু পেলে অবহেলা করতে পারি না। এইটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—বলে, আরেক বার হেসে উঠল বিকাশ।

সদাশিব সে হাসিতে যোগ দিলেন না। কথাগুলো হালকা সুরে বললেও তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। বললেন, আপনার চাকর রাঁধে কেমন?

—দেখুন, ওটা ঠিক বলতে পারব না। খাদ্যটা শুধু পেট ভরাবার জন্যে, এই কথাই এত দিন জেনে এসেছি। তার ভালো-মন্দ বিচার করবার দরকার হয় নি। সে ক্ষমতাও বোধ হয় নেই।

রাখাল হালুয়া আর চায়ের কাপ রেখে গিয়েছিল। ডিশ থেকে খানিকটা মুখে পুরে বলল, কিন্তু এ বস্তুটি যে চমৎকার সেটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

চেঁছে মুছে সব হালুয়াটুকু নিঃশেষ করবার পর চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বলল, এসব কে করেছেন, জানতে পারি?

—আমার মেয়ে হেনা। ও ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সদাশিব। সে জন্যে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, বিকাশবাবু! সবই রাধামাধবের ইচ্ছা।

বিকাশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর স্বরে বলল, আমি কিছু কিছু শুনেছি, মাস্টারমশাই! বৈষ্ণব-সাহিত্যে আপনার অনুরাগ এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আপনার অধিকার, তাও আমার কানে এসেছে।

সদাশিব কুণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। প্রতিবাদে একটা কী বলতেও গেলেন। সেদিকে লক্ষ্য না করে বিকাশ বলে চলল, আমার মনে হয়, কতগুলো দিকে বঞ্চিত করলেও, এদিক দিয়ে ভগবান আপনাকে করুণাই করেছেন। জীবনের একটা বড় সম্পদ আপনি অনায়াসে পেয়ে গেছেন। আপনার কাছ থেকে আমিও কিছু আশা করি। অনুমতি করেন তো মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব।

স্বল্পভাষী সদাশিব আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিনয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। বিকাশ বলল, আপাতত মিস মিত্রকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। তাঁর হাতের খাবারটুকু পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে গেলাম, এবং এরই লোভে ভবিষ্যতে উৎপীড়ন করবার সম্ভাবনা রইল।

—বিলক্ষণ! ওর সম্বন্ধে অত সঙ্কোচ করে কথা বলছেন কেন? নেহাত ছেলেমানুষ। এই তো এখানেই ছিল, আপনি যখন এলেন। দেখলেই বুঝতেন। ওরে, ও রাখাল, তোর দিদিকে একবার ডেকে দে তো।

ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনে যাচ্ছিল হেনা। বাবার

ডাক শুনে আবার নতুন করে দেখা দিল তার বুকের কম্পন। এ কিসের ভয় সে জানে না। কিন্তু এটুকু জানে, এই অবস্থায় নিজেকে টেনে নিয়ে ওর ঐ চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব। না, না; তা সে পারবে না। মামা ডাকছেন শুনে রাখাল যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ও চলে গেছে নিজের ঘরে। সেখান থেকে গামছা-কাপড় নিয়ে কুয়োতলার দিকে যেতে যেতে বলল, বাবাকে বলিস, দিদি নাইতে গেছে।

অন্তরীণ বিকাশ ঘোষের উপর সরকারী আদেশ ছিল, মাঠঘাট গাছপালা যত খুশি দেখ, লোক চলাচল দেখতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই। অল্পসল্প ঘোরাফেরা, তাও মঞ্জুর। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ চলবে না। জেলে যত দিন ছিল বিকাশ, চারদিকের ঐ উঁচু পাঁচিলটাকেই মনে করত এক অসহনীয় বাধা! শত ইচ্ছা হলেও নিমেষের জন্যে একবার শুধু বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না, এই অসহায় অনুভূতি মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণার মতো মনটাকে অস্থির করে তুলত। আজকার এই যন্ত্রণা বুঝি আরো বড়। চারদিকে জনস্রোত। তারই মধ্যে ঘুরছি ফিরছি, কতজনের সঙ্গে চোখোচোখি হচ্ছে কত বার। উভয় তরফেই সাগ্রহ কৌতূহল। তবু, এগিয়ে গিয়ে কারও হাত ধরে বলবার উপায় নেই, কেমন আছ? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ এবং সনাতন সম্পর্ক, তার প্রথম সূত্র হল বাক্য। সেটাকে নির্মম ভাবে ছিন্ন করে দিয়েছে যে বিধান, তার চেয়ে কঠোরতর পীড়ন-যন্ত্র বোধ হয় আর আবিষ্কৃত হয় নি। নিজের ঘরের জানালায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ভারী কৌতুক লাগত তার। মনে পড়ত অনেক দিন আগে পড়া কোন ইংরেজ কবির দুটি লাইন—

'Water, water everywhere
Not a drop to drink.

এই সামান্য ছুটি ছত্রের অসামান্য গভীর তাৎপর্য যেন এতদিনে ধরা পড়ল তার মনের কাছে। চার দিকে শুধু জল আর জল। কিন্তু তোমার কণ্ঠের তীব্র পিপাসা মেটাবার জন্যে তার একটি ফোঁটাও পাবে না।

সরকারী আদেশের প্রথম দফা হল—রোজ ছুবেলা থানায় গিয়ে হাজিরা দেওয়া। দারোগা হোসেন সাহেবের সঙ্গে ছুটো মামুলি কথা, তারই জন্যে যেন ছটফট করত মনটা। সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কেমন লাগছে জায়গাটা ?

বিকাশ হেসে বলল, তা মন্দ বলেন নি। আপনার ঐ মুরগি-গুলোকে বরং জিজ্ঞেস করবেন, কেমন লাগছে খাঁচাটা ?

—কেন, সকালে বিকালে খানিকটা বেড়াবার অর্ডার তো আপনার আছে। আমার সিপাই সাহেবরা বুঝি মেহেরবানি করে যাচ্ছেন না। আচ্ছা, দাঁড়ান তো—

—না, না ; ওরা ঠিক যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল বিকাশ।

—তবে ? ও, বুঝেছি। আপনাকে কী বলব ? এই আমার কথা ধরুন। সাত দিন খেতে না দেন বিবিসায়েব, কিছু আসে যায় না। কিন্তু হঠাৎ যদি হুকুম করে বসেন, এক ঘণ্টা স্পিক্‌টি নট, আমি মশাই, পাগল হয়ে যাব। হয়তো ঐ আড়িয়ালখাঁর জলে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

বিকাশ হাসতে লাগল। দারোগা সাহেব বললেন, তা এক কাজ করুন। এখানে আমরা সরকারী মানুষ যে কজন আছি, এই যেমন ডাক্তারবাবু, পোস্টমাস্টারবাবু, সাবরেজিস্ট্রার, হেডমাস্টার, এঁদের ওখানে যান না মাঝে মাঝে ? ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কথা-টথা না বললেই হল। আর ঐ মেয়ে-ইস্কুলের সর্দারনী সুরমা সেন। সর্বনাশ ! ওমুখো যেন কোনোদিন হবেন না। মোট কথা চাকরিটি আমার নট্ না হয়, এইটুকু বুঝে-সুঝে চলবেন, স্যর !

তারপর থেকে এই বাড়িগুলোয় একবার করে ঢুঁ মেরে দেখেছিল

বিকাশ। কিন্তু বিশেষ সাড়া পায় নি। সবাই ছাপোষা লোক। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন। কারো কারো বাড়িতে যুবক ছেলে, কারো বা বয়স্থা মেয়ে। ইন্টারনীর আনাগোনা কখন কী বিপদ ডেকে আনে, এই ভয়ে সবাই আড়ষ্ট। প্রথম দর্শনেই সেটা বুঝতে পেরে আর যায় নি। শুধু একটি জায়গায় তাকে ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল—সদাশিববাবুর বৈঠকখানা অর্থাৎ ডাকঘর। মাঝে মাঝে তার পিছন দিকে, তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায়। কথাবার্তার বিষয় ছিল বৈষ্ণব-সাহিত্য। সদাশিব বক্তা আর বিকাশ শ্রোতা। কখনো কখনো বিষয়-তালিকায় দেখা দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন বক্তার আসন নিত বিকাশ এবং শ্রোতার আসনে বসতেন সকন্যা সদাশিব। হেনার আর-একটি কাজ ছিল। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চা-সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে তার নিজের হাতের তৈরী কোনো খাবার।

স্বল্পভাষী সদাশিব হঠাৎ এমন মুখর হয়ে উঠবেন, সেটা বোধ হয় কোনো দিন কারো কল্পনায় আসে নি। সবাই দেখেছে, সারা জীবন তিনি শুধু সংগ্রহ করে গেছেন। তাঁরও যে কিছু দেবার আছে কে জানত? তাঁর নিজের মেয়েও কোনো দিন সে কথা ভেবে দেখে নি। যে মানুষটির স্পর্শে বাবার ভিতরে এই নতুন মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হল, তার উপরে হেনার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। নিজের পুত্র-কন্যা অত কাছে থেকেও যাঁর নাগাল পায় নি, জীবনের সায়াহ্নবেলায় একটি অনাত্মীয়, অপরিচিত বিপ্লবীর হাতে তিনি কত সহজে ধরা দিলেন, এর চেয়ে বিস্ময় আর কী আছে! কিন্তু পিতা যেখানে অনায়াসে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, কন্যা সেখানে নিজেকে মেলে ধরতে পারল না। এখনো সেই চোখের দিকে চাইলে তার বুক কেঁপে ওঠে। আজও জানে না, সেটা কিসের ভয়। প্রাণপণে তাকে চেপে রেখে সহজ হবার চেষ্টা করে। তবু অন্তরের কোন কোণ থেকে জেগে ওঠে দুরু-দুরু কম্পন।

সেদিন সদাশিব গোবিন্দদাসের একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। এমন সময় রেকাবিতে নতুন একটা কী মিষ্টান্ন নিয়ে হেনা এসে দাঁড়াল। পদটি শেষ করে সদাশিব বললেন, আজকার মতো এইখানেই থাক। এবার আমার হেনা-মায়ের মিষ্ট রস পরিবেশনের পালা।

হেনা প্রতিবাদ করল, বাঃ, তা কেন হবে? দুটো বুঝি একসঙ্গে চলতে পারে না?

—না, তা পারে না, উত্তর দিল বিকাশ। একসঙ্গে চললে সব ঘুলিয়ে যাবে। কোনটা বেশী মিষ্টি বুঝতে পারব না।

—আচ্ছা পেটুক তো আপনি?

—ওটা কিন্তু নিন্দা নয়, প্রশংসা। আমাদের মতো পেটুক আছে বলেই মেয়েদের এত দাম। তা না হলে কী করতে তোমরা?

—কেন? আপনাদের পেটের দাবি মেটানোই বুঝি আমাদের কাজ? তা ছাড়া আর কিছু করবার নেই?

হেনার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ উষ্মার আভাস পেয়ে সদাশিব হেসে ফেললেন, সেটা কি কম কাজ হল রে পাগলী? তোরা যে অন্নপূর্ণা, যাঁর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবাদিদেব। সুজাতার অন্ন না পেলে সিদ্ধার্থ কোনোদিন বুদ্ধদেব হতে পারতেন না।

হঠাৎ শম্ভুর আবির্ভাব হতেই সদাশিব উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন, আচ্ছা, তোমরা কথা কও। আমি অফিস-ঘরটা ঘুরে আসি। রাধামাধব!

সেই সনাতন নারী-বন্দনা। এই জাতীয় স্তুতিবাদ শুনেই যে-সব মেয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে, হেনাকে ঠিক সে-দলে ফেলা যায় না। তবু, এ-সব নিয়ে সত্যি সত্যি তর্ক করবার মতো কোনো ইচ্ছাও তার ছিল না। তাই বিকাশের দিকে ফিরে হালকা সুরেই বলল, আপনিও কি বাবার সঙ্গে একমত? মানে, মেয়েরা শুধু হেঁসেল আগলে থাকবে, আর কোনো কাজেরই তারা যোগ্য নয়?

এর উত্তরে বিকাশের কাছ থেকেও একটা হালকা ধরনের পরিহাসই আশা করেছিল। কিন্তু অবাক হয়ে গেল তার মুখের দিকে চেয়ে। এতখানি গম্ভীর হতে তাকে কখনো দেখা যায় নি। খানিকক্ষণ সুমুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল বিকাশ, পাঁচ বছর আগে হলেও আমি তোমার মতে সায় দিতাম, হেনা! মহা উৎসাহে বলতাম, কে বললে, মেয়েরা শুধু ঘর আগলে পড়ে থাকবে? বাইরেও তাদের চাই। জীবন-সংগ্রামের প্রতি ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সতীর্থ। শুধু মত কেন, এই আদর্শ নিয়েই আমরা কাজ করে এসেছি। সাধারণ গৃহস্থঘরের এমন কত মেয়েকে আমাদের এই রক্তের পথে টেনে নামিয়েছি, যারা একদিন বিয়ে-থা করে আদর্শ গৃহিণী হতে পারত। কতজনকে আমি এই হাতে পিস্তল ছুঁড়তে শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, কী করে সে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে হয় মানুষের বুকে। তার পরীক্ষাও তারা দিয়েছে। এতটুকু বুক কাঁপে নি, এতটুকু হাত টলে নি। দয়া নেই, করুণা নেই; নির্মম কঠোর। গর্ব করে বলেছি, আমাদের শাস্ত্রে নারীকে যে 'শক্তি' বলে, এই হচ্ছে তার রূপ। এই তার পরিচয়। নারীত্ব মানে কোমলতা নয়। কোমলতার আর-এক নাম দুর্বলতা, তারপর—

এই পর্যন্ত এসে একবার হেনার দিকে চোখ ফেরাল বিকাশ। দেখল, সে নীরবে কিন্তু প্রদীপ্ত আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার শুরু করল, তারপর, একদিন এমন একটি মেয়ে দেখলাম, যার রূপ একেবারে আলাদা।

—আপনাদের পার্টির মেয়ে? প্রশ্ন করল হেনা।

—না, পার্টির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

—তবে?

—সেই কথাই বলব। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল যে।

হেনা বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, একটু বসুন, আমি আসছি।

যেখানটায় বসে ওরা কথা বলছিল, তার খানিকটা দূরে উঠোনের কোণে ছিল একটা তুলসী-মঞ্চ। বেদিটা পরিপাটি করে গোবর দিয়ে নিকানো। হেনা ঘরে গিয়ে চট করে কাপড়খানা বদলে ফেলল। তারপর ভাঁড়ার-ঘর থেকে একটা মাটির প্রদীপ জেলে হাতের আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে গেল তুলসী-তলায়। বেদির উপর রেখে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল তার নিচে। তারপর ফিরে এসে বসল আবার নিজের জায়গায়। বিকাশের দিকে চেয়ে বলল, বলুন এবার—

বিকাশের একাগ্র দৃষ্টি এতক্ষণ তাকে অনুসরণ করে ফিরছিল। এবার তার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলল, ভারি ভালো লাগল তোমার ঐ তুলসী-প্রণাম।

—ভালো লাগল! বিস্ময় প্রকাশ করল হেনা, কিন্তু আপনার তো এসব ভালো লাগা উচিত নয়।

—তা বটে! কোনটা যে কখন কার উচিত, আর কোনটা উচিত নয়, সে কথা যদি আগে জানা যেত! যাক সে সব। যা বলছিলাম শোনো—

যথেষ্ট হাতিয়ার-পত্তর না থাকায় আমাদের কাজের বড্ড অসুবিধা হচ্ছিল। এমন সময়ে মফস্বলের কোনো এক রাজবাড়িতে বেশ কিছু মালের খোঁজ পাওয়া গেল। গোটাচারেক রাইফেল, দুটো রিভলভার, আর দোনলা বন্দুক, তাও সাত-আটটা। জিনিসগুলো রয়েছেও একটা ঘরে। দেখবার বিশেষ কেউ নেই। ভৃত্য নিত্য ধুলো ঝাড়ে,—এই পর্যন্ত। এক বুড়ো দারোয়ান ফটক আগলায়, সেও দেখতে নেহাত তুলসীদাস-মার্কা পণ্ডিতজী। কিন্তু সময় কালে দেখা গেল, লোকটা রীতিমত বেরসিক। কাজ সেরে বেরোবার মুখে গুলি চালিয়ে বসল। আমরাও জবাব দিলাম। ফল—ওদের একজন খতম, আমাদের একজন জখম। তাকে ঘাড়ে তুলতে হল। মাইল খানেকের মধ্যে থানা। জন দুই দারোগা দলবল নিয়ে ছুটে

এল। তার আগেই আমাদের দল এবং মাল দুই-ই নিরাপদে নৌকোয় পৌঁছে গেছে। বোঝা নিয়ে পড়ে রইলাম শুধু আমি। ভাগ্যিস একটা জঙ্গল ছিল কাছাকাছি। তাও বিশেষ ঘন নয়। ঢুকে পড়লাম তারই মধ্যে। আশেপাশে গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বন্ধুর জ্ঞান নেই, গতরটাও বেশ ভারী। তবু ছুটতে হচ্ছে। যে মুহূর্তগুলো আসছে, বুঝতে পারছি, তার যে-কোনোটাই হবে আমার শেষ মুহূর্ত। হঠাৎ ঠিক কানের কাছে দুম করে ফেটে পড়ল রাইফেলের গুলি। মনে হল মাথাটাই বুঝি উড়ে গেল। মিনিট খানেক পরে দেখলাম, সেটা আমার মাথা নয়, আমার বন্ধুর মাথা। আর বয়ে নিয়ে কী লাভ? রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে নামিয়ে দিলাম। শেষ বারের মতো একবার তাকাতে চেষ্টা করলাম তার মুখের দিকে। অন্ধকারে কিছু ঠাহর হল না। সেই মুহূর্তে গর্জে উঠল ভাঙা গলা—'হ্যাণ্ডস আপ'। দু দিকে দুই যমদূত। একজনের হাতে রাইফেল, আর একজনের রিভলভার।

রাত্রের মতো আশ্রয় পেলাম থানার হাজতে। দুর্গন্ধ স্যাঁতসেঁতে ঘর। বিছানার ব্যবস্থাও ছিল। কোণেব দিকে গোটানো একটা ছেঁড়া কম্বল। সেদিকে আর লোভ করলাম না। চিত হয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ভারী আরাম লাগল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

—দিব্যি নাক ডাকিয়ে, কী বলেন? ব্যথা-তিক্ত সুরে বলে উঠল হেনা।

—তা ডেকেছিল নিশ্চয়ই, তবে আমি শুনতে পাই নি।

হেনা আর কিছু বলল না। তার মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে শুরু করল বিকাশ—

ঘুমের মধ্যেই মনে হল কে যেন ঠেলছে। চোখ মেলে দেখি কালোমতো একটা লোক। দরজা খোলা। একটু একটু জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মেঝের ওপর। লোকটা চাপা গলায় ফিসফিস করে

বলল, উঠে আসুন। প্রথমটায় মনে হল স্বপ্ন দেখছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এবার সে আমার হাত ধরে তোলবার চেষ্টা করল। তাড়া দিয়ে বলল, কী করছেন! উঠে পড়ুন। কলের পুতুলের মতো উঠে এলাম। বাইরে এসে কোনো রকম শব্দ না করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে একটা ইশারা করে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। নবকুমারের মতো আমিও তার পেছু নিলাম। খানিকটা এসে বলল, দাঁড়ান, চাবিটা দিয়ে আসি। বলেই, এগিয়ে গেল একটা বাড়ির পেছন দিকে। দেখলাম, কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন খোলা জানালায়। হাতে একটা হারিকেন। তারই অস্পষ্ট আলোয় বোঝা গেল, স্ত্রীলোক। চাবিটা ওর হাত থেকে নিয়ে আলোটা তুলে ধরলেন, এবং আমার দিকে চেয়ে ডান হাতখানা নাড়তে লাগলেন। চলে যাবার ইঙ্গিত। লোকটা কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, কে উনি?

—চলুন, পরে বলছি, বলে জোর পায়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে। চলতে চলতে আমি একবার পেছন ফিরে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ব্যস্ত হয়ে আরো ঘন ঘন হাত নাড়তে লাগলেন। হারিকেনের মৃদু আলোয় মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। সেখানে কী ছিল জানি না। কে তিনি, যে তাঁর কেউ নয়, কোনো দিন যাকে চোখের দেখাও দেখেন নি, তার জন্যে কেন তাঁর এই ব্যাকুল উদ্বেগ, তাও ভেবে দেখবার সুযোগ পাই নি। সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়েছিল মাকে, সেই কোন ছেলেবেলায় যাঁকে হারিয়ে এসেছি, তার পর একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। আর মনে পড়েছিল অনেক দিন আগে পড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা, 'কল্যাণী'। কবিতাটা বোধ হয় এইরকম কাউকে দেখেই লিখেছিলেন কবিগুরু। মহাকবির সঙ্গে মনে মনে আবৃত্তি করলাম তার শেষ দুটি ছত্র—সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান, আছে তোমার তরে।

অন্ধকার ঘাটে ছোট্ট একখানা ডিঙি-নৌকা অপেক্ষা করছিল।

উঠে বসতেই আমার সঙ্গী প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে দিল। খানিকটা যাবার পর আমার সেই আগের প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে, বললে না তো?

—দারোগাবাবুর পরিবার।

শুনে শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার কথা আর মনে রইল না। মাঝি নিজেই বলে গেল অনেক কথা। এক সময়ে সে ঐ দারোগাবাবুর বাড়িতেই কাজ করত। বছরখানেক আগে বানে যখন তার ঘর-বাড়ি ভেসে যায়, ঐ মাঠানের দয়াতেই কোনো রকমে বেঁচে ছিল ছেলেপিলে নিয়ে। মাঠানের জন্যে ও প্রাণ দিতে পারে। আজ রাতে একজন 'স্বদেশী' ডাকাত ধরা পড়েছে শুনতে পেয়ে তিনি ওকে ডাকিয়ে আনেন। ও সব খোঁজ খবর যোগাড় করে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল কাঠ-ঘুঁটের ঘরে। তারপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে মাঠান দারোগাবাবুর বালিশের তলা থেকে চাবি বের করে ওর হাতে দিয়ে হুকুম করলেন, "বাবু যেখানে যেতে চায়, পৌঁছে দিয়ে তবে তোর ছুটি।" খানিকটা নিঃশব্দে বৈঠা চালিয়ে আবার বলল মাঝি, আপনি তো বেঁচে গেলেন, বাবু! মাঠানের কপালে কী আছে কে জানে?

আমি চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—দারোগাবাবু মানুষটা বড় গোঁয়ার। তারপর মদ-টদ খায়। সেবার এক স্বদেশীবাবুর জন্যে হাজতঘরে খাবার পাঠিয়েছিলেন মাঠান। জানতে পেরে কী মারটাই না মারল! আমার নিজের চক্ষে দেখা।

মনে আছে, আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, নৌকো ফেরাও। মাঝি কথাটা কানে তুলল না, একটু ব্যস্ত হতেও দেখলাম না, হেসে বলেছিল, তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে, ভেবে দেখেছেন, বাবু?

বিকাশের কাহিনী শেষ হল। তারপরও অনেকক্ষণ ওরা নিঃশব্দে বসে রইল সেই বারান্দার অন্ধকারে। একটা আলো জ্বালবার কথাও

কারো মনে হল না। আফিস-ঘর থেকে সদাশিববাবুর বেরোবার সাড়া পেয়ে বিকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার যেতে হয়। আর দেরি করলে, আমার দারোগা সাহেব মনে করবেন, তাঁর আসামী ভাগলবা। হেনাও উঠে পড়ে বলল, মহিলাটির আর কোনো খবর নেন নি?

সে সুযোগ আর পেলাম কই? ক-দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলাম। তারপর পাঁচ বছর জেল। ছাড়া পেয়েই ইন্‌টারনীর পরোয়ানা। চলে এলাম তোমাদের দেশে।

অনেক দিন সুরমাদির বাড়িতে যাওয়া হয় নি। একটা রবিবার দেখে সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে এল হেনা। আসবার সময় একখানা বই চেয়ে নিয়ে এল। সেদিন বিকালের দিকে দাদার ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে সেই বইখানাই পড়ছিল। দরজার বাইরে বাবার গলা শোনা গেল, হেনা আছিস? সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল দোর-গোড়ায়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বিকাশ। চোখ তুলে তাকাতেই বুকের মধ্যে আবাব জেগে উঠল সেই ভীতির স্পর্শ। বিকাশ হেসে বলল, পড়ছিলে বুঝি? হাতের বইখানার দিকে একবার তাকিয়ে হেনা বলল, এই দেখছিলাম একটু। আপনি কখন এলেন?

সদাশিব বললেন, আমি গিয়ে ধরে নিয়ে এলাম। একটু চা-টা কর। আমি ততক্ষণ ডাকটা দেখে আসি।

এর আগে হেনার ঘরে কোনো দিন আসে নি বিকাশ। এখানেই ঢুকবে না সদাশিবের বারান্দায় গিয়ে বসবে, এই ভেবে একটু ইতস্তত করছিল। হেনা বলল, আসুন না! সিঁড়ির ধাপ কটা উঠে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিকাশ বলল, জুতো নিয়ে আসব?

—আপনি হাসালেন, দেখছি। জুতোটা আবার কোথায় রেখে আসবেন? মন্দিরে ঢুকছেন নাকি?—বলে হেসে উঠল হেনা।

—হাসির কথা নয়; সত্যিই মনে হচ্ছে মন্দিরে ঢুকছি। সাজানো-গোছানো ছিমছাম সেটা কিছু নতুন নয়। কিন্তু এরকম একখানি পরিচ্ছন্ন ঘর আমি কোথাও দেখি নি। উনি বুঝি তোমার দাদা?

হেনার মুখের উপর ঘনিয়ে এল ম্লান ছায়া। মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

বিকাশ এগিয়ে গিয়ে অজয়ের ছবিখানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দেখল তার বইয়ের আলমারি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বইগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেনার দিকে ফিরে বলল, কী বই পড়ছিলে?

বইখানা এগিয়ে দিল হেনা। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'। বিকাশের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। দু-চারটা পাতা উলটে বইখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, দাদাকে যে তুমি কতখানি ভালোবাসতে এবং এখনো বাস, তা আমার জানতে বাকী নেই। তবু মনে হয়, তোমাদের দুজনের কোথায় একটা অমিল আছে।

—সে কথা কেন বলছেন?

—তিনি হয়তো অতখানি আগ্রহ নিয়ে এ বইটা পড়তেন না।

—আপনি পড়েছেন এ বই?

বিকাশ হেসে উঠল; ওটাই যে আমাদের প্রথম ভাগ। এ পথে যারা এসেছে, তাদের অনেকেরই আদি দীক্ষা ঐ মারাঠী ব্রাহ্মণের কাছে। কিন্তু তোমার দাদার আলমারিতে ওর জায়গা হয় নি!

হেনা বলল, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যে দেশকে দাদা এত ভালোবাসত, এও তো তারই দুঃখ-দুর্দশা, আর অভাব-অভিযোগের কাহিনী।

—তা ঠিক। তবে দুঃখ দেখে কারো প্রাণে জাগে করুণা, কারো মনে জাগে জ্বালা। তোমার দাদা সেই প্রথম দলের মানুষ। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেবার পথ, কল্যাণের পথ। আমরা যে পথে চলেছি, তার মধ্যে শুধু হিংসা আর প্রতিশোধ।

ছবিটার দিকে আর-একবার চেয়ে বলল, বিদেশী শাসনের বেড়াজালের মধ্যে যে অসহায় অক্ষমতার বেদনা তার হাত থেকে তিনি নিস্তার পান নি, কিন্তু তাতে করে তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হয় নি। ঐ মুখ দেখেই বোঝা যায় তিনি অসুখী ছিলেন না। তাঁর কাজের মধ্যে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

—আপনাদের কাজে কি তৃপ্তি নেই ?

আমাদের !—আবার হেসে উঠল বিকাশ। তারপর ধীরে ধীরে সেই উজ্জ্বল চোখ ছুটো অগ্নিগোলকের মতো জ্বলে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আগুনের জ্বালা যে কী জিনিস, সে তুমি বুঝবে না হেনা !

অকস্মাৎ নিজেকে সম্বরণ করে সস্নেহ দৃষ্টিতে হেনার ভীতিবিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই বলছিলাম, এ পথে তুমি এসো না। ক্ষোভ, অভিযোগ, বিদ্রোহ আর আক্রোশ, ঐ বইয়ের মধ্যে যা ছড়িয়ে আছে, সে সব আমাদের জন্যেই থাক। তোমার পথে থাক স্নেহ, প্রীতি আর করুণা। তা না হলে, আমাদের মতো যারা হতভাগা, তারা গিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ?

হেনার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে আবাব বলল বিকাশ, শুনেছি, মানুষের চোখই হচ্ছে তাব মনের দর্পণ। তাই যদি হয়, তোমার সম্বন্ধে আমার বোধ হয় ভুল হয় নি।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে সদাশিবের সাড়া পাওয়া গেল, বিকাশকে একটু চা-টা দিয়েছিস ?

—এই যে, যাই বাবা। আপনি পালাবেন না যেন—বলেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

বিকাশের সম্বন্ধে নিজের মনের এই বিচিত্র অনুভূতি হেনা নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। কেন এমন হয় ! যাকে দেখতে ইচ্ছা করে, যার কথা শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায়, ছুদিন না এলে

যার পথের দিকে পড়ে থাকে দুটো চোখ, সে যখন কাছে এসে দাঁড়ায়, বুকের মধ্যে কিসের এ আতঙ্কের ছায়া! তার চোখের দিকে একটি বার চোখ পড়লে যেন মনে হয়, না, আমি যাই। অথচ যেতেও মন সরে না। এ কী আশ্চর্য মানুষ, যে একই সঙ্গে কাছে টানে, আবার দূরে ঠেলে দেয়!

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে হেনার মনের কোণে, এরই নাম কি ভালোবাসা! কিন্তু প্রথম যৌবনের অনুকূল হাওয়ায় কুমারী হৃদয়ের নিভৃতে ভালোবাসার যে অঙ্কুর জাগে, তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? কোথায় সে পুলক শিহরণ, সে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের স্পন্দন, সে অকারণে চোখ ছাপিয়ে পড়া অশ্রু? পদ্মকোরকের কাছে যেমন অরুণালোক, নারী-হৃদয়ের কাছে তেমনি প্রেম। তারই অদৃশ্য মোহন স্পর্শে একটি একটি করে পাপড়ি খুলবে, একটু একটু করে ছড়াবে তার গোপন সৌরভ। দিনের পর দিন তার সঙ্গে যুক্ত হবে শিশিরের সিক্ত স্পর্শ, বাতাসের মৃদু দোলা, ভ্রমরের মধুগুঞ্জন। এমনি করে একদিন শোভায় সুধায় আনন্দে বেদনায় বিকশিত হবে অন্তর-মাধুরীর সহস্রদল।

হেনার মনের কাছে এই ছিল ভালোবাসার রূপ। গল্পে পড়া প্রেমের চিত্র তার কল্পনাকে কোনো দিন নাড়া দেয় নি। যে সব বই সে পড়ত তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু সত্যিকার প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে, এমন একটি মেয়েকে নিবিড় ভাবে জানবার সুযোগ সে পেয়েছিল। ডাক্তার বাবুর মেয়ে শোভা। শুধু সমবয়সী নয়, একই সঙ্গে ওরা মানুষ। কিছুদিন হল তার বিয়ে হয়ে গেছে। তারও বেশ কিছুদিন আগে থেকে সেই ছেলেটির সঙ্গে তার ভাব। পূর্বরাগের পালা যখন শুরু হল, সেই থেকে তার মনের প্রতিটি রঙীন মুহূর্তের সঙ্গে হেনার পরিচয়। একটি চিরপরিচিত গ্রাম্য নদী। কতকাল থেকে বয়ে চলেছে বাগানের পাশ দিয়ে। শান্ত নিস্তরঙ্গ শীর্ণ জলরেখা। সে যদি হঠাৎ একদিন

কোনো দূরাগত জোয়ারের আহ্বানে ফেঁপে ফুলে কূল ছাপিয়ে ওঠে, মানুষের মনে যেমন বিস্ময় জাগে, হেনাও তেমনি বিস্মিত হয়ে দেখত তার আজন্ম-সখীর নব নব রূপান্তর। কখনো উচ্ছল কখনো গভীর, কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্রিয়মাণ। একটি বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করে নারী-হৃদয়ের এই যে বিচিত্র বিকাশ, এই তো ভালোবাসা! কিন্তু তার নিজের অন্তরে কোথায় সে অমৃত-স্পর্শ। তার জীবনেও যদি সেই বিশেষ মানুষের আগমন ঘটে থাকে, তাকে ঘিরে হৃদয়ের কোণে কোণে কোথায় সেই মোহময় মধু-সঞ্চার! তাকে দেখে, তার কণ্ঠ শুনে, মনের গহনে তাকে স্মরণ করে, লজ্জায় পুলকে, ব্যথায় উল্লাসে সমস্ত বুকখানা ভরে ওঠে কৈ? তবু সে আছে, ছড়িয়ে আছে সমস্ত চেতনায়। অন্তরে বাহিরে তাকে ভুলে থাকবার উপায় নেই।

খাতার এই অংশটি বারংবার পড়লেন তালুকদার। অনুভব করলেন হেনার মনের সেই গভীর দ্বন্দ্ব, নিদ্রায় জাগরণে তার সেই অস্থির আকুলতা। মানুষের মনের বহু সূক্ষ্মতন্ত্রীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নারী-হৃদয়ের যে অপরি-সীম জটিলতা সংসারে প্রতিদিন বিস্ময় সৃষ্টি করছে, তাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু এই খাতার তিন-চারখানা পাতা জুড়ে কয়েকটি মাত্র রেখা আশ্রয় করে একটি বালিকার বিক্ষত অন্তর্লোকের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছিল, তার সঙ্গে এই বহুদর্শী মানুষটির কোনো দিন পরিচয় হয় নি। জীবনের মাঝখানে হঠাৎ যে এসে দাঁড়াল, তাকে গ্রহণ করবার প্রস্তুতি নেই, সরিয়ে দেবারও উপায় নেই, এর চেয়ে গভীর সমস্যা আর কী হতে পারে? এই মুহূর্তে যাকে চাই, পরমুহূর্তে তাকে চাই না। এই যুগপৎ বন্ধন ও মুক্তি-কামনার অন্তর্নিহিত রহস্য মহেশের কাছেও অস্পষ্ট রয়ে গেল। প্রেম নামক যে অপ্রমেয় বস্তুটির পূর্ণ সন্ধান কেউ কোনো দিন পায় নি, এও তার একটি নতুন প্রকাশ কি না, তিনি জানেন না। সুতরাং হেনার মনে যে প্রশ্ন

জেগেছিল, তাঁর কাছেও সেটা প্রশ্নই রয়ে গেল। শুধু যে-কথা সে বলে গেছে আর যেটুকু সে বলে নি, সব মিলিয়ে একটি সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সেটি হচ্ছে এই—হেনার জীবনে বিকাশ শুধু আগন্তুক নয় পরম আবির্ভাব। তার এই আকস্মিক আগমন প্রেমিকের অভিসার নয়, বিজয়ীর অভিযান। সে এল এবং জয় করল। কিন্তু সে বিজয়বার্তা বিজিতার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল তালুকদার সাহেবের। এই হেনারই আর-একটা রূপ। কত সহজে কত অনায়াসে তার গোপন নারীহৃদয় সেদিন ধরা দিয়েছিল আর-একজনের কাছে। অগ্নিমন্ত্রী বিপ্লবী বিকাশের সঙ্গে সেই নিরীহ শান্ত মানুষটির কত তফাত। তার মধ্যে না ছিল শক্তির প্রাবল্য, না ছিল ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা। দুচোখে আগুন ছড়িয়ে, বাকশৈলীর মোহ বিস্তার করে সে আসে নি। তার কণ্ঠ ছিল নীরব, চোখে ছিল ভীরু আবেদন। তবু তারই কাছে নুয়ে পড়েছিল হেনার উন্মুখ অন্তর। ওরা কেউ মুখ ফুটে না বললেও এটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। দেবতোষকে সেদিন বিমুখ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যানের আঘাত শুধু একদিকে বাজে নি। যে পায় নি, তার চেয়ে যে দিতে পারল না, তার দুঃখটাই বোধ হয় আরও বড়। ডাক্তার চলে যাবার পর হেনাকে যেদিন প্রথম দেখলেন তালুকদার, এই কথাটাই তাঁর মনে হয়েছিল।

খাতার কাহিনী এগিয়ে চলল—

সকালে বেড়িয়ে ফিরে জামাটা খুলতে খুলতে বললেন সদাশিব, বিকাশকে দেখে এলাম। আজও জ্বর এসেছে, তবে আগের চেয়ে কম।

কী খাচ্ছেন? মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল হেনা।

—সেই তো হয়েছে মুশকিল। দুধটা একেবারেই খেতে পারে না।

গন্ধ লাগে। চাকরটাকে একটু বার্লি করে দিতে বলেছিল। সে সব কি ঐ ব্যাটার কর্ম? একেবারেই মুখে তুলতে পারে নি। তুই এক কাজ কর না, মা? একটু বার্লি ফুটিয়ে নেবু-টেবু দিয়ে পাঠিয়ে দে ছেলেটার জন্যে।

হেনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, এবং শম্ভুকে ডেকে দিতে বলে এগিয়ে গেল বাবার ঘরের দিকে।

শম্ভু কী করবে? জিজ্ঞাসা করলেন সদাশিব।

—এক কৌটো বার্লি আনতে দিই। ঘরে যা আছে একটু পুরনো হয়ে গেছে।

—এই যে বার্লি আমি নিয়েই এসেছি মহিম সা'র দোকান থেকে। কোথায় রাখলাম! দেখ তো, ঐ জামার পকেটে আছে বোধ হয়।

বিকালের দিকে খালি পাত্রটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিল বিকাশের চাকর। বলল, রোজকার মতো আজও কিছুতেই খাবেন না। তারপর যখন বললাম, ও-বাড়ির দিদিমণি নিজে করে পাঠিয়েছেন তখন চোঁ-চোঁ করে সবটা খেয়ে নিলেন। বলেছেন, সন্ধ্যার পর আর-এক গেলাস নিয়ে আসিস আমার কথা বলে। ভারি ভালো লাগল শরবতটুকু।

এর পর থেকে কখনো বার্লি, কখনো সাগু, কখনো একটু মশুর ডালের সূপ, হেনাই যোগাতে লাগল। ফলটাও সে ছাড়িয়ে পরিপাটি করে ডিশে সাজিয়ে দেয়। তা না হলে মুখে তুলতে চায় না বিকাশ। বিকালে ফলের সঙ্গে এক গেলাস দুধ দিতেই চাকর আপত্তি করল, দুধ খায় না বাবু। হেনা একটু হেসে বলল, না খেলে চলবে কেন। বোলো, আমি বলেছি খেতে।

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল শূন্য গেলাস।

কটা দিন দুশ্চিন্তায় কেটে যাবার পর সকালে খবর নিয়ে এলেন সদাশিব, দুদিন থেকে জ্বর আর আসে নি। কাল ভাত দিতে

বলেছেন ডাক্তার। সে ব্যবস্থাও হেনাকে করতে হল। পুরনো সরু চাল আর তাজা মাগুর মাছের সন্ধানে সদাশিব ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেবার পূজা পড়েছিল শেষ আশ্বিনে। আর কটা দিন বাকী। রৌদ্র-ঝলমল আকাশে কেমন ‘পুজো-পুজো’ গন্ধ। এমন সময় একদিন বিকালের দিকে বিপুল ঘনঘটা শুরু হয়ে গেল। বিকাশের রাতের খাবারটা একটু সকাল সকাল পাঠিয়ে দিয়ে বাবা এবং রাখালকেও তাড়াতাড়ি করে বসিয়ে দিল হেনা। তারপর নিজেও যাহোক দুটো মুখে পুরে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানায় শুয়ে একটা কী বই পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙতেই মনে হল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। খুলতে গিয়েও খুলল না। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানার উপর বসেই জিজ্ঞাসা করল—কে ?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর—আমি।

স্বরটা যেন চেনা-চেনা। দরজা খুলেই চমকে উঠল—আপনি ?

—তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না ? চৌকাঠ ধরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল বিকাশ।

সে কথার জবাব না দিয়ে তেমনি উৎকণ্ঠিত সুরে বলল হেনা, এত রাত্রে, এই অসুস্থ শরীরে ! কোনো বিপদ আপদ হয় নি তো ?

—বিপদ থেকে তুমিই তো বাঁচিয়ে তুললে। বড্ড দেখতে ইচ্ছা হল তোমাকে। তাই চলে এলাম।

হেনার মুখের পেশীগুলো হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল। শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলল, ভালো করেন নি বিকাশবাবু। যান, বাসায় ফিরে যান।

অ্যাঁ ! চমকে উঠল বিকাশ। তার পর যেন হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, এমনি সুরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি যাচ্ছি। বলেই, চলতে গিয়ে পা দুটো টলে উঠল, এবং পড়ে যাবার উপক্রম করতেই হেনা দুহাতে ধরে ফেলল তার কাঁধের কাছটা। সঙ্গে সঙ্গে

বলে উঠল, এ কী ! আপনার গা যে বেজায় গরম। আবার জ্বর এল কখন ?

আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিল তার তক্তপোশের বিছানার উপর।

বিকাশ হাঁপিয়ে পড়েছিল। একটু দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এসেছে আজ সন্ধ্যাবেলায়। তার সঙ্গে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা ! গোটা দুই অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু ঘুমের মতো এসেছিল। তারই মধ্যে দেখলাম, তুমি আমার পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছ। কী ঠাণ্ডা হাত আর কী মিষ্টি ! তন্দ্রা ভেঙে যেতেই মনটা কেমন ছটফট করে উঠল। ছুটে এলাম তোমার কাছে।

থেমে থেমে ধীরে ধীরে বলল কথাগুলো। আরো কী বলতে যাচ্ছিল, হেনা থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক ; আর কথা বলবেন না।

—কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে। বলে আর-একবার উঠতে চেষ্টা করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে বসে পড়ল খাটের উপর। কড়কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল এক ঝলক বিদ্যুৎ-চমক। সেই আলোয় বিকাশের মুখের উপর চোখ পড়তেই শিউরে উঠল হেনা। অস্ফুট স্বরে বলল, না, না ! কোথায় যাবেন এই অসুস্থ শরীরে ? বালিশটা এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন, চট করে শুয়ে পড়ুন।

—শুয়ে পড়ব ? ক্লান্ত কণ্ঠে বলল বিকাশ। বেশ ! কিন্তু তার পর ?

হেনার মুখে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর যোগাল না। একবার ভাবল, বাবাকে ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হল—কী ভাববেন তিনি ? এমন সময় যেন সব সমস্যার সমাধান করে চেপে এল বৃষ্টি। হেনা উঠে গিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল। ঘরে অডিকলন ছিল। হাতপাখা ছিল আলমারির মাথায়। সেই সব সংগ্রহ করে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল গিয়ে তক্তপোশের ধারে। বিকাশ চোখ

বুজে পড়ে রইল অসাড় নিস্পন্দের মতো। তার জ্বর-তপ্ত কপালের উপর অডিকলনের জলপটি ঘন ঘন বদল হতে লাগল। সেই সিক্ত বস্ত্রখণ্ডের স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশে রইল কয়েকটি ক্ষিপ্রগতি কোমল আঙুলের স্পর্শ। কিন্তু ঐ মুদ্রিতচক্ষু পীড়িত মানুষটির বুকের কোনখানে কী সুর তারা জাগিয়ে তুলল, তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

এমনি করে কখন গভীর হল বর্ষণমুখর রাত্রি, কখন ঘুমের আবেশে জড়িয়ে এল দুটি ক্লান্ত চোখ, অবাধ্য মাথাটা অজ্ঞাতসারে লুটিয়ে পড়ল বিকাশের বালিশের পাশে, হেনার কাছে সবটাই রইল অজ্ঞাত।

এবারেও ঘুম ভাঙল সেই একই শব্দে—দরজার উপর ঘন ঘন করাঘাত। তার সঙ্গে অনেক মানুষের চাপা কোলাহল, পেট্রোম্যাক্স আলোর ছুটোছুটি। হঠাৎ উঠতে গিয়ে বাধা পড়ল। গলার চারদিকে জড়িয়ে আছে একখানি রোগদুর্বল হাতের প্রগাঢ় বেষ্টনী। মুহূর্ত-মধ্যে থেমে গেল বুকের স্পন্দন, অসাড় হয়ে গেল সমস্ত দেহ। পরক্ষণেই হাতখানা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল হেনা। বাইরের গোলমাল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কে যেন ডেকে উঠল তার নাম ধরে। সাড়া দিতে গিয়ে গলায় স্বর ফুটল না। পা দুটোও বুঝি অচল হয়ে গেল। আবার জোরে জোরে দরজা ঠেলার শব্দ। বিকাশের ঘুম কি কিছুতেই ভাঙবে না! তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকল হেনা, 'শুনছেন, শীগগির উঠুন।' ধড়মড় করে উঠে বসল বিকাশ—কী হয়েছে ?

—কারা সব দোর ঠেলছে। কী হবে!

এক মুহূর্তে কী ভেবে নিল বিকাশ। একটিবার তাকাল ওর ভীতিবিহ্বল মুখের দিকে। তারপর যেন ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শান্তকণ্ঠে বলল, ভয় কী হেনা? আমি তো রয়েছি—বলেই দৃঢ়

পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল কপাট। ঠিক সামনেই দলবল নিয়ে বড় দারোগা হোসেন সাহেব। মস্ত বড় একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, উঃ বাঁচালেন মশাই। চাকরিটা তাহলে রয়ে গেল আজকের মতো। পিছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দেখছি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে ছোটবাবু। গোড়ার দিকে এখানে এলে অনেক হয়রানির হাত থেকে বাঁচা যেত, আর এমন ধারা ভিজে ঢোল হতে হত না। ছোটবাবু, মানে ছোট দারোগা, একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, আমার আন্দাজ কোনো দিন মিথ্যা হতে দেখেছেন? এতদিন কিন্তু আমার কথাটা কানে তুলতেই চান নি। এবার দেখলেন তো স্যর? গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।

—যাক, এবার চলো সব। এগুলো এখনি ছেড়ে না ফেললে নির্ঘাত নিমুনিয়ায় ধরবে। আপনি আসুন বিকাশবাবু। মাস্টার-বাবু গেলেন কোথায়?

ছোট দারোগা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, হ্যাঁ; মাস্টারবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলে যান, স্যর, ভদ্দরলোকের পাড়ায় এসব বিন্দাবনী কাণ্ড না করে মেয়েকে বরং বাজারের মধ্যে একটা ঘর-টর—

শাট্-আপ, গর্জে উঠল বিকাশ। বড় দারোগার দিকে চেয়ে বলল, আপনার ঐ অ্যাসিস্ট্যাণ্টটিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিন, হোসেন সাহেব, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনো অভদ্র ইঙ্গিত আমি সহ্য করব না।

—আপনার স্ত্রী! হোসেনের সুরে গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল। মানে, আমাদের পোস্টমাস্টারবাবুর মেয়ে ঐ—

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি।

—বিয়েটা বুঝি গান্ধর্বমতে হয়েছিল? বলে উঠল ছোট দারোগা।

—আহা, ও সব কী কথা নিবারণ! ধমকের সুরে বল্লেন হোসেন সাহেব। তারপর আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলেন খিড়কির দিকে।

ঘরের এক কোণে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল হেনা। তার একান্ত কাছটিতে সরে এসে বলল বিকাশ, আমাদের তো আর লজ্জা করবার সময় নেই, হেনা! চলো, তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসি।

হেনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিকাশ তার জন্যে অপেক্ষাও করল না। ওর একখানা হাত তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে, একটুখানি চাপ দিল অসাড় আঙুলগুলোয়, তারপর সেই হাত ধরেই নিয়ে চলল সদাশিবের ঘরের দিকে। দরজা খোলাই ছিল। কোণের দিকে হ্যারিকেনটা রোজকার মতো বসানো। পলতেটা কে যেন উসকে দিয়েছে। তারই আলোতে দেখা গেল, সদাশিব বিছানার উপর বসে আছেন। চোখ দুটো চেয়ে আছে। কিন্তু তারা যে দেখছে তার কোনো লক্ষণ নেই। হেনার হাত ধরে বিকাশ যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখনো সে দৃষ্টি তেমনি শূন্য-নিবদ্ধ। ওদের দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হল না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিকাশ বলল, আমরা আপনার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। আপনাকে একটু উঠতে হবে।

যেন গভীর ধ্যান থেকে জেগে উঠলেন সদাশিব। ধীরে ধীরে বললেন, কী বলছ ?

বিকাশ হেনাকে নিয়ে আর একটু এগিয়ে এল। নত হয়ে ওঁর পায়ের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল, আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা সুখী হতে পারি।

সদাশিব উঠবার কোনো উদ্যোগ করলেন না। পা গুটিয়ে যেমন বসে ছিলেন, তেমনি রয়ে গেলেন। পলকের জন্যে একবার হেনার বর্ণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও, বিকাশ!

—বেশ, বলে বিকাশ হেনার হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাহলে আসি।

সদাশিবের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। যাবার জন্যে পা বাড়াল বিকাশ। পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, যা কিছু ঘটেছে, আমিই তার জন্যে দায়ী। দোষ বলুন, অপরাধ বলুন, তারও সবটুকুই আমার। ওর তাতে কোনো অংশ নেই। একটুখানি থেমে আবার বলল, কিন্তু শুধু সেই জন্যেই, অর্থাৎ আপনাদের দুজনকে লজ্জা আর কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার মেয়েকে আমি গ্রহণ করছি, একথা যদি মুহূর্তের তরেও মনে করে থাকেন, আমার ওপর ঘোর অবিচার করা হবে। আমাকে আপনি স্নেহ করেন, আর হেনাকেও আমি—এ শুধু সেই জোর, আর কিছু নয়। আজকের দুর্ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। তোমাকেও আমি সেই কথাই বলতে চাই হেনা! সকালেই বোধ হয় ওরা আমাকে সদরে চালান দেবে! যাবার আগে হয়তো আর দেখা করবার সুযোগ হবে না। বলে, মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। তারপর দুজনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোনো কারণে পোস্টমাস্টার আফিসে যেতে না পারলে স্থানীয় ইস্কুলের একজন শিক্ষক এসে কাজ চালিয়ে যান। এইটাই বরাবরের নিয়ম। সকালে উঠে সদাশিব শম্ভুকে দিয়ে তাঁকেই খবর পাঠিয়ে দিলেন। হেনা যথারীতি চা দিয়ে গেল। নিঃশব্দে খেয়ে নিলেন। শম্ভু কলকে ধরিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেল গড়গড়ার মাথায়। নলটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ টানলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়। হেনা ছিল রান্নাঘরে। রাখালের মুখে খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল—এ কী, অসময়ে শুয়ে পড়লে যে? শরীরটা ভালো নেই বুঝি?

—না, মা, শরীর আমার ভালোই আছে।

আর কোনো প্রশ্ন না করেই চলে যাচ্ছিল হেনা। সদাশিব

ডেকে ফেরালেন। কাছে এলে বসতে বললেন। তারপর মেয়ের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার আনত মুখের পানে, যেন কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোর মুখের দিকে আমি তো আর চাইতে পারছি না, মা!

হেনা এতক্ষণ বাবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। তার মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ওঁর চোখে তার কোনো চিহ্ন না ধরা পড়ে, সেই দিকেই ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু বাবার আর্তকণ্ঠের এই একটি মাত্র কথা শুনে নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারল না। দুচোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। বৃদ্ধ আবার বললেন, আজ যদি তোর মা থাকত, আমাকে কিছুই করতে হত না। তোর দাদাটা থাকলেও তোকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ যে আমি একেবারেই একা! কোনো দিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না। কী করব, কোন পথে যাব, তোকেই তো বলে দিতে হবে। মনে কর, আমি তোর বাপ নই, অক্ষম ছেলে।

একটু থেমে নিয়ে বললেন, বিকাশের কথা তো সব শুনলি? এবার তোর মনের ইচ্ছাটা আমাকে জানিয়ে দে। আমার কাছে লজ্জা করিস না, মা!

তার মনের ইচ্ছা কি সে নিজেই জানে, যে জানিয়ে দেবে? দুদণ্ড শান্ত হয়ে মনের মুখোমুখি বসে বোঝাপড়া করে নেবে, সে সুযোগটাও তো পায় নি। বিকাশের মুখে সেই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক উক্তি শুনে হোসেন দারোগা আর তার পুলিশের দলটাই যে থ হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, তার চেয়েও বেশী চমকে উঠেছিল সে নিজে। এখনো সেই বিস্ময়ের ঘোর তার সমস্ত চেতনা অধিকার করে আছে। মনের গহনে দৃষ্টি পৌঁছতে পারে নি।

এদিকে তাঁরই মুখ চেয়ে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন তার বাবা। তাঁর পেছনে অপেক্ষা করে আছে তাদের রক্তচক্ষু

প্রতিবেশীর দল, তার নিজের মান সম্ভ্রম, তাদের পারিবারিক সম্মান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ভাবতে গিয়ে হেনার স্নায়ুকেন্দ্রের সমস্ত তারগুলো যেন জড়িয়ে গেল। বেরিয়ে এল ছুটি অস্ফুট আর্তস্বর—আমি কিছু জানি না বাবা! আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

এইটুকু বলেই সে ভেঙে পড়ল বাবার বুকের উপর। সদাশিব ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দরজার বাইরে শম্ভুর গলা শোনা গেল, থানার বড়বাবু একবার দেখা করতে চান। কথাটা হেনার কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল পার্টিশনের ওপাশে। সদাশিবও উঠে বসে হোসেনকে ডেকে পাঠালেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি এসে গেলেন। সদাশিবের খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, আপনার আফিসে এসে দেখলাম, যত্ন মাস্টার ডাক খুলছে। তারপর শম্ভুর কাছে শুনলাম, আপনার অসুখ। কেমন আছেন এখন?

সদাশিব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। মাটির দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী ভেবে নিয়ে বললেন, অসুখটা যে কী, আপনার কাছে তো লুকানো নেই, দারোগা সাহেব! আপনি না এলে একটু সামলে নিয়ে আমিই যেতাম আপনার কাছে। আমি যে কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

হোসেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আমার তো মনে হয়, পথ ঐ একটাই আছে মাস্টারবাবু! আর বিকাশই সেটা দেখিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু, ওদের ঐ ছন্নছাড়া জীবন। বাড়ি-ঘর বলতে জেলখানা। কোন দিন ধরে ঝুলিয়ে দেবে, তারই বা ঠিক কী? মা-মরা মেয়েটাকে শেষকালে—

স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। বোধ হয় ওঁকে শান্ত হবার সময় দিলেন। তারপর বললেন, আপনার আশঙ্কা যে

একেবারে মিথ্যা তা কেউ বলবে না। কিন্তু, কিছু মনে করবেন না সদাশিববাবু, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, মেয়ের ভবিষ্যতের চেয়ে এখন বড় ভাবনা হল ওর ইজ্জত। ওর হাতে যদি দেন, তবু খানিকটা মুখ রক্ষা হতে পারে। আর তা যদি না হয়, আপনার জাতভাই মশাইরা যে কী চীজ, তা তো আমার জানতে বাকী নেই। কোথায় গিয়ে যে ওরা থামবে, বলা বড়ই শক্ত। আপনাকে জবাই করার তোড়জোড় এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

সদাশিব ভাবতে লাগলেন।

হোসেন অনেকটা যেন আশ্বাসের সুরে বললেন, তবে একটা কথা। ঐ-সব স্বদেশীওয়ালাদের আমি ভালো করেই চিনি। ওদের আর যা-ই দোষ থাক, কথার খেলাপ কাকে বলে জানে না। মানুষগুলো একদম খাঁটি। একবার যেটা ধরবে, যেদিকে ঝোঁক পড়বে, তারই জন্যে জান কবুল। কে জানে, আপনার হেনাই হয়তো ওর মোড় ফিরিয়ে দিল। যে ভাবে ওর হাতটা চেপে ধরে নিয়ে এল আপনার কাছে, ও হাতে যে আবার রিভলবার উঠবে, আমার তো বিশ্বাস হয় না, মশাই! বলে, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন হোসেন সাহেব। হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বললেন, কী জানেন, ইনটার্নমেণ্ট রুল্‌স্‌ ব্রেক করলেও ছেলেটাকে চালান দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু বন্ধু আমাদের পায়ে পায়ে। ঐ নিবারণটাই হয়তো ঝেড়ে দেবে একটা উড়ো চিঠি। তারপর চাকরি নিয়ে টানাটানি। কাজেই, সেগু আপ করতেই হবে। তবে পুলিশ যাতে মামলা না চালায়, সে চেষ্টাও আমি করব।

সদাশিবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই আবার শুরু করলেন হোসেন দারোগা, সাহেবটা পেয়েছি ভাল্লো। কথা-টথা শোনে ; আর আপনাদের দোয়ায়, একটু খাতিরও করে। আমি গিয়ে যদি বলি, সাহেব, তোমার ঐ বিকাশ ঘোষের বিষদাঁত ভেঙে গেছে, মনে রঙ ধরেছে ছোকরার ; এখন সাদি-টাদি

করে সংসারী হোক, আমরাও নিশ্চিন্দি হই।—আমার তো মনে হয় কথাটা ঠেলতে পারবে না। ইংরেজের বাচ্চা তো। খোদায় করলে চাই কি একেবারে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

সদাশিব ওঁর হাত তুখানা জড়িয়ে ধরে বললেন, দয়া করে সেই সাহায্যটুকু আমায় করুন, দারোগা সাহেব। তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে মেয়েটাকে ওর হাতে সঁপে দিতে পারি। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

হোসেন সাহেব উঠে পড়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, মাস্টার বাবু! আমার যদ্দুর সাধ্য, আমি নিশ্চয়ই করব। অ্যাদ্দিন ধরে দেখছি তো, আপনার মেয়ের মতো মেয়ে হয় না। ওর চাচী তো 'হেনা' বলতে অজ্ঞান। ও সুখী হোক, আমরা সবাই তাই চাই।

গলা খাটো করে বললেন, তা ছাড়া, আপনাকে বলতে আর বাধা কি, এই ক-দিনে ঐ ছেলেটার ওপরেও কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে, মশাই! তুটিতে মানাবেও চমৎকার! আচ্ছা, এবার তাহলে চলি। একগাদা লোক বসে আছে। আপনিও উঠে পড়ুন। অফিস যাওয়া বন্ধ করবেন না। শুয়ে থাকলেই যত রাজ্যের বাজে চিন্তা এসে জোটে।

সদাশিব উঠে দরজা পর্যন্ত গেলেন হোসেনের সঙ্গে। একটু ইতস্তত করে বললেন, বিকাশকে একবার—

—সে কথা বলতে হবে না। যাবার আগে পাঠিয়ে দেব।

ও.সি. তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। সদরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে এ বাড়িতে একবার এসেছিল বিকাশ। হেনা ছিল রান্নাঘরে। খোঁজ করতে করতে সেইখানে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার আনত মুখের দিকে চেয়ে বলল, নিজের কথাই শুধু বলে গেলাম। তোমার কথা আর শোনা হল না। ভুল করি নি, এইটুকু জানতে পারলেও একটু তৃপ্তি পেতাম যাবার সময়। দরজার চৌকাঠ ধরে নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল হেনা। কোনো

জবাব করে নি। হয়তো জবাব দেবার মতো ছিল না কিছুই। ভুল যদি হয়েও থাকে, সে কথা আর জানিয়ে কী লাভ? ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, এসব প্রশ্ন তখন নিতান্ত অবান্তর। হেনার সামনে তখন একটিমাত্র পথ—অন্ধ নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। তাই সে দিয়েছিল। কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, সে বিচারের অবকাশ ছিল না।

বিকাশ ক্ষণকাল অপেক্ষা করে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা আমার কলকাতার ঠিকানা। আপাতত শ্রীঘরে যাচ্ছি। সেখানকার মেয়াদ বোধ হয় মাস তিনেক। তার পর আমাকে নিয়ে যে কী করবেন কর্তারা, এখনো স্থির করতে পারেন নি। তবে ছাড়া একদিন পাবই, এবং তার পরেই এখানে এসে তোমাকে পাব, এই ভরসা নিয়ে যাচ্ছি। যদি তাব মধ্যে তোমাদের অন্য কোথাও যেতে হয়, ঐ ঠিকানায় একখানা চিঠি ছেড়ে দিও। যেখানেই থাকি সে চিঠি আমার হাতে পৌঁছবে। দেবে তো?

হেনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

বিকাশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কোথায় গেলেন?

—আফিসে আছেন।

বলতে বলতেই সদাশিব এসে দাঁড়ালেন ওদের কাছে। বিকাশ এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, হোসেন সাহেব আমাকে সব কিছুই বলেছেন। আশীর্বাদ করুন, যেন শীগগিরই আপনার কাছে ফিরে আসতে পারি।

সদাশিব ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তার পর কোনো রকমে বললেন, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবা! ও যেন কোনো দিন দুঃখ না পায়, এইটুকু তুমি দেখো।

বলেই চোখ মুছতে মুছতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বিকাশ যাবার জন্যে পা বাড়াল। পিছন থেকে কানে গেল মৃদু কণ্ঠের

আহ্বান, একটু দাঁড়ান। ফিরে দাঁড়াতেই হেনা এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল ওর পায়ের কাছে। বিকাশের উদ্দেশে এইটাই ওর প্রথম প্রণাম। শুধু প্রণাম নয়, হয়তো সেই সঙ্গে তার শেষ প্রশ্নের বাক্যহীন উত্তর।

বাইরে থেকে পাহারাওয়ালার হাঁক শোনা গেল—জাহাজকা টাইম হো গিয়া, বাবু!

বিকাশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেটা প্রমাণ করতে হলে হেনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়। হোসেন দারোগা পুলিশ সাহেবকে বোঝালেন, তাতে মামলা ফেঁসে যেতে পারে। ও রকম সাক্ষীর উপর ভরসা করা যায় না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মামলা চলল না। মাসখানেক হাজত ভোগ করবার পর বিকাশকে আবার যেতে হল অন্তরীণে, রংপুর জেলার কোন এক অখ্যাত থানায়। বেশী দিন থাকতে হল না। কয়েক মাস পরেই সরকার তাকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করলেন। খবরটা হোসেন সাহেবই পৌঁছে দিয়ে গেলেন সদাশিববাবুর কাছে। এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের পিছনে একজন বিধর্মী দারোগার হৃদয়ের দান কতখানি, সরকারী নথিপত্রে তার পরিচয় হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু উপহাস- এবং লাঞ্ছনা -জর্জর দুটি মানুষের কৃতজ্ঞ অন্তরে সেটা অক্ষয় হয়ে রইল।

কদিন পরে বিকাশের চিঠিও এসে গেল। হেনার কাছে লেখা সামান্য কয়েক ছত্র—কলকাতা এসেছি। সদাশয় সরকার মুক্তি যেমন দিয়েছেন, তার সঙ্গে আর-একটা বস্তু দান করেছেন, তার নাম ম্যালেরিয়া। সম্প্রতি তারই দাপটে শয্যাশায়ী। গায়ে একটু বল পেলেই বাহাদুরনগরের টিকেট কাটব—ইত্যাদি।

সদাশিব কিছু দিন থেকে নানা অসুখে ভুগছিলেন। তাই নিয়েই কোনো রকমে আফিস করেন। অনেকখানি নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন। এই চিঠি আসবার পর নতুন করে বল পেলেন। হেনার

বিয়ে। তাঁর প্রথম এবং শেষ কাজ। কিন্তু কী দিয়ে কী করতে হবে, কিছুই জানেন না। স্বজাতি বন্ধুবান্ধব যারা, সবাই একরকম সরে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের দশ জনের সঙ্গে তাদের চলতে হয়। এতখানি কেলেঙ্কারির পর ওঁর সংস্রবে থাকলে তাদেরও বিপদ। বন্ধু বলতে, সহায় বলতে এক হোসেন সাহেব। কিন্তু তিনি মুসলমান। সামাজিক কাজে-কর্মে কী সাহায্যই বা করতে পারবেন! সদাশিব স্থির করলেন, রাখালকে পাঠিয়ে তার মাকে আনিয়ে নেবেন। আপনার জন বলতে ঐ এক বোন। ছোট ভাইও একজন ছিল। সে নেই। বউমাটি ছেলেপিলে নিয়ে কলকাতার বাসিন্দা। তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। আসবে কি না, সন্দেহ! এই তো গেল জনবল। ধনবলও বিশেষ কিছু নেই। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সামান্য পুঁজি। তারই একটা অংশ তুলে নিয়ে কিছু কেনাকাটাও শুরু করলেন সদাশিব।

মাসখানেক কেটে গেল। বিকাশ এসে পৌঁছল না। চিঠি এলে ওঁর চোখেই আগে পড়বে। তবু হেনাকে ডেকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, বিকাশের আর কোনো খবর-টবর পেলি?

—না তো?

এবার সত্যিই মুষড়ে পড়লেন সদাশিব। এমন সময় হোসেন দারোগা বদলি হয়ে গেলেন। যিনি এলেন, বাহাদুরনগরের মাটিতে পা দিতে না দিতেই প্রচার করে দিলেন, ভ্রষ্টা মেয়ে ঘরে পুষে রেখে ভদ্রপল্লীতে বাস করা চলে না। অতএব সদাশিবকে হয় অবিলম্বে ছুটি নিতে হবে, নয়তো বদলি হয়ে চলে যেতে হবে। অন্যথায় এ সব পাপ কী করে বিদায় করতে হয়, তিনি ভালো ভাবেই জানেন। উপসংহারে কিঞ্চিৎ রসিকতাও করলেন ভক্তদের আসরে, তাঁর নাম হোসেন সেখ নয়, বরদা পাল, মেয়ে-দারোগা নয়, মদ্দা-দারোগা।

সেই রাত্রির পর হেনা একদিনের তরেও বাড়ির বাইরে যায় নি। পাড়ার মেয়েরাও কেউ তার কাছে আসে নি। শুধু শোভা একদিন

এসেছিল। তার বাবা জানতে পেরে রাগারাগি শুরু করেন। তারপর আর সাহস করে নি। মাঝে মাঝে সুরমাদি আসেন। সংসারের কাজ সব ওর ঘাড়ে। একটি ঠিকা ঝি ছিল। বাসন মেজে ঘর নিকিয়ে দিয়ে যেত। ডাক্তারগিন্নীর ধমক খেয়ে খেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। একদিন রাত্রিবেলা চুপি চুপি এসে জানিয়ে গেছে সে কতখানি নিরুপায়। সদাশিববাবুর এত কালের বাহন যে শম্ভু, সে-ও দারোগাবাবুর ভয়ে বাইরে বাসা করতে বাধ্য হয়েছে। আফিসের কাজটুকু সেরেই চলে যায়। বাড়ির মধ্যে আসে না। যদি বা আসে, কখনো ক্বচিৎ, এবং তাও লুকিয়ে। রোজকার বাজার এবং কেনাকাটা যা কিছু, সব রাখালকেই করতে হয়।

নতুন দারোগার নোটিশ যখন কানে এল, সত্যিই বড় ভাবনায় পড়লেন সদাশিব। এই জাতীয় লোক যে মিথ্যা দম্ভ করে না এবং কোনো কিছুই এদের অসাধ্য নয়, তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সেদিন সকালের আফিস শেষ করে যখন ভিতরে এলেন, বেলা প্রায় বারোটা। শরীর-মন দুই-ই যেন ভেঙে পড়ছে। বারান্দায় এসে বসলেন তামাকের অপেক্ষায়। শম্ভু যাবার পর থেকে তামাক উনি নিজেই সাজেন। হেনা টিকেগুলো ধরিয়ে এনে দেয়। আজ দেখলেন রাখাল এসে কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে গেল। নলটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তোর ইস্কুল নেই ?

—ইস্কুলে যাই নি, মামাবাবু !

—কেন ?

রাখাল নিরুত্তর।

—খালি খালি কামাই করছিস কেন ? বিরক্তির সুরে জানতে চাইলেন সদাশিববাবু। ছেলেটা তখনো সাড়া দিচ্ছে না দেখে ধমকে উঠলেন। রাখাল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলল, ও ইস্কুলে আমি পড়ব না।

—কেন ? মাস্টার মেরেছে ?

—না।

—তবে ?

—দিদির নামে কী সব বিশ্রী কথা বলছে ওরা। এদিক-ওদিক চেয়ে তেমনি চাপা কান্নার সুরে বলল রাখাল।

সদাশিববাবুও ভয়ে-ভয়ে ঘরের দিকে তাকালেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই। দরজার পাশেই হেনার আঁচলটা চোখে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে এল, স্নান করবার তাগিদ নিয়ে। সদাশিব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, দেখ, সে আসে নি বা চিঠি দেয় নি বলে আমাদেরও চুপ করে থাকা উচিত হয় নি। অসুখ-বিসুখও তো করতে পারে। তুই বরং একখানা চিঠি দে।

হেনা তিক্ত হাসি হেসে বলল, আমার অত সময় নেই, বাবা!

—বেশ, তুই না লিখিস, আমিই লিখব।

হেনা চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না।

সদাশিব হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলেন, এটাও না, ওটাও না ; তবে কী করতে চাস, বল ?

হেনা চমকে উঠল। বাবার এই সুর, এই চোখ তার একেবারে অচেনা। মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে আরো খেপে গেলেন সদাশিব। চেঁচিয়ে উঠলেন, তোর জন্যে আর কত লাঞ্ছনা সইব, বলতে পারিস ? হয় তুই বিদায় হ, নয় তো আমাকে বিদায় দে। আর পারি না আমি—বলে হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মতো চলে গেলেন আফিসঘরে।

হেনা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। সারা জীবনে রূঢ় কথা দূরে থাক, চড়া সুরের একটা ডাকও সে শোনে নি বাবার কাছ থেকে। তৃণের চেয়েও নম্র, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, পরম বৈষ্ণব সদাশিব।

অনেক দিন পরে অকস্মাৎ আজ দাদাকে মনে পড়ে গেল। পাঁজর ভেঙে এল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। দুহাতে বুক চেপে ধরে কোনো রকমে টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে প্রথমে রাখালের ভাত বেড়ে দিল। তারপর বাবাকে ডাকতে গেল আফিস-ঘরে। একবার ডাকতেই সদাশিব নিঃশব্দে উঠে এলেন। কুয়োতলায় স্নান সেরে যা পারেন, মাথা নিচু করে দুটো খেয়ে নিলেন। হেনাও একবার বসল গিয়ে ভাতের পাতে। কিন্তু ভাতের গ্রাস গলা দিয়ে নামতে চাইল না। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। হাত ধুতে যাবার পথে হঠাৎ কানে গেল, বাবা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করছেন রাখালকে, তোর দিদি খেয়েছে রে ?

রাখাল বলল, খেয়েছে।

সারাটা দিন হেনার কেবলই মনে হতে লাগল, সুরমাদি কত দিন আসেন নি। সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারল না। রাস্তার লোক চলাচল যেমনি বন্ধ হয়ে এসেছে, অমনি রাখালকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফটক পার হতেই সুরমা এগিয়ে এসে বললেন, এই যে হেনা, এসো, এসো। তুমি এলে, ভালোই হল। তা না হলে আমিই যেতাম তোমার কাছে।

—কই আর যান আপনি ? একটুখানি অভিমানের সুর লাগল হেনার উত্তরে। সুরমাদি কী ভাবছিলেন। বোধ হয় কথাটায় তেমন মনোযোগ দিলেন না। রাখাল বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, আমি যাই দিদি। কতক্ষণ পরে আসব ?

—না, না, যাবে কেন ? উত্তর দিলেন সুরমা। বারান্দায় এসে বোসো, দিদিকে আজ বেশীক্ষণ আটকাব না।

শোবার ঘরে নিয়েই বসালেন হেনাকে। সাধারণ কুশল-প্রশ্নের পর বললেন, তোমার বাবা যে ছুটি নেবেন, বলেছিলেন। তার কদ্দূর হল ?

—ছুটি নিতে চাইছেন না। কাছাকাছি কোথাও বদলির চেষ্টায় আছেন বোধ হয়।

—কাছাকাছি গিয়ে আর কী লাভ হবে? কুকুরগুলো সেখানেও ধাওয়া করতে ছাড়বে না।

—এখানটা ছেড়ে নড়তে চান না বাবা।

সুরমা একটা নিশ্বাস চেপে বললেন, জানি। কিন্তু—হ্যাঁ ; একটা কথা তোমাকে বলতে চাই হেনা! একবার মনে হয়েছিল, থাক, বলে কাজ নেই। এখন দেখছি, না, তোমার এটা শোনাই দরকার। শুনে হয়তো আঘাত পাবে। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভরসা আছে। এত দিন ধরে দেখছি আঘাতে ভেঙে পড়বার মতো মেয়ে তুমি নও। তবু—বলে একটু থামলেন সুরমা।

হেনা স্থির কণ্ঠেই বলল, আপনি বলুন, সুরমাদি! আঘাত-টাঘাত আমার বড় একটা লাগে না।

সুরমা বললেন, অলোক এসেছিল। ওকে তুমি দেখ নি। আমার ছোট ভাই। একটু স্বদেশী-টদেশী করে।

হেনার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা, একবার মুখে এসে গিয়েছিল, তাঁকে দেখেছি আমি। তারপর আবার চেপে গেল। সুরমা বলে চললেন, ওকে বলেছিলাম বিকাশের খোঁজ নিতে। পরিচয় নেই ; তবু একই পথের পথিক তো। ঘনিষ্ঠ মহল থেকে ঠিক খবরই এনেছে। বিকাশ একটা চাকরি পেয়েছে, পাটনায়। মাঝে মাঝে কলকাতা আসে। আর—

হেনার একাগ্র মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিছু দিন আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের পার্টিরই মেয়ে। অনেক দিন থেকে জানা-শোনা।

হেনার মনে হল ঘরখানা যেন দুলে উঠল। চোখ বুজে চেপে ধরল তক্তপোশের কোণটা। সুরমা সস্নেহে ডান হাতখানা তার কাঁধের উপর রাখলেন। ধীরে ধীরে সান্ত্বনার সুরে বললেন, মেয়ে-মানুষের জীবন মানেই দুঃখের জীবন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুঃখ হল বঞ্চনা। সেই জন্যেই শক্ত হবার প্রয়োজন তাদেরই সবচেয়ে বেশী।

ততক্ষণে হেনা অনেকখানি সামলে নিয়েছে। অবিচল কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি শক্তই আছি, সুরমাদি!

আর বিশেষ কোনো কথা হল না। কয়েক মিনিট পরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিল হেনা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নক্ষত্র-বিরল অন্ধকার আকাশের দিকে। শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ রাত্রি। সহসা মনে পড়ে গেল এমনি একটা রাত। উঠোনের আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দীপ্তিময় চোখ ছুটো তার চোখের উপর তুলে মৃদু হেসে বলেছিল বিকাশ, আমি যদি কবি হতাম, তোমার এই চোখ ছুটো নিয়ে একটা কবিতা লিখতাম। হেনার মুখে এসে গিয়েছিল, ভাগ্যিস হন নি; তাই চোখ ছুটো আমার বেঁচে গেল। কিন্তু সে কথা সে বলতে পারে নি। তার আগেই কানে এসেছিল বিকাশের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ওরা যখন হাসে, মনে হয় রাত্রির বুকের ভেতর থেকে শিশির ঝরে পড়ছে।

আর একদিন। কিছুক্ষণ হল সন্ধ্যা হয়েছে। শুক্লপক্ষের একাদশী কিংবা তার কাছাকাছি কোনো রাত। বাসায় ফিরছিল বিকাশ। হেনা দাঁড়িয়ে ছিল ওদের খিড়কির দরজার পাশে। পরনে ছিল চাঁপাফুল-রঙের শাড়ি। খোঁপায় পরেছিল একটি অর্ধস্ফুট বাতাবি-ফুলের গুচ্ছ। সর্বাঙ্গে বাসন্তী জ্যোৎস্নার প্লাবন। কয়েক পা গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়াল বিকাশ। এক মিনিট তাকিয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে। তারপর বলল, তোমার এই নামটা কে দিয়েছিলেন হেনা?

—তা তো জানি না! বোধ হয় দাদা। কেন? সে কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?

—সব মানুষের বেলায় নামটা শুধু নাম; তোমার বেলায় ওটা পরিচয়।

আশ্চর্য! মুগ্ধকণ্ঠের এই সব বন্দনা সেদিন তার নারী-হৃদয়ে একটুও মোহ সঞ্চার করে নি। বুকখানা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আজ সেই কথাগুলো স্মরণ করে চোখ ছুটো জ্বলে জ্বলে উঠছে, চৈত্রের মধ্যাহ্নে অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেমন ঠিকরে পড়ে অগ্নিদাহ। মানুষ ভাবে, একটু যদি জল হত। একটু যদি কাঁদতে পারত হেনা।

কাঁদবে কেমন করে? সুরমাদি ভুল করেছেন। এ তো বঞ্চনার দুঃখ নয়, প্রবঞ্চনার অপমান। তাই চোখে জল নেই, আছে শুধু জ্বালা।

হেনা বাড়ি ফিরে দেখল, বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। অসময়ে খেয়ে এ বেলায় আর খিধে হয় নি এবং রাতে যে কিছু খাবেন না, সে কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। হেনাও সেজন্যে পীড়াপীড়ি করে নি। রোজকার মতো ওঁর উষাপানের ব্যবস্থা, অর্থাৎ এক গ্লাস জল বেরোবার আগেই টিপয়ের উপর রেখে গিয়েছিল। দরজার বাইরে থেকেই শোনা গেল তাঁর নাক-ডাকার শব্দ। ঘুমিয়ে পড়েছেন সদাশিব। রাখালকে খেতে দিয়ে নিজেও কিছু মুখে দিয়ে নিল। তারপর ঘরে গিয়ে সামান্য দু-একটা জামা-কাপড় খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। একটুখানি কী ভাবল। কলমটা হাতে নিয়ে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর নিশ্বাস। তারপর তাড়াতাড়ি করে লিখে গেল—

"বাবা, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে বলতে গেলে তুমি যেতে দেবে না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমারও হয়তো পা উঠবে না। তাই রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিবেশীরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন, হয়তো মনে মনে খুশী হবেন এই ভেবে যে, আমার মতো একটা কুলটা মেয়ের এইটাই স্বাভাবিক পরিণাম। তাঁরা কী ভাববেন, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমাব ভাবনা শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে ছেড়ে যাবার যে দুঃখ সেটা হয়তো একদিন সইতে পারব। কিন্তু তুমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও মনে কর, তোমার ওপর রাগ করে, অভিমান করে চলে গেছি, দূরে গিয়েও সে কষ্ট আমার সইবে না। না, বাবা, তোমার নামে দিব্যি করে বলছি, আমি রাগ করে যাচ্ছি না। যাচ্ছি, কারণ যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

তুমি যে কত বড় আঘাত পাবে সে কথা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? তবু আমাকে যেতে হল।

কোথায় যাব, সে কথা ভাবতে গেলে আর যাওয়া হয় না। আমাদের যারা আপনার জন, তাদের দরজা আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি, আমাদের খোঁজ-খবর না রাখলেও, আমার কলঙ্কের কাহিনী কাকীমাদের কানেও পৌঁছে গেছে। মামারাও হয়তো জানতে পেরেছেন আমার পরিচয়। আজ আমার জন্যে খোলা আছে শুধু অন্তহীন পথ। তারই আশ্রয় নিলাম।

এবার তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে, তাই বলে যাচ্ছি। আমার মাথার দিব্যি রইল, এর একটাও যেন ভুলে যেও না, কিংবা ফেলে রেখো না। সকালে উঠেই শম্ভুকে ডেকে পাঠিয়ো। আগের মতো এখানেই সে থাকবে। তোমাকে আর রাখালকে ছুটো রান্না করে দেবে। তারপর দু-চার দিনের মধ্যেই রাখালকে পাঠিয়ে পিসীমাকে আনিয়ে নিও। আমার ওপর তিনি খুশী নন বলে তুমি তাঁকে আনতে চাও নি। হয়তো চাইলেও তিনি আসতেন না। কিন্তু সেজন্যে তাঁর ওপর কোনো ক্ষোভ রেখো না। পিসীমার কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া তুমি তো জান, দাদা তাঁকে কথা দিয়ে এসেছিল। পিসীমা এসে থাকবেন, তোমার ভার নেবেন, এই ছিল তার শেষ ইচ্ছা।

আমার জন্যে ভেবে ভেবে শরীর খারাপ কোরো না। কিংবা মিছিমিছি খোঁজাখুঁজি করবার চেষ্টা কোরো না। যখন যেখানে থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, তোমার মঙ্গল আশীর্বাদ চিরদিন আমাকে রক্ষা করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে চললাম।

আমার সব অপরাধ ক্ষমা কোরো।

তোমার হেনা।"

পুনশ্চ দিয়ে লিখল, "হাত-বাক্সের চাবিটা আমার বালিশের নিচে রেখে গেলাম। সংসার খরচের বাকী টাকাটা ওর মধ্যেই রইল। না, বাবা, আমি খালি হাতে যাচ্ছি না। ক বছর থেকে পুজোর সময় তোমার কাছ থেকে পার্বণী পেয়েছি, তার সবটাই এত দিন

জমিয়ে রেখেছিলাম। সামান্য হলেও এটাই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ।”

আরেকখানা কাগজ নিয়ে রাখালকে লিখল—“রাখাল, ভাই লক্ষ্মী হয়ে থেকো। মামাবাবুর অবাধ্য হোয়ো না। তাঁকে সব সময়ে চোখে চোখে রেখো। তাঁর মত করিয়ে যত শীগগির পার, পিসীমাকে নিয়ে এসো। আমার কথা নিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কোরো না। যে যাই বলুক সয়ে যেও। মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো। একদিন যেন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পার। সেই আশা নিয়েই দাদা তোমাকে নিয়ে এসেছিল, এ কথা কোনো দিন ভুলো না।

দিদির জন্যে কোনো দিন দুঃখ কোরো না।

—দিদি”

আলাদা খামে চিঠি দুটো বন্ধ করে বাবার ঘরের সামনের বারান্দায় যে মোড়াটা আছে তার উপর চাপা দিয়ে রাখল। সকালে উঠে ঐখানে বসে সদাশিব রোজ তামাক খেয়ে থাকেন। আর একবার বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে শুনতে পেল নিয়মিত নিশ্বাসের শব্দ। তারপর কপাটের উপর মাথা ঠেকিয়ে বাবার উদ্দেশে শেষ প্রণাম রেখে খিড়কির দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। চার দিকে নিঃসাড় নিঝুম। পাতলা কুয়াশার আবরণের নিচে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িগুলো। শরৎ-রাত্রির সিক্ত বাতাস কোথা থেকে বয়ে নিয়ে এল এক ঝলক শিউলির গন্ধ। আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে স্টেশনের পথে পা বাড়াল হেনা। কয়েক পা এগিয়ে একবার ফিরে চাইল সেই ফেলে-আসা ঘরগুলোর দিকে। জন্মভূমি না হলেও ওখানেই কেটেছে তার অনেকগুলো বছর। ঐ বাড়িতেই তার মা শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন ; ওখান থেকেই দাদা তার শেষ যাত্রায় বেরিয়েছিল। আজ সে-ও চলল। হয়তো তারও এটা শেষ যাত্রা। হঠাৎ বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। কোথা থেকে ছুটে এল একরাশ চোখের জল। ঝাপসা হয়ে গেল

পথের রেখা। আঁচলে চোখ মুছে আর কোনো দিকে না চেয়ে পা চালিয়ে উঠে পড়ল বড় রাস্তায়।

ঘণ্টাখানেক পরেই বাহাদুরনগরের ঘাট ছেড়ে মেল স্টীমার ছুটে চলল খুলনার পথে।

সমস্ত রাতটা কেটে গেল এলোমেলো নানা চিন্তায়। তারপর কখন একটু তন্দ্রামত এসেছিল, হেনা জানতে পারে নি। হঠাৎ তীব্র বাঁশির শব্দে জেগে উঠে দেখে সকাল হয়ে গেছে। একটা কী স্টেশনে খানিকক্ষণ থেমে আবার চলতে শুরু করল স্টীমার। মেয়ে-কামরার সামনে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে সে-ও উঠে গিয়ে দাঁড়াল সেই রেলিংএর ধারে।

ভাঙন পাড় ঘেঁষে স্টীমার চলেছে। বড় বড় গাছগুলো ঝুলে আছে। যে কোনো মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, তলিয়ে যাবে রাক্ষসী আড়িয়ালখাঁর অতল গর্ভে। বাঁশবনের ফাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে একটা টিনের চালা কিংবা খড়ো চালের চূড়া। ক্ষণেকের তরে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। হঠাৎ দাদাকে মনে পড়ল। এরই কোনোখানে দুর্দান্ত নদীর কোন আবর্তের মাঝে সে হারিয়ে গেছে, তার এতটুকু চিহ্নও কোনো দিন কেউ খুঁজে পাবে না। আস্তে আস্তে কখন এক সময়ে তার চোখের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে গেল সামনেকার ঐ বনশ্রেণী, ঐ ভেঙে-পড়া পাড়, ঐ গৃহস্থের কুটির, ঐ চলন্ত নৌকার সারি। সব ছাপিয়ে জেগে উঠল তারই জীবনের কত খণ্ড খণ্ড চিত্র। বার বার করে দেখা দিল বাবার শীর্ণ মুখখানা। তার উপর জ্যোতিহীন ক্লান্ত দুটি চোখ, দুঃখে, শোকে, বেদনায় পরিম্লান।

এই তো সেদিনের কথা। জ্বরে পড়েছিলেন সদাশিব। চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন নির্জীবের মতো। হেনা আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর ভাবছিল, বাবা যদি তাড়াতাড়ি সেরে না ওঠেন, কী করবে সে, কেমন করে সামলাবে সব দিক। সদাশিব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কী ভাবছিস, মা।

—কিছু না বাবা, তুমি ঘুমোও।

—আমার এখন ঘুম পাচ্ছে না। তুই আর কতক্ষণ বসে থাকবি। এবার ওঠ ; বাইরেটা একটু ঘুরে আয়।

হেনা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, মেয়ে না হয়ে আমি যদি তোমার ছেলে হতাম ? সদাশিবের মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভীত কণ্ঠে বললেন, না, মা, কাজ নেই তোর ছেলে হয়ে। ছেলে তো আমায় দিয়েছিলেন ভগবান। কী লাভ হল ? বুড়ো বাপের মুখের দিকে তাকাল একবার ? ঘর ছেড়ে পরের পানে ছুটল। প্রাণও দিল সেই পরের জন্যেই। না, না। ছেলে চাই না আমি। তুই মেয়ে হয়েই থাক আমার কাছে।

হেনা হেসে বলেছিল, এ তোমার উলটো কথা হল, বাবা ! মেয়েই তো সব চাইতে পর। কাছে থেকেও ভার, দূরে গিয়েও ভাবনা। বুড়ো বাপ খেটে মরছে, একদিন একটু বিশ্রাম নেবার অবসর নেই, তখন কোন কাজে লাগে সে ? মেয়ে কি কোনো দিন বলতে পারে, বাবা, তুমি একটু জিরিয়ে নাও ; তোমার বোঝাটা আমি কাঁধে তুলে নিলাম ?

সদাশিব মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালেন, সেটা তো মেয়ের কাজ নয়, মা ! বাপের বোঝা না বইলেও, অনেক কিছুই তাকে বইতে হয়। আর কিছু যদি না-ও করে, শুধু একটুখানি তাকায় তার মুখের পানে, হাতখানা বুলিয়ে দেয় বুকের ওপর, বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় তার ব্যথা, কিসের তার অভাব, সেই কি কম ? সংসারে তার দাম যে কত, আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

বলে, হেনার হাতখানি টেনে নিয়েছিলেন বুকের উপর। সেই নিঃস্ব, অসহায় মানুষটিকে একা ফেলে রেখে সে চলে যাচ্ছে! তাঁকে দুঃখের হাত থেকে, অপবাদ-লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাবার আর কোনো পথ নেই ! কে জানে, বাবার সঙ্গে হয়তো এই তার শেষ দেখা। আবার ঝাপশা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি।

সকালের দিকে ট্রেন যখন শেয়ালদর কাছাকাছি এসে পড়েছে, পাশ থেকে একটি বর্ষীয়সী মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাবে, বাছা ? হেনা বসেছিল বাইরের দিকে মুখ করে। হঠাৎ চমকে উঠল, তাই তো কোথায় যাবে, সে তো জানে না ! কিন্তু উত্তর একটা দিতেই হবে। বলল, পটলডাঙা।

—কে আছেন সেখানে ?

—আমার কাকীমার বাড়ি।

—তোমার সঙ্গে কোনো ব্যাটাছেলে নেই ?

—না।

—একলা যাবে কেমন করে ?

—স্টেশনে আমার দাদা আসবে।

মহিলাটি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু তাঁর ঐ একটি কথাতেই হেনার সংবিৎ ফিরে এল। সমস্ত মনটা জুড়ে মাথা তুলে উঠল ঐ একটি প্রশ্ন—তাই তো, কোথায় যাবে সে ? কাকীমার বাড়ি যাওয়া হবে না। কালীঘাটে মামাবাড়ির কারা সব থাকেন ; সেখানেও ওঠা অসম্ভব। ছেলেবেলা একবার মাত্র এসেছিল কলকাতায়। সে কথা ভালো করে মনেও পড়ে না। চেষ্টা করলে তার মতো মেয়েরা কোনো আশ্রম-টাশ্রমে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় পেতে পারে, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছুই সে ভেবে দেখে নি। সেই ভাবনাই এখন আসন্ন সমস্যার রূপ নিয়ে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সম্ভব, অসম্ভব অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল অতসীর কথা। বছর দুই আগে বাহাদুরনগরে তার বাবা ছিলেন সাব-রেজিস্ট্রার। ওখানে থাকতেই তার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। বড় ভাব ছিল হেনার সঙ্গে। যাবার সময় গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কোলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই যাবি কিন্তু। নইলে এ জন্মে তোর মুখ দেখব না। ঠিকানাটাও বলেছিল বার বার করে। এখনো মনে আছে—২২।৭ বৈঠকখানা রোড।

শেয়ালদ স্টেশনের কাছেই—বলেছিল তার বর। ভদ্রলোক ভারী লাজুক। অতসীর পেছনে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে বলে ফেলেছিল, নেমন্তন্নটা কিন্তু দুজনের তরফ থেকেই রইল। ওদের ওখানে উঠলে কেমন হয়? তারপর ওরাই হয়তো একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে আবার ভাবনায় পড়ল হেনা। অগণিত মানুষের মিছিল। অসংখ্য গাড়িঘোড়ার স্রোত। সবাই ছুটে চলেছে নিজের ধান্দায়। কারো দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই। চলতে চলতে দু-একজন শুধু তাকিয়ে গেল মুখের দিকে। কৌতূহলহীন নির্বাক দৃষ্টি। হেনা এতকাল জানত, মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে হলে চাই নির্জনতা। আজ প্রথম অনুভব করল, এই জনারণ্যই হচ্ছে গাঢ়তর আবরণ, যার নিচে আরো স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকা যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে এই সব কথাই বোধ হয় ভাবছিল।

"কাঁহা যাইবো দিদি?" চমকে উঠল। গলাটা যেন ওদের থানার সিপাই বলরাম সিংএর মতো। সে-ও ওকে দিদি বলে ডাকত, আর কথাও বলত ঐ রকম ভাঙা বাংলায়। তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো রিক্‌শাওয়ালা। মুখ দেখেই বোঝা যায় সকাল থেকে কোনো সওয়ারী জোটে নি। হেনা বলল, বৈঠকখানায় যাব।

—উঠ্ যাও। একটা সিকি বউনি লিব।

হেনা উঠে বসল।

নম্বর দেখে দেখে ২২।৭ বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল। খুলে দিল একটি বৌ। কাকে চাই? হেনা জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

—ওমা, তুই কোত্থেকে? বলে, ওর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল অতসী।

—দুজনে মিলে নেমন্তন্ন করে এসেছিলি। তাই এলাম।

—ঈশ! অল্পের জন্যে তোর সঙ্গে দেখা হল না। এই দশ মিনিট হল বেরিয়ে গেল।

—কোথায় গেলেন?

—বর্ধমান। বদলি হয়ে গেছে এই তিন মাস।

—তাহলে এখন বিরহের পালা?

—বিরহ না ছাই! একটা শনিবারও বাদ যায় না। কিন্তু—হেনার সিঁথির দিকে তাকিয়ে বলল অতসী—তোর মতলবটা কী বল তো? যোগিনী সেজেই থাকবি নাকি চিরকাল?

হেনা তেমনি হাসতে লাগল। অতসী জিজ্ঞাসা করল, কার সঙ্গে এসেছিস?

—কারো সঙ্গে নয়; একা।

—কে, বৌমা? বলে, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি প্রৌঢ়া বিধবা। অতসী ফিসফিস করে বলল, শাশুড়ী। তারপর জবাব দিল, আমার সই হেনা।

হেনা এগিয়ে গিয়ে মহিলাটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তিনি ওর চিবুক স্পর্শ করে বললেন, এসো মা! কোত্থেকে আসছ?

—বাহাদুরনগর।

—ও, তোমার বাবা যেখানে ছিলেন? প্রশ্ন করলেন অতসীকে।

সে মাথা নাড়ল।

—ওখানেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

—না, আমার বাবা ওখানে চাকরি করেন।

—কী চাকরি?

—পোস্টমাস্টার।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হেনার দিকে। তারপর পুত্রবধূকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, এর কথাই না তোমার বাবা সেদিন বলে গেলেন?

অতসী চাপা গলায় বলল, বাবা তো নিজে কিছু জানেন না।

আমরা ওখানে থাকতে একজন কেরানী ওঁর কাছে কাজ করত। কথায় কথায় কী সব ছাইভস্ম বলে গেছে। লোকটা ভালো নয়। ওর কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

—না, বৌমা। যা রটে, তার কিছুটা তো বটে।

অতসী তেমনি ফিসফিস করে বলল, আস্তে বলুন। শুনতে পাবে।

কিন্তু তার শাশুড়ী-ঠাকরুনের গলাটা একটু বরং চড়েই গেল। বললেন, ওকে যেন রান্নাঘরে-টরে নিয়ে বসিও না। ওখান থেকেই দু-চার কথা বলে বিদায় করে দাও। আর আমার কাপড়টা দিয়ে এসো কলতলায়। বলে, তিনি বোধ হয় আর-একবার স্নানের উদ্দেশে সেই দিকেই চললেন।

অতসী ফিরে আসতেই হেনা উঠে পড়ে বলল, এবার চলি, কেমন? তোর কত্তাকে—

অতসী খপ করে তার হাতটা চেপে ধবে দৃঢ়স্বরে বলল, না।

হেনা ম্লান হেসে বলল, পাগল! নে, ছাড়। বেলা হল।

—না, ছাড়ব না। অন্তত আজকের দিনটা তোকে থেকে যেতে হবে।

—মাথা খারাপ কবিস নে অতসী, গম্ভীব সুরে বলল হেনা।

—না, হেনা, মাথা আমার ঠিকই আছে। তুই যদি সত্যিই চলে যাস, বুঝব, আমাদের এতদিনের ভালোবাসা সব ভান, সব ভুয়ো।

হেনা ভাবতে লাগল। হঠাৎ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল অতসী, ও হরি! একটা জিনিস তো তোকে দেখানোই হয় নি—বলেই ছুটে গিয়ে ঢুকল ওদিকের একটা ঘরে। যখন ফিরল, কোলে তার বছর-খানেকের ঘুমন্ত মেয়ে, যেন একরাশ কুন্দফুল। হেনার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'কেমন হয়েছে, বল দিকিন?' হেনা কিছুই বলতে পারল না। নেতিয়ে-পড়া বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

শাশুড়ী আর উচ্চবাচ্য করলেন না। রান্না-খাওয়া সেরে নিজের

ঘরে চলে গেলেন। তারপর দুই সখীতে পাশাপাশি খেতে বসে খুলে দিল গল্পের ভাণ্ডার।

বিকালের দিকে হেনা বসে ছিল বারান্দায়। অতসী গেছে কলতলায় গা ধুতে। হঠাৎ উঠোনের ওদিকটায় একখানা ঘর থেকে কেমন একটা কাতরানির শব্দ কানে এল। মেয়েমানুষের গলা। আওয়াজটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। হেনা ব্যস্ত হয়ে উঠল। অথচ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় একজন ঝি ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল গেটের দিকে। হেনার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ব্যথা উঠেছে সেই সকাল থেকে। প্রথম হচ্ছে কি না। হলে অ্যাদ্দিনে তিন-চারটা হতে পারত। কষ্ট তো একটু হবেই বাছা! বলছে, আমার দম আটকে আসছে। আমি এখন কী করি বলো তো? বাবু গেছে ডাক্তার ডাকতে। বাড়িতে দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই।

—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

—কোথায় আর যাব! দেখছিলাম, বাবু আসছে কি না।

—চলো তো, দেখি।

—তুমি যাবে? এসো, বাছা এসো। তুমি বুঝি এদের কেউ হও?

—হ্যাঁ, চলতে চলতে বলল হেনা।

—ওরাও এদেরই ভাড়াটে। একখানা ঘর নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে থাকে। আমি ঠিকে কাজ করি। বাবু বলল, তুমি একটু বোসো, বাতাসীর মা। আমি যাব আর আসব। তা, আর ফেরবার নাম নেই। আমার কি এক জায়গায় বসে থাকলে চলে?

বৌটি তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হেনা কাছে গিয়ে বসতেই ঘোলাটে চোখ দুটো ওর মুখের উপর তুলে বলল, উনি এখনো এলেন না?

—এই তো এখনই এসে পড়বেন। আপনার কী কষ্ট হচ্ছে বলুন?

—দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিশ্বাস ফেলতে পারছি না। আর—বাকী কথাটা আটকে গেল।

—থাক ; চুপ করুন। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এখুনি কমে যাবে।

খানিকটা শুশ্রূষার পর বৌটি অনেকখানি আরাম বোধ করল। হেনার হাতখানা চেপে ধরে বলল, আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে না, বলো ?

—না, না, আপনি সুস্থ হোন। আপনার খোকা না দেখে আমি যাচ্ছি নে।

বৌটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তোমাদের কথা আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। অতসী বড় ভালো মেয়ে। কিন্তু বুড়ীটা দজ্জাল। তুমি ওখানে থাকতে পাববে না, ভাই !

হেনা চমকে উঠল। কিন্তু ওকে সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল, আমি তো ওখানে থাকতে আসি নি। সে যাক গে। আপনি আর কথা বলবেন না।

হঠাৎ একটা দমকা ব্যথায় বৌটি আর্তনাদ কবে উঠল। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তারও এসে পড়লেন। পিছনে তাব স্বামী। রোগিণীকে পরীক্ষা করে বললেন, একে এখনই কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালের নাম শুনে বৌটি কান্না শুরু করল। তার স্বামী অনেক করে বোঝালেন, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, বিনু ! খুব ভালো হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তোমাব কোনো কষ্ট হবে না। কিন্তু বিনতার সেই এক উত্তর—মরি তো এখানেই মরব। হাসপাতালে যাব না।

ডাক্তার তার পাশে বসে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসপাতালে যেতে আপনার আপত্তি কিসের? ছোঁয়া-মেলাব বাছবিচার নেই বলে ?

—না। ও-সব আমি মানি না।

—তবে ?

এ কথার উত্তর দিলেন তার স্বামী। বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা তারা যে আমাকে কাছে থাকতে দেবে না।

—এই ব্যাপার! মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার, তাহলে নিয়ে চলুন আমার নার্সিং হোম-এ। সেখানে কাছে থাকায় কোনো বাধা নেই।

স্বামীটি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তারপরেই শুষ্ক মুখে বললেন, কিন্তু ওখানকার খরচপত্তর আমার সাধ্যের—

—আহা, চলুন না? খরচের জন্যে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বলেই আর-এক বার তাড়া দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার সেন।

বিনতা রাজী হল। কিন্তু জিদ ধরে বলল, হেনাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে। স্বামীর দিকে ফিরে বলল, ও আমার আর জন্মের বোন। হঠাৎ কোত্থেকে এসে পড়ল। তা না হলে, তোমরা এসে আমাকে দেখতে পেতে? কখন মরে পড়ে থাকতাম।

হেনা পড়ল মহা সমস্যায়। নিতান্ত অপরিচিত একটি মেয়ের এই অদ্ভুত আবদার দেখে একটু বিরক্তও হল মনে মনে। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? সেখানে কত ভালো নার্স আছে। তারাই আপনাকে দেখবে। আমার কোনো দরকার হবে না। আমি বরং পরে গিয়ে আপনাকে আর আপনার খোকাকে দেখে আসব।

বিনতার স্বামীও অনেক করে বোঝালেন। শেষের দিকে একটু বিরক্তির সুরেই বললেন, ওঁকে আর কত কষ্ট দেবে? নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবেন তোমার সঙ্গে? আর ওঁর অভিভাবকরাই বা যেতে দেবেন কেন?

বিনতা কোনো উত্তর করল না। সে অবস্থাও তার নয়। কিন্তু হেনার হাতখানা সে কিছুতেই ছাড়ল না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক অনুনয়ের সুরে বললেন হেনার দিকে চেয়ে, আপনার যদি একান্ত অসুবিধা না হয়, ওর মুখ চেয়ে আর-একটু দয়া করুন। একবারটি চলুন আমাদের সঙ্গে। পরে সুবিধা বুঝে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। দেরি করলে ওকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না।

এর পরে আর আপত্তি করা চলে না। মোটামুটি ব্যাপারটা দেখে এবং শুনে অতসীও সায় দিল।

তার পর ছত্রিশ ঘণ্টা যমে-মানুষে টানাটানির পর বিনতা বেঁচে উঠল। যম তাঁর দাবি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আর-একটা জীবনের বিনিময়ে। মায়ের জন্যে প্রাণ দিল তার অনাগত সন্তান। শিশু ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু পৃথিবীর আলোয় চোখ খুলল না। পৃথিবীর বাতাসে পড়ল না তার প্রথম নিশ্বাস। বৃদ্ধ ডাক্তার সান্ত্বনা দিলেন। সেই চিরন্তন সান্ত্বনা—যে যাবার, সে যাবেই। তার জন্যে দুঃখ কোরো না, মা! গাছের সব কটা ফল কি টিঁকে যায়?

হাসপাতালের মেয়াদ যেদিন শেষ হল, ডাক্তার এলেন দেখা করতে। ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনতা প্রণাম করে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, ডাক্তারবাবু!

—বেশ তো, বলো।

—হেনাকে তো আপনি ক-দিন ধরেই দেখলেন। ওকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।

হেনা একটা কী হাতে করে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। নিজের নাম কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না, বোধ হয় ভাবতে লাগলেন। বিনতা আবার বলল, ও আমার সত্যিকার বোন নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী। সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। ও আমার জন্যে যা করেছে, বোন কেন, মা-ও তা করত না। ওর আপনার জন কে আছেন, না আছেন, আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি, যে কারণেই হোক, কোথাও ওর যাবার জায়গা নেই। আমার একখানা ঘরের সংসারে ওকে নিয়ে যেতে পারি না। পারলেও ও যেতে চাইবে না। কারো গলগ্রহ হয়ে থাকবার মেয়ে ও নয়। এখানে আপনার কত রকমের কাজ। তারই মধ্যে একটা সংস্থান যদি ওর জন্যে করে দিতে পারেন, একটা মেয়ে বেঁচে যায়।

ডাক্তারের কথা শোনা গেল, এই ক-দিনে যা দেখলাম, মেয়েটি সত্যিই আশ্চর্য! কিন্তু ওর করবার মতো কোনো কাজ তো আমার এখানে দেখি না।

—নার্সের কাজ-টাজ?

—নার্স যে ক-জন দরকার, আমার আছে। তা ছাড়া, নার্সিং করতে হলে ও লাইনে কিছুটা পড়াশুনো আর খানিকটা ট্রেনিংও দরকার। তা না হলে চলে না। আমার এখানে একজন ঝিয়ের দরকার ছিল। কিন্তু সে কাজ তো ওকে দেওয়া যায় না?

—না, না, ছিঃ। ঝিয়ের কাজ ও করতে যাবে কেন? তা হলে, আপাতত আমিই ওকে বলে-কয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু আপনার ভরসাতেই থাকব।

ডাক্তার কী বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে হেনা ঘরে ঢুকে পড়ল। বিনতা বলল, অনেক দিন বাঁচবি। এই মাত্র তোর কথাই বলছিলাম ডাক্তারবাবুকে।

হেনা বলল, আমি সব শুনে ফেলেছি দিদি, যদিও আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কথা শোনা অন্যায়। কিন্তু আমার যা অবস্থা, ও-সব ভাবতে গেলে চলে না।

ডাক্তারের দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আপনার ঐ ঝিয়ের কাজটাই আমাকে দিতে হবে, ডাক্তারবাবু! আমি খুব করতে পারব।

—কী বকছিস পাগলের মতো, ধমকের সুরে বলল বিনতা।

—না, দিদি, তুমি আপত্তি কোরো না। ঝিয়ের কাজ মানে. বাসন-মাজা, বাটনা-বাটা, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, বিছানাপত্তর তোলা-পাড়া, এই তো? ও-সব আমার অভ্যাস আছে। বাড়িতে সবই তো আমাকে করতে হত।

ডাক্তার হেসে ফেললেন, তুমি ভুল করছ। এটা অভ্যাস আর পারা না-পারার ব্যাপার নয়।

—আপনি যা বলতে চান আমি বুঝতে পেরেছি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হেনা। সে সব ভেবেই বলেছি, মন আমার তৈরী আছে। কাজকে কাজ বলেই দেখব। মান-মর্যাদার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলে আপনাকে বিব্রত করব না। আপনি যদি আমার সব কথা জানতেন, তাহলে বুঝতেন, ও সব বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালে আমার চলে না। ঘর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ও সব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

কথাগুলো হালকা সুরেই বলতে চেয়েছিল হেনা। কিন্তু শেষের দিকে স্বরটা কেমন গভীর হয়ে উঠল। হঠাৎ লক্ষ্য করল, ডাক্তার এবং বিনতা দুজনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

শেষ পর্যন্ত দুজনকেই মত দিতে হল। মনোরমা নার্সিং হোম-এ ঝিয়ের কাজে বহাল হল হেনা মিত্র। এই ঘরগুলোর মধ্যেই মনোরমা সেন একদিন স্বামী-পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার পেতেছিলেন। তৃতীয় সন্তানের জন্মের সময় সেই সাজানো সংসার থেকে হঠাৎ তাঁকে বিদায় নিতে হল। ধাত্রীবিদ্যায় অতবড় দিকপাল হয়েও ডাক্তার সেন নিজের স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলেন না। মা হতে গিয়ে এ রকম কত মেয়েকেই তো অকালে চলে যেতে হয়। ডাক্তার মানুষের সে জন্য দুঃখ করা চলে না। কিন্তু মনোরমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হাসপাতাল এবং চিকিৎসার কতকগুলো ত্রুটি, এই ক্ষোভটা ডাক্তার সেন কোনো দিন ভুলতে পারেন নি। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলে পড়াশুনো শেষ করে চাকরি পেয়ে চলে গেল দিল্লী। মেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিলেন। বাড়িটা যখন ফাঁকা হয়ে গেল, তেতলার দুখানা ঘর নিজের জন্যে রেখে, বাকী সবটা জুড়ে গড়ে তুললেন এই নার্সিং হোম। প্রসূতি এবং নানা জটিল স্ত্রীরোগে যারা ভোগে তারাই এখানকার অধিবাসিনী। এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নীর নামটা যুক্ত করে তাকে

অমরত্ব দান করবেন, এ রকম কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। এখানে যারা আসবে, তারা মনোরমার মতো কেউ যেন অযত্নে, অবহেলায় কিংবা অব্যবস্থায় প্রাণটা না দেয়, এই কথাটা সর্বক্ষণ মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার জন্যে এই নামকরণ।

যে ঝিয়ের জায়াগায় হেনাকে বহাল করা হল, এখানে তার কোনো থাকবার ব্যবস্থা ছিল না। সে তার নিজের বাসা থেকেই আসা-যাওয়া করত। কিন্তু হেনার প্রথম প্রয়োজন আশ্রয়। দোতলার কোণের দিকে একখানা ছোট ঘর থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে তার থাকবার জায়গা করে দেওয়া হল। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া জাতীয় মোটা কাজগুলো ছিল অন্য ঝিদের ভাগে। রুগীদের খাওয়ানো, পরানো এবং অন্যান্য ফাইফরমাস মেটানো, এই সব পড়ল হেনার হাতে। নার্সদের কাজ রুটিন দিয়ে বাঁধা। সেটা তাদের 'ডিউটি'। কিন্তু রুগ্ন মানুষের প্রয়োজন রুটিন মেনে চলে না। নার্সের ঘড়িধরা নির্দিষ্ট সীমার বাইরেও খানিকটা সেবা, খানিকটা পরিচর্যার ক্ষেত্র পড়ে থাকে, রুগীর কাছে যার মূল্য অনেক। হেনার সঙ্গে নার্সিং হোম-বাসিন্দাদের যোগ ছিল সেইখানে। এই মেয়েটি যে তাদের আপনার কেউ নয়, হাসপাতালের লোক, এ কথা তারা প্রায়ই ভুলে যেত, সে-ও মনে করিয়ে দিত না।

সাফারিং হিউম্যানিটি বলে একটা কথা হেনা কোনো বইতে পড়ে থাকবে। নিজের চোখে না দেখলেও দাদার কাছে শুনে শুনে এ সম্বন্ধে একটা ছবি তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার যেমন শেষ নেই, তার বৈচিত্র্যও তেমনি অন্তহীন। জরা, ব্যাধি, অভাব, দারিদ্র্য তার নিত্যসহচর। তার উপরে মাঝে মাঝে দেখা দেয় নির্মম প্রকৃতির দুর্জয় রোষ—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূমিকম্প। মানুষ পঙ্গপালের মতো প্রাণ দেয়, কিংবা অসহায় পশুর মতো বনে-জঙ্গলে উন্মুক্ত আকাশতলে পড়ে ছটফট করে। বিধাতার দেওয়া এই যে দুঃখের পসরা তাকে বইতে হয়, তার মধ্যে নারী-পুরুষের সমান

অংশ। এই সেবা-নিবাসে এসে হেনার চোখে পড়ল দুঃস্থ এবং আর্ত মানুষের আর-একটা রূপ। সেখানে নারী একা। এ সংকট তার নারী-জন্মের সংকট। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই মা হবার দায় মেনে নিতে হবে। মাতৃত্ব তার গৌরব, আবার এই মাতৃত্বই তার অভিশাপ। সন্তানের জন্মলগ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জননীর মৃত্যুযোগ। মা হতে যে এল, তার এক চোখে থাকে আশার আলো, আরেক চোখে মরণের ছায়া। কেউ জানে না, সে আলোছায়ার খেলায় কে জিতবে আর কে হারবে! বরাভয় নিয়ে যিনি শিয়রে এসে দাঁড়ালেন, যত বড় ধন্বন্তরিই হোন না কেন, তিনিও শিশুর মতো অজ্ঞ এবং অসহায়। তাই, হয়তো দেখা গেল সূতিকাগৃহের দুয়ারে উৎসবের দীপ জ্বলতে গিয়ে জ্বলল না, শুভ শঙ্খ বাজতে গিয়ে থেমে গেল। মা হওয়ার স্বপ্ন আর বেদনা নিয়ে যে এল, সে ফিরে গেল রিক্ত হস্তে। কারো হয়তো ফিরে যাওয়া আর হল না, ডাক এল কোন অজানা দেশের। শূন্য শয্যায় অনাদরে পড়ে রইল মাতৃঘাতী শিশু।

কিন্তু আরোগ্য-নিবাসের এ শুধু একটা দিক। এরই পাশাপাশি রয়েছে সফল মাতৃত্বের পরিপূর্ণ রূপ। সেখানে নবজাতকের কান্নার শব্দে মৃতপ্রায় জননীর দেহে ফিরে আসে জীবনের স্পন্দন। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের উপর মিলিয়ে যায় যন্ত্রণার রেখা। দু চোখ ভরে দেখেছে হেনা, তরুণী মা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে কম্পমান হাত দুটি বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে তার সদ্যোজাত প্রথম সন্তান। যার হাত ওঠে নি, ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে সলজ্জ মুখে, কেমন হয়েছে খোকা? নিজের বুকের ভিতর থেকে সেই ক্ষুদ্র কোমল পুতুলটিকে মায়ের কোলে তুলে দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছে হেনা, চাঁদের মতো ছেলে হয়েছে আপনার। এই দেখুন না?

বাইরের 'কল' এলে হেনাকেও মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ডাক্তার সেন। প্রয়োজন বুঝে কোথাও কোথাও ওরই হাতে পড়ত প্রসূতিকে দাঁড় করিয়ে দেবার ভার। এমনি একটা বাড়িতে ক-দিন

ওকে কাটাতে হয়েছিল। সে দৃশ্য আজও চোখে লেগে আছে। বাগবাজারের একটি বস্তি। প্রসব করিয়ে ডাক্তার চলে গেছেন। তার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। ছেঁড়া কাঁথার উপর পড়ে আছে প্রসূতির রক্তহীন জীর্ণ দেহ। বাড়ি-ঘরের অবস্থা তার চেয়েও জীর্ণ। জাতকের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে মানুষের ছেলে নয়, পাখির ছানা। সেই ক্ষীণপ্রাণ জীবটিকে কোলে নিয়ে পলতে করে একটু মিছরির জল খাওয়াবার চেষ্টা করছিল হেনা। হঠাৎ কান্নার রোল কানে যেতেই পেছনে তাকিয়ে দেখে, একটি ঐকতান প্রসেশন। সকলের সামনে যেটি, তার বয়স বোধ হয় সাড়ে তিন, তার পিছনে দুই, তার পিছনে বাবার কোলে চড়ে যেটি সবচেয়ে বেশী আস্ফালন করছে, সে বোধ হয় একের কোঠা পেরোয় নি। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর নিস্পন্দ দেহের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বললেন, 'কোনোটাকেই তো ঠেকাতে পারছি না।' কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামী এবার সুর চড়ালেন, 'চুপ করে থাকলে চলবে কেন? এগুলোকে কে সামলায়? দুটো ভাত তো গেলাতে হবে।'

হেনা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি বলছেন কী? উনি কী করে ভাত খাওয়াবেন এই অবস্থায়? ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, কী করব, বল। আমরা তো আর বড়লোক নই যে দু-চারটা ঝি-চাকর রাখব। একার সংসারে—তার কথা শেষ হবার আগেই একটা ক্ষীণ সুর বেরিয়ে এল সেই কঙ্কালের মুখ থেকে, খোকাকে ওখানে বসিয়ে দিয়ে এক থালা ভাত দিয়ে যাও।

ভদ্রলোক চলে গেলে হেনার দিকে তাকিয়ে বলল বৌটি, আমি চাই নি ভাই! এর একটাকেও চাই নি। সবগুলো যদি একদিনে শেষ হয়ে যেত, আমি বাঁচতাম।

—ওদের কী দোষ! রুক্ষ স্বরে বলে উঠল হেনা।

—না ভাই, দোষ ওদের নয়, দোষ বিধাতার। সে যে চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। যে বইতে পারে না, তারই মাথায় চাপিয়ে

দেয় বোঝা। আর যে পারে,—কিছু মনে কোরো না ভাই, তুমি কুমারী মেয়ে, কিন্তু তোমাকে দেখে তখন থেকে ভাবছি, ছেলে পেটে ধরা তোমার মতো মেয়েকেই মানায়। তোমার চোখ-মুখ-বুক, হাত ছুখানা, তোমার প্রতিটি অঙ্গ যে মা হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। —বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

এর কদিন পরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল হেনা। ফুটফুটে মেয়ে কোলে করে বসে আছে তাদের বাহাত্বরনগরের বাড়ির বারান্দায়। তার পিঠের কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিকাশ। মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুকুর নাম রেখেছ?

—বাঃ, আমি রাখব নাকি নাম? সলজ্জ হাসি হেসে বলে উঠল হেনা।

—বেশ, তাহলে আমিই রাখছি। ওর নাম রইল মঞ্জরী। হেনার মঞ্জরী। কবিগুরুর লাইন।

যখন ঘুম ভাঙল, লজ্জায় ঘৃণায়, অস্বস্তির তাড়নায় সে যেন নিজের কাছে নিজেই মুখ দেখাতে পারছিল না। পরের দিনও কোনো কাজে মন দিতে পারে নি। ছিঃ ছিঃ, এ কী স্বপ্ন দেখল সে! উন্মত্ত কল্পনায় যা কখনো ভাবতেও পারে নি, তাও কি কোনো দিন স্বপ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে? তবে কি নিজের অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের গভীরতম তলদেশে এমনি কোনো অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা বুদ্‌বুদের মতো জেগে উঠেছিল ক্ষণেকের তরে? উঠেই আবার মিলিয়ে গেছে, সে জানতে পারে নি? তাই যদি হয়, নিজের কাছে তার অপরাধের সীমা নেই।

অনেক দিন পরে বাবার কথা মনে করে বুকের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কে জানে কেমন আছেন তিনি? কত দিন মনে হয়েছে একটা চিঠি লিখে খবর নেবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেও ছু-একবার। ছু-এক লাইন লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। না; চিঠি লেখবার পথ তার বন্ধ হয়ে গেছে। খবর পেলেই তিনি ছুটে আসবেন। এসে

দেখবেন, তাঁর হেনা আজ হাসপাতালের ঝি। সে আঘাত সইতে পারবেন না। তার চেয়ে এই ভালো। কেউ নেই তার। স্বজন বান্ধব সকলের নাগালের বাইরে, সে একা। হঠাৎ সুরমাদিকে মনে পড়ে গেল। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। কুঁজো থেকে খানিকটা জল নিয়ে দু-চোখে ঝাপটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল রুগীদের ওয়ার্ডে। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভুলতে চেষ্টা করল সেই ফেলে-আসা দিনগুলো। কিন্তু মানুষের মন তো একখানা শ্লেট নয় যে ইচ্ছা করলেই তার পুরনো লেখাগুলো মুছে ফেলা যায়, আবার ইচ্ছা করলেই তাকে ভরে দেওয়া যায় নতুন লেখায়। সমস্ত দিনটা কেটে গেল আচ্ছন্নের মতো। বিকাল হতেই ছুটি চাইতে গেল ডাক্তারবাবুর কাছে।

—কোথায় যাবে? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সেন।

—বিনতাদির কাছে যাব একটু। আজ হয়তো না-ও ফিরতে পারি।

ডাক্তার একবার তাকালেন ওর মুখের দিকে। কী দেখলেন, কে জানে? তারপর বললেন, আচ্ছা যাও।

বিনতার ঘরেই অতসী এসেছিল তার শাশুড়ীকে লুকিয়ে। একথা ওকথার পর বলেছিল, বাবা এসেছিলেন এর মধ্যে। জ্যাঠামশাই ওখানে নেই। ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন কোলকাতায়।

—কোথায় আছেন? ব্যাকুল প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল হেনার মুখ থেকে। অতসী বলতে পারে নি। কেমন করেই বা পারবে? এই জনাকীর্ণ নিষ্ঠুর শহরের অন্তহীন পথের কোন প্রান্তে কার আশ্রয়ে কেমন করে তাঁর দিন কাটছে, জানবার কোনো উপায় নেই। কাকীমাদের কথা মনে হয়েছিল। সেখানে গেলে হয়তো খোঁজ মিলতে পারে। ছুটে গিয়ে একটি বার শুধু দেখে আসা। শুধু চোখের দেখা। পরক্ষণেই নিজের মনকে গুটিয়ে নিয়েছিল হেনা। তা হয় না।

পরদিন সকালেই সে ফিরতে চেয়েছিল নার্সিং হোম-এ। বিনতা আসতে দেয় নি। খাইয়ে-দাইয়ে বিকেলের দিকে রওনা করে দিয়েছিল। ঘরে ফিরে কাপড় ছাড়ছে, জুনিয়র নার্স বীণা এসে বলল, কোথায় গিয়েছিলি? তিন নম্বর তোকে ডেকে ডেকে হয়রান।

তিন নম্বরের নাম শুনেই হেনার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। বলল, কেন?

—বাঃ জানিস না বুঝি? ওর বর এসেছে যে। হঠাৎ এসে পড়েছে বোধ হয়। তখন থেকে সাজগোজের কী ধুম! ইচ্ছা ছিল, তোকে দিয়েই চুলটা বাঁধিয়ে নেয়। তা আর হল না। নিজেই যা হোক করে জড়িয়ে নিয়েছে। এবার চা-টা দিতে হবে। তোর খোঁজ করছিল।

বীণা চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বলল, জানিস, এবার বোধ হয় ওর আঁটকুড়ী নাম ঘুচল। ডাক্তারবাবু ওর বরকে তাই বলছিলেন। অপারেশনে ফল হয়েছে। ক-দিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে। গেলেই বাঁচি। আপদ যায় একটা। কী বলিস? তম্বি-গম্বিটা তোর ওপরেই তো বেশী।

নার্সের শেষের কথাগুলো বোধ হয় হেনার কানে যায় নি। তার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বাজছিল একটি মাত্র লাইন, এবার বোধ হয় ওর আঁটকুড়ী নাম ঘুচল। এত দিনে মা হবে শিবানী। ঐ পুরুষোচিত কঠিন দেহে ফুটে উঠবে মাতৃত্বের শ্রী। মনে পড়ল, প্রথম যেদিন সে এল এই নার্সিং হোম-এ। এই তো মাসখানেক আগেকার কথা। কী একটা কাজে ডাক্তারের চেম্বারেই যাচ্ছিল হেনা। দরজার সামনে আসতেই হঠাৎ কানে গেল, কাকে যেন বলছেন ডাক্তারবাবু, কী করব মা, আমরা ডাক্তার; যতই অপ্রিয় হোক, সত্যি কথাই আমাদের বলতে হয়। আমি যা দেখলাম, তোমার সন্তান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবিশ্যি, আমার মতামতই যে তোমাকে মেনে নিতে

হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমি হয়তো ভুল করছি। তুমি বরং অন্য কাউকে দেখাও।

কথাগুলো যাকে বলা হল সে ছিল দরজার আড়ালে। হেনা তাকে দেখতে পায় নি, কিন্তু উত্তরটা শুনতে পেল। শুষ্ক ক্ষীণ-কণ্ঠ, তার মধ্যে নৈরাশ্যের সুর। বলল, আর কাকে দেখাব, বলুন? সবাই ঐ এক কথাই বলছেন। কিন্তু এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। টেবিলের উপর একটা কাচের কাগজ-চাপা পড়ে ছিল। খানিকক্ষণ সেটা নাড়া-চাড়া করলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, একটা অপারেশন করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাতে প্রতিকারের আশা যতখানি, তার চেয়ে বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী।

—বিপদ! ম্লান হেসে বলল শিবানী, চরম বিপদের জন্যে তৈরী হয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি, ডাক্তারবাবু! এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে—বলে মাঝপথেই থেমে গেল।

ডাক্তার সেন সন্ধানী-দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর রোগিণীর দিকে। তারপর বললেন, তোমার স্বামী রাজী হবেন?

—নিশ্চয়ই। আমার কোনো ইচ্ছাতেই তিনি বাধা দেন না। তা ছাড়া, আপনি জানেন না ডাক্তাববাবু, একটি ছেলের সাধ তাঁর বোধ হয় আমার চেয়েও বেশী।

এর পরে অপারেশন সম্বন্ধে দু-চারটা কথা হল। স্থির হল, দিন সাতেক পরে স্বামীকে সঙ্গে করে একেবারে তৈবী হয়ে আসবে। শিবানী উঠে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে হেনাও দাঁড়াল গিয়ে ঘরের মধ্যে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে একবাব পাশের দিকে চেয়ে দেখল, দুটি তীক্ষ্ণ চোখ যেন তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করতে চাইছে। বিরক্তি এবং অস্বস্তি যতই হোক, হেনার মনে আজ আর কোনো বিস্ময় দেখা দিল না। কিছু দিন থেকেই লক্ষ্য করেছে, অপরিচিত মেয়েরা যখন তার দিকে তাকায়, ঠিক সহজ দৃষ্টিতে তাকায় না।

অনেকের চোখেই থাকে হয় লোভ, নয় হতাশা, নয়তো ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষের বিষ। অনেক ভেবেও কারণ খুঁজে পেত না। সে তো রূপসী নয়? তবে কী দেখে এরা? তারপর তার চোখ খুলে গেল বাগবাজারের সেই রুগ্না বৌটির একটি মাত্র কথায়—তোমার প্রতিটি অঙ্গ যে মা হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। কিছু দিন আগে এখানকার একটি অল্পবয়সী নার্স তাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিল, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন। অতগুলো চরিত্রের মধ্যে তার মনকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল কিরণময়ী। তারই একটা দুঃসাহসিক উক্তি মনে পড়ে গেল—সন্তান ধারণের ক্ষমতাই হচ্ছে নারীর রূপ। পড়তে পড়তে কান দুটো তার লাল হয়ে উঠেছিল। শিবানীর রুক্ষ দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের দিকে যখন চোখ ফেরাল, সেই লজ্জা-রঙীন অব্যক্ত অনুভূতি তার নিভৃত অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক সাত দিন পার হতেই এল শিবানী। স্বামী থাকেন বাংলার বাইরে। তিনি আসতে পারেন নি। লিখিত সম্মতি জানিয়েছেন ডাক্তারের কাছে, অপারেশন সম্বন্ধে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি একমত। সেই দিন সন্ধ্যার মুখে তিন নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল হেনা। শিবানী ডেকে ফেরাল, শোনো; কী কর তুমি এখানে?

—ঝিয়ের কাজ করি।

—ঝিয়ের কাজ! বলে কপাল কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিল শিবানী। একটা সামান্য কথার মধ্যে যে কতখানি ঘৃণা, অবজ্ঞা আর তিক্ততা একসঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে, হেনার কাছে তেমন করে আর কোনো দিন ধরা দেয় নি। সেই দিন প্রথম সে তীব্রভাবে অনুভব করেছিল, ঝি হবার বেদনা আর অপমান। তারপর থেকে ক্রমাগত লাঞ্ছনা আর রূঢ় ব্যবহার ছাড়া আর কিছু সে পায় নি এই তিন নম্বরের কাছ থেকে। হেনা জবাব দেয় নি, প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু মনটা তার বিষিয়ে বিষিয়ে কালো হয়ে গেছে।

দিন তিনেকের মধ্যেই অপারেশন হয়ে গেল। তারপর ধীরে

ধীরে সেরে উঠল শিবানী। আজ সে সম্পূর্ণ নিরাময়। শুধু তাই নয়, অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ডাঃ সেন। দ্বিধা, সন্দেহ এবং আশঙ্কা নিয়ে তিনি অস্ত্রধারণ করেছিলেন। আজ তিনি উৎফুল্ল। তাঁর পরীক্ষা সফল হয়েছে। সব সাধ পূর্ণ হয়েছে শিবানীর। খবর পেয়ে প্রবাস থেকে ছুটে এসেছেন তার স্বামী। হয়তো বছর না যেতেই তার কোলে আসবে কোলজোড়া খোকা। হেনার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার সেই অসম্ভব স্বপ্ন। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপর অন্তরের কোন অতল থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

তিন নম্বর থেকে আবার তাগিদ এসে গেল, চা চাই। এক কাপ নয়, দু কাপ। শিবানী একা নয়, তারা দুজন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হাসিতে উল্লাসে ভরে গেছে তার ঐ পাথরের মতো কঠিন মুখ। পাশাপাশি বসে চা খাবে সে আর তার বর। তারপর তারা চলে যাবে, যেমন করে আরো কত মেয়ে চলে গেছে। সে-ই শুধু পড়ে থাকবে, নতুন যারা আসবে, তাদের চা যোগাবার ভার নিয়ে। তীব্র রূঢ় কণ্ঠের ডাক ভেসে এল—ঝি—! শিবানীর গলা। অন্য সবাই তাকে নাম ধরে ডাকে। কিন্তু শিবানীর কাছে সে শুধু ঝি। হেনার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। একান্ত অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে পা বাড়াল রান্নামহলের দিকে।

দু হাতে চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে তিন নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই হেনার কানে গেল একটা পরিচিত স্বর। থমকে দাঁড়াল সেইখানেই। একটুখানি মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু সে যেন বিপুল বেগে এসে আছড়ে পড়ল তার বুকের উপর। দরজার পরদা বাতাসে একটু সরে যেতেই শিউরে উঠল হেনা। এ কী! এ যে অবিকল তারই মতো। না, না। এই তো সে। সেই দুটো আগুন-ভরা চোখ, যারা দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে, আবার ভয়ের দোলায় সরিয়ে দেয়; ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়ে দেয়, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে দেয় না। হেনার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল। নড়বার শক্তি রইল না। ঠিক সামনে

খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। শিবানী ছিল পাশের দিকে। আস্তে আস্তে একান্ত কাছটিতে সরে এল। মাথাটা রাখল ওর বুকের উপর, লুটিয়ে-পড়া দেহটা বন্দী হয়ে গেল একখানা দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনে। সেই হাত, যে একদিন প্রায় সমস্ত রাত ধরে তারই কণ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে ছিল। সেই উত্তপ্ত গাঢ় স্পর্শ বিদ্যুৎ-শিখার মতো ফিরে এল হেনার সমস্ত দেহের রক্তকণায়। বুকের ভিতর জ্বলে উঠল দাবানল। দু চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এল তার হলকা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। কম্পিত হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চায়ের পেয়ালা।

ঘরের ভিতর থেকে শিবানীর রুক্ষ স্বর গর্জে উঠল—কে? হেনা জবাব দিল না। নিচু হয়ে বসে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলতে লাগল। শিবানী বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, ভাঙলি তো কাপটা? তোর আজ-কাল কী হয়েছে বল তো! চোখ দুটো থাকে কোথায়?—বলেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে। হেনার কানে গেল সেই গম্ভীর কণ্ঠের মৃদু প্রশ্ন—কে ও?

—ঐ ঝিটা, আর কে! একেবারে জ্বালিয়ে খেল।

—আহা, ওর দোষ কী, হেসে বলল সেই স্বর, আমাদের কাণ্ড দেখে হয়তো মাথা ঘুরে গেছে।

—ঠিক বলেছ! ও সব পারে। নিশ্চয়ই দেখছিল লুকিয়ে লুকিয়ে।—বলেই আবার বেরিয়ে এল শিবানী। কাছে গিয়ে বলল, কী করছিলি এখানে দাঁড়িয়ে? হেনা জবাব দিল না। শিবানীর যেন আরো রোখ চেপে গেল। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, বল কী দেখছিলি। আমরা স্বামী-স্ত্রী রয়েছি ঘরের মধ্যে। লজ্জা করে না তোর হ্যাংলার মতো উঁকি মারতে? বেহায়া কোথাকার।

স্বামী-স্ত্রী! তীব্র কশাঘাতে কেঁপে ককিয়ে উঠল হেনার সমস্ত চেতনা। ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল শুষ্ক বিষাক্ত হাসির কুঞ্চন। স্বামী-স্ত্রী!

কাচের টুকরাগুলো কুড়িয়ে, ফেলে দিয়ে হেনা ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরটিতে। চোখ দুটো থেকে তখনো ঝরে পড়ছে সেই স্ফুলিঙ্গ। উন্নত বুকখানা দ্রুত তালে উঠছে নামছে। দুঃখ নয়, ব্যথা নয়, দুঃসহ প্রতিহিংসার তাড়না। স্বামী-স্ত্রী! ঠোঁট দুটো আবার কুঁচকে উঠল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বিকৃত স্বর—স্বামী-স্ত্রী! তোমাদের ঐ স্বামী-স্ত্রীর সুখের ঘর আমি ভেঙে দেব, পুড়িয়ে দেব তোমাদের সাধের সংসার। না, না। আমি যা পাই নি, তোমাকেও তা পেতে দেব না, শিবানী!

কিন্তু কেমন করে? ওদের বঞ্চিত করবার, ওদের ঐ মিলিত জীবনের সুখৈশ্বর্য ধ্বংস করে দেবার মতো কী অস্ত্র আছে তার হাতে? আছে বই কি? দৃঢ় কণ্ঠে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল হেনা। আমারই হাতে রয়েছে ওদের মৃত্যুবাণ। একটি বার শুধু ছুটে গিয়ে দাঁড়াব ওদের সামনে, মাথা উঁচু করে বলব, এত কাল যাকে 'ঝি' বলে ঘৃণা করেছ, অপমান করেছ পদে পদে, তার দিকে একবার চেয়ে দেখো শিবানী! জিজ্ঞেস করো তোমার প্রেমিক স্বামীকে, কে সেই ঝি। ওঁর কাছে কী তার পরিচয়। শোনো, শিবানী, বিয়ের রাতে ঐ হাত থেকে যে মালা পেয়ে তুমি ধন্য হয়েছিলে, সে মালা বাসি, সে এই ঝিয়ের গলার শুকনো মালা।

নিষ্ঠুর উল্লাসে নিজের মনে হেসে উঠল হেনা। পরমুহূর্তেই আবার সন্দেহে আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। বিকাশ যদি সব অস্বীকার করে? যদি বলে, কে তুমি? তোমাকে আমি চিনি না, কোনো দিন দেখি নি। তুমি যা বলছ, সব মিথ্যা, সব পাগলের প্রলাপ! তাহলে? কী প্রমাণ আছে তার? কে বিশ্বাস করবে তুচ্ছ একটা ঝিয়ের কথা? সবাই হাসবে, টিটকারি দেবে। বলবে, ছি, ছি, হেনাটা কী নির্লজ্জ! হয়তো মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে তাড়িয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু তাই বলে মুখ বুজে হার মানবে হেনা, আর ওদের হবে জিত? ওরা হাত ধরাধরি করে চলে যাবে আর ও.

শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে! হাত পেতে নেবে ওদের একটু ভিক্ষার অনুগ্রহ, একটু তাচ্ছিল্যের হাসি! সে হাসি নিবিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই করবে না?

বন্ধ দরজার ওপাশে কড়া নড়ে উঠল। খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল হেনা। হয়তো আবার ডাকছে শিবানী। পাঠিয়েছে নতুন কোনো হুকুম। না, সে খুলবে না; কিছুতেই না; কোনোমতেই না। বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। কম্পাউণ্ডার বিপিনবাবুর গলা। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি দরকার। দরজা খুলতেই একটা কৌটো বাড়িয়ে ধরে বলল বিপিন, ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন। আরজেণ্ট কল, ওপরে যাবার সময় নেই। এটা তোমাকে রেখে দিতে বললেন। সাবধানে রেখো। আমিও যাচ্ছি ওঁর সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল কম্পাউণ্ডার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হেনা তাকাল তার হাতের জিনিসটার দিকে। সন্ধ্যাবেলায় একটু করে আফিম খেয়ে থাকেন ডাক্তার সেন। তারই কৌটো। আস্তে আস্তে ডালাটা খুলে ফেলল। কালো কালো অনেকগুলো বড়ি। বিষ! কেমন একটা ভাঙা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই তো সেই মহাস্ত্র। এতক্ষণ যা চেয়েছিলাম, এই সেই মৃত্যুবাণ। একান্ত মনের কামনা শুনতে পেয়েছেন ভগবান। আফিম নয়, এ তাঁর প্রত্যাদেশ।

কপাটের গায়ে করশব্দ। আবার কে ডাকছে! কৌটোটা তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল হেনা। দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল বীণা। চমকে উঠল ওর মুখের দিকে চেয়ে—এ কী! চোখ মুখ বসে গেছে কেন? অসুখ করেছে নাকি?

—না না, অসুখ করবে কেন? ম্লান হেসে জবাব দিল হেনা।

—বড্ড জ্বরজারি হচ্ছে। সাবধানে থাকিস। হ্যাঁ; আবার ডাকছে তিন নম্বর। কাপ ভেঙেছিস বলে চা দিতে হবে না?

বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এক কাপ দিস। ভদ্রলোক চলে গেছে। কাল এসে নিয়ে যাবে। খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে আছে, দেখলাম।

একতলায় রান্নাঘরের বারান্দায় চা তৈরির সরঞ্জাম। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে চার দিকটা একবার চেয়ে দেখল হেনা। কেউ নেই, বুকের ভিতর থেকে কৌটোটা বের করে খুলতে গিয়ে হাত দুটো কেঁপে উঠল। আর-একবার চেষ্টা করতে যাবে, বারান্দার ওধারে কার পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওটা আবার লুকিয়ে ফেলল আঁচলের তলায়। আর দেরি করা চলে না। কৌটো রইল বাঁ হাতের মুঠোয়। ডান হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। তিন নম্বরে ঢুকে দেখল, শিবানী নেই। পাশেই বাথরুম। সেখান থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। কাপটা নামিয়ে রাখতেই পিছন থেকে বীণা এসে ঢুকল। হাতে মেজার গেলাস। ফিসফিস করে বলল, কোথায়? হেনা চোখের ইশারায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিল। গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে মুখে একখানা বই চাপা দিয়ে বলল বীণা, ওষুধটা খেয়ে নিতে বলিস। এ কী! কার ছবি রে? ও-ও! যুগল মূর্তি। বের করে দেখা হচ্ছিল বুঝি দুটিতে মিলে? এ মা! এ কী রকম দাঁড়াবার ছিরি! কী অসভ্য দেখ।

ছবিটা তুলে ধরল হেনার চোখের সামনে। তারপর রেখে দিয়ে চলে গেল হাসতে হাসতে। পলকমাত্র নজর পড়তেই হেনার বিষজর্জর অন্তর জুড়ে আবার জ্বলে উঠল সেই দাবানল। হঠাৎ মনে হল চোখের উপর থেকে নিবে গেছে পৃথিবীর সব আলো, মিলিয়ে গেছে বিধাতার সব সৃষ্টি। চারদিকে শুধু অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার। তারই মধ্যে জ্বলন্ত বিদ্রূপের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঐ অসহ্য ছবিখানা। একটি সুখী দম্পতির প্রেমপূর্ণ আলোকচিত্র। সামনের দিকে দাঁড়িয়ে শিবানী, তার কাঁধের উপর চিবুক রেখে হাসছে বিকাশ। কী এক দুর্বার

জিঘাংসা মুহূর্তমধ্যে হেনার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল তার নেশা, নেচে উঠল রক্তধারা।

তার পরের মুহূর্তগুলো আজ আর কিছুতেই সে স্মরণ করতে পারে না। আবছায়ার মতো শুধু মনে পড়ে, কম্পিত হাত দুখানা যন্ত্রচালিতের মতো কখন বোধ হয় খুলে ফেলেছিল আফিমের কৌটো। দুটো বড়ি তুলে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল মেজাব গেলাসেব মধ্যে। ঠিক সেই সময়ে খট করে শব্দ হয়েছিল বাথরুমের দরজায়, আর তাবই সঙ্গে রাশি রাশি ভয় যেন দৈত্যের মতো ছুটে এসেছিল তাকে ধরবার জন্যে। তার বুকের ভিতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল, পালাও। চোখের নিমেষে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছিল তার বিছানাব উপর। তার পরে আর কিছুই তার মনে নেই। কতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়েছিল তাও জানে না। যখন জ্ঞান হল চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের দিক থেকে রুগীদের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মাথা তুলতে গিয়ে মনে হল সমস্ত ঘরখানা দুলছে। পিপাসায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। উঠে জল গড়িয়ে খাবে, সে শক্তিও নেই। সমস্ত শরীরে দারুণ অবসাদ।

আরও খানিকক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে টলতে টলতে কুঁজোর কাছে গিয়ে দেখল, তারই পাশে ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে তার বাত্রির খাবাব ঠাকুর হয়তো কখন রেখে গেছে; ঘুমুচ্ছে মনে করে আর ডাকে নি। খাবার তেমনি পড়ে রইল। দু গেলাস জল খেয়ে দেয়াল ধরে ধবে হেনা আবার ফিরে এল বিছানায়। গভীর ক্লান্তিতে দু চোখ ভরে নেমে এল ঘুম। ঠিক ঘুম নয়, কী এক রকম আবেশময় অসাড়তায় জড়িয়ে গেল স্নায়ুজাল।

ভোরের দিকে সেই আচ্ছন্ন ভাবটা যখন একটু তরল হয়ে এসেছে, হেনার কানে গেল কিসের একটা মস্ত গোলমাল। কারা যেন ব্যস্ত ভাবে চলাফেরা করছে, অনেকে মিলে কথা বলছে, তারই একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল

কম্পাউণ্ডার। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, কোথায় ফেলেছ আফিমের কৌটো ?

হেনার হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন এক নিমেষে অচল হয়ে গেল। চোখে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল, তার সমস্ত মুখের উপর থেকে নেমে গেছে রক্তস্রোত। ছাইয়ের মতো সাদা দুখানা ঠোঁট শুধু নড়ে উঠল একবার। একটু ক্ষীণ শব্দও শোনা গেল না।

কী, কথা বলছ না যে ? ফেটে পড়ল বিপিন। ডাক্তারবাবু ডাকছেন তোমাকে। শীগগির চলো।

হেনা উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাথা তুলতে পারল না। রগ দুটো মনে হল ছিঁড়ে পড়ছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। এতক্ষণে বোধ হয় বিপিনের নজর পড়ল তার মুখের দিকে। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, অসুখ করেছে নাকি ? থাক, আর উঠতে হবে না। শুয়ে থাকো। শেষ কালে আমার হাতেই বুঝি দড়ি পড়ল—বলেই তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল বীণা। চাপা গলায় বলল, ও কী, তুই এখনো উঠিস নি ! ওদিকে যে সর্বনাশ ! শিবানী আত্মহত্যা করেছে। ডাক্তারবাবুর আফিমের কৌটো পাওয়া গেছে তার টেবিলের তলায়।

আত্মহত্যা ! হেনার মনে হল একখানা বিশাল পাথর যেন এই মাত্র নেমে গেল তার বুকের উপর থেকে। আবার বুঝি হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে, মুখের উপর ফিরে আসছে রক্তের ধারা। ওর দিকে চোখ পড়তেই বীণা এসে বসে পড়ল শিয়রের পাশে। কপালে হাত দিয়ে বলল, ও মা ! জ্বর এল কখন ? কিছু বলিস নি তো ?

পায়ের কাছে যে চাদরটা গোটানো পড়ে ছিল, সেইটাই পাট খুলে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে বলল, শুয়ে থাক, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।

—না, না, ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে অনেকটা যেন চেঁচিয়ে উঠল হেনা।

তার পর আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বলল, ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে না। কিছু হয় নি আমার।

বীণা হেসে উঠল, পাগল! তোর ভয় কিসের? তুই তো আর বিষ দিস নি।

নিজের অজ্ঞাতে আর-একবার চমকে উঠল হেনা।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সেন এলেন। গাল দুটো অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। থমথম করছে মুখ। চোখের কোণে কালি। নিঃশব্দে ওর হাতখানা তুলে নাড়ী দেখলেন। তারপর আস্তে নামিয়ে রেখে বললেন, দরজা বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে থাকো। বীণাকে বলছি, মাথাটা ধুয়ে দিয়ে যাবে।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার। এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বললেন, আফিমের কৌটোটা কোথায় রেখেছিলে?

—আমার হাতে ছিল।

—তার পর?

হেনা জবাব দিতে পারল না। গলাটা আবার শুকিয়ে আসছে।

—শিবানীর ঘরে গিয়েছিলে কেন?

—চা দিতে।

ডাক্তার আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চিন্তান্বিত মুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

হেনাও উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে কয়েক মগ জল গড়িয়ে চাপড়ে দিল মাথায়। অনেকখানি সুস্থবোধ করল। সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল তার মোহাবিষ্ট মস্তিষ্কের মধ্যে। যে মূঢ় ভয় এতক্ষণ তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাও বোধ হয় কেটে গেল। বিছানায় পড়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। কিসের এক দুর্দম প্রেরণায় সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করল ঘরের

মধ্যে। তারপর সহসা বেরিয়ে পড়ল রুগীদের ওয়ার্ডের দিকে।

তিন নম্বরের সামনে যেতেই কানে গেল সেই গম্ভীর কণ্ঠ। সুস্পষ্ট দৃঢ় স্বর। এতটুকু কম্পন নেই, নেই অণুমাত্র উত্তেজনা—আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, ডাক্তার সেন! আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করে নি, করতে পারে না। যে কোনো কারণেই হোক, কেউ তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

হেনার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। পা দুটো অচল হয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল ডাক্তার সেনের প্রতিবাদ—এ আপনি কী বলছেন, বিকাশবাবু! আমার এখানে এমন কে থাকতে পারে, একজন অসুস্থ মহিলাকে বিনা দোষে খুন করবে? আমার একটি ঝি ভুল করে আমার আফিমের কৌটোটা ওঁর ঘরে ফেলে গিয়েছিল। উনি নিশ্চয়ই তার থেকে কটা বড়ি তুলে নিয়েছেন।

হেনার মনে হল, কী একটা প্রচণ্ড শক্তি তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে পা দিয়েই সে বলে উঠল, না, সে বড়ি দুটো আমিই ওর ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি।

বিকাশ বসে ছিল অন্যদিকে মুখ করে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের আঘাতে উঠে দাঁড়াল। মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র কথা—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। আমিই খুন করেছি আপনার—আপনার স্ত্রীকে। কারণটাও কি জানতে চান? তবে শুনুন। কারণ—কারণ—আর কিছু বলবার আগেই পা দুটো আবার টলে উঠল। শূন্যে হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে গেল। ডাক্তারবাবু ছিলেন ঘরের ওদিকটায়। তাঁর চিৎকার শোনা গেল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবার আগেই শিবানীর শূন্য খাটের উপর লুটিয়ে পড়ল তার সংজ্ঞাহীন দেহ।

ডাক্তার সেন শেষ পর্যন্ত লড়েছিলেন। খুনের অভিযোগ থেকে হেনাকে বাঁচাবার জন্য সম্ভব অসম্ভব কোনো চেষ্টাই বাদ দেন নি।

পুলিশের কাছে বলেছিলেন, আজ সকালেই ওকে পরীক্ষা করে ব্রেন ফিভারের লক্ষণ পাওয়া গেছে। যা কিছু বলছে, সব বিকারের প্রলাপ। ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দেবেন না।

পুলিশ যখন শুনল না, নিম্ন আদালতে গিয়ে হলফ করে বলেছিলেন, শিবানীর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তা ছাড়া, বন্ধ্যা বলে তার নিজের ওপর একটা ধিক্কার এসে গিয়েছিল। এই রকম যার মনের অবস্থা, তার ঘরে ভুল করে আফিমের কৌটো ফেলে এসেছিল বলে আসামীকে আমি কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছিলাম, তাড়িয়ে দেব বলে শাসিয়েছিলাম। সংসারে ওর কেউ নেই। আমাকেই ও বাপ বলে জানে। তেমনি ভালোবাসে এবং ভক্তি করে। আমার রূঢ় ব্যবহার ওর মনে যে ভীষণ আঘাত দিয়েছে, তারই ফলে এই খুনের অপরাধ তুলে নিয়েছে নিজের ঘাড়ে। এটা কনফেশন নয়, নিদারুণ অভিমান। ওকে আমি অনেক দিন থেকে দেখছি। খুন করা তো দূরের কথা, খুনের কল্পনাও ওর মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব!

এর পরেও যখন ছোট হাকিম হেনাকে দায়রায় সোপর্দ করলেন, তখনো দমে যান নি ডাক্তার সেন। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে দীর্ঘ আবেদন জানিয়েছিলেন জজ সাহেবের এজলাসে। বলেছিলেন, আমি একজন বহুদর্শী চিকিৎসক। আমি বারংবার বলছি, এবং সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আসামী প্রকৃতিস্থ নয়। আফিমের কৌটো ফেলে আসার যে অপরাধ সেই অপরাধ-বোধই ওর কনফেশন-এর কারণ। এও এক রকমের মানসিক বিকৃতি; আমরা যাকে বলি মেণ্টাল ডিরেন্‌জ্‌মেণ্ট। একটা অদ্ভুত ধরনের অবসেশন বা কোনো বিশেষ আবেশ ওকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্য কোনো দিকে মন দেবার ক্ষমতা নেই। এই অবস্থায়, কেবলমাত্র ওর একটা মিথ্যা স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে যদি এই নিষ্পাপ, নিরপরাধ মেয়েটাকে খুনী সাব্যস্ত করা হয়, তার চেয়ে ঘোর অবিচার আর হতে পারে না।

কিন্তু জজ সাহেব হেনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান নি, এবং হয়তো সেই জন্যে তার স্বীকারোক্তিও অবিশ্বাস করেন নি। শুধু বারংবার প্রশ্ন করেছেন, শিবানীকে বিষ দিয়েছিলে কেন? তার বিরুদ্ধে কী তোমার অভিযোগ? উত্তরে হেনা তার আগের কথারই পুনরুক্তি করে গেছে—আমি যা বলেছি, তার বেশী আর কিছু বলবার নেই। আমি খুন করেছি। তার জন্যে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য, তাই আমাকে দিন। বার বার এক কথা বলতে আমার কষ্ট হয়।

খুনী আসামী যদি আদালতে নিজেকে সমর্থন করবার মতো উকিল নিযুক্ত করতে না পারে, সরকার সে ব্যবস্থা করে থাকেন। হেনার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একজন তরুণ উকিল। তিনি আগাগোড়া অভিযোগ অস্বীকার করে গেছেন। সরকার পক্ষের প্রবীণ উকিল তাকে অপরাধী প্রমাণ করলেও অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডের সুপারিশ জানিয়েছিলেন। হয়তো তারই ফলে চরম শাস্তি না দিয়ে জজ সাহেব তাকে মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে জেলে পাঠাবার আদেশ দেন।

যখন বিচার চলছিল, বিনতা স্বামীকে সঙ্গে করে মাঝে মাঝে জেল-হাজতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত। যে ক-বার এসেছে প্রতিবারই বলত, তোর কাকীমার ঠিকানাটা দে। একবার তোর জামাইবাবুকে পাঠিয়ে দেখি, সেখান থেকে বাবার খোঁজ পাওয়া যায় কি না। হেনা রাজী হয় নি। বার বার পীড়াপীড়ি করাতে বলেছিল, কী হবে খোঁজ নিয়ে। আমার মন বলছে, বাবা নেই। আর যদি থাকেনও, আমার এই খবর শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করবেন।

সেই দৃশ্যটা যেন চোখের উপর প্রত্যক্ষ করে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলেছিল, না, না, সেটা আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

তবু সইতে হয়েছিল। জেল হয়ে যাবার পর অতসীর কাছ থেকে বিনতাই এনেছিল সেই চরম সংবাদ। হার্টফেল করে নয়, নানারকম অসুখে ভুগে ভুগে হাসপাতালে মারা গেছেন সদাশিব। হেনার চোখে সেদিন একবিন্দু জল দেখা দেয় নি। বোধ হয় সব জল

ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপর এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, শেষ সময়ে যত কষ্টই পেয়ে থাকুন, ভগবান তাঁকে এক দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। মেয়ের এই চরম পরিণাম দেখে যাবার অভিশাপ বুকে করে শেষ নিশ্বাস ফেলতে হয় নি।

এগারো

খাতাটা যখন শেষ করলেন তালুকদার, এই পাতাগুলোব মধ্যে যে মেয়েটি ছড়িয়ে আছে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হল। অনেক দিন ধরেই তো দেখে আসছেন। নানা অবস্থার মধ্যে তার বিচিত্র পরিচয়ও কম পান নি। তবু, এতদিন যাকে দেখেছেন, আর আজ যাকে দেখবেন, তারা দুটি আলাদা মানুষ, তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। অতীত জীবনের মধ্যে মানুষের যে পরিচয়, সেটা যেমন সত্য নয়, তেমনি অতীতকে বাদ দিয়েও সে অপূর্ণাঙ্গ। দেবতোষ হয়তো তা স্বীকার করবে না। সে বলে, মানুষের আসল রূপ যদি জানতে চান, সেটা তার নিজের মধ্যেই পাবেন, তার ইতিহাসের মধ্যে নয়। তার অতীতের চেয়ে বড় বর্তমান এবং তার চেয়েও বড় তার ভবিষ্যৎ। সে কী ছিল তা দিয়ে আমার কাজ নেই, সে কী, এবং কী হতে পারে, তারই মধ্যে তাকে খুঁজতে চাই।

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু ছবিকে বিচার করতে হলে যেমন তার পটভূমিকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি মানুষের পরিপূর্ণ রূপ পেতে হলে তাকেও দাঁড় করাতে হবে তার বিগত জীবনের কাঠামোর উপর। এতদিন যে-হেনাকে দেখে এসেছেন তালুকদার, সে শুধু নিরাভরণ রেখাচিত্র ; এবার যে এসে দাঁড়াল তাঁর চোখের সুমুখে, সে একটি বহুবর্ণ-রঞ্জিত নিপুণ শিল্পসৃষ্টি।

দেখা হওয়ার অন্য প্রয়োজনও ছিল। হেনা সেই জাতের মেয়ে,

যারা ফাঁকি দিয়ে কিছুই পেতে চায় না। অন্যের দয়া বা অনুকম্পার উপর তার লোভ নেই। এই কারাপ্রাচীরের মধ্যে বসেও নারী-জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে অনায়াসে পেয়েছিল, তার দিকেও সে হাত বাড়ায় নি। বুক ফেটে গেছে, তবু শ্বাস রুদ্ধ করে বলেছে, আমার সবটুকু না জেনে যা দিতে চাইছ, সেটা আমার প্রাপ্য নয়। ও তুমি ফিরিয়ে নাও। খাতাটা তার হাতে দেবার আগে মহেশকেও সে ঐ কথাই বলে গেছে—যে কাজের ভার আমাকে দিতে চাইছেন, পেলে আমি ধন্য হব। কিন্তু তার আগে আমার সব কথা শুনুন, শুনে বিচার করুন, সে অধিকার আমার আছে কি না।

সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। তারই জন্যে হয়তো সে অপেক্ষা করে আছে।

তালুকদার স্থির করলেন, কালই তাকে ডেকে পাঠাবেন। ঠিক সেই সময়ে ডাক খুলতে গিয়ে পেলেন দেবতোষের চিঠি। অন্যান্য কথার পর লিখেছেন ডাক্তার,—'ছুটি যে অফুরন্ত নয়, সে কথা ভুলতে বসেছিলাম। সরকার দয়া করে দিন চারেক আগে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাকে চালান করেছেন রাঙামাটির জঙ্গলে। সেখানে একটা বাড়তি রোজগার অর্থাৎ ভাতার ব্যবস্থা আছে তারও উল্লেখ আছে হুকুমনামায়। আমি কিন্তু ভাতার লোভ এবং রাঙামাটির রঙীন মায়া দুটোই ত্যাগ করে এই কালো মাটি আঁকড়ে থাকাই স্থির করলাম। আপনি হয়তো বলবেন ওটা নেহাত মাটি খাওয়ার কাজ হল। কী করব দাদা, চাকরি-ভাগ্য আমার কোষ্ঠিতে নেই। তাই বলে এখানেও যে একটা কিছু করে তুলবার আয়োজন করব, মনের মধ্যে সে জোরও পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার সেই ভ্রমণ-তালিকাটা এবার শুরু করে দিই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মাকে নিয়ে। সঙ্গে যেতেও নারাজ, একা থাকতেও ইচ্ছা নেই। আমাকে নিয়ে বড্ড বেশী ভাবছেন, এবং সেই জন্যে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছেন।

বেলঘরিয়ার খবর ভালো। শাস্তি সেরে উঠেছে এবং যথারীতি কাজ-কর্ম চালাচ্ছে। মা মাঝে মাঝে যান। আপনাকে একবার আসতে বলছেন। না; ওখানে কোনো সমস্যা নেই। আপাতত ওঁর একমাত্র সমস্যা বোধ হয় আমি। কবে আসছেন?

বীরু নীরুকে দেখে এসেছি। ওরা ভালো আছে।'

সুলোচনা দেবীর দুশ্চিন্তার কারণ তালুকদার অনুমান করলেন। দেবতোষের চিঠির প্রতি ছত্রেও তার সমর্থন পাওয়া গেল। ডাক্তারের জেল ছাড়বার পর থেকে ঘটনাস্রোত যে পথ ধরেছে, তার সঙ্গে তিনিও অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছেন। নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে বসে থাকবার দিন আর নেই। আর দেরি না করে পরদিনই কলকাতা রওনা হলেন। হেনার সঙ্গে দেখা হবার আগে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা বোধ হয় দু দিক থেকেই প্রয়োজন।

এই চিঠির কয়েক দিন আগের ঘটনা। গভীর রাতে সুলোচনার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরটা দেবতোষের। মাঝখানের দরজা ভেজানো থাকে। ছেলে ঘুমিয়ে থাকলে তার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সুলোচনা কান পেতে রইলেন। কোনো শব্দ পেলেন না। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। ভেজানো দরজা খুলে দেখলেন, বিছানা খালি। বুকখানা কেঁপে উঠল! বাইরে বেরোতেই চোখে পড়ল অন্ধকার বারান্দার কোণের দিকে একটা ক্যাম্প চেয়ারে চুপ করে পড়ে আছেন দেবতোষ। মা কাছে যেতেই চমকে উঠলেন—কে?

—আমি।

—তুমি এখনো ঘুমোও নি?

সুলোচনা সে কথার জবাব দিলেন না। সস্নেহ মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোর কী হয়েছে, দেবু! আমাকে খুলে বল।

—কই, কিছুই তো হয় নি মা! এমনিই, ঘুম আসছিল না, তাই।

—মার কাছে মিছে কথা বলতে নেই দেবতোষ, গম্ভীর সুরে বললেন সুলোচনা। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

সিক্ত কণ্ঠে বললেন, তুই তো জানিস, বাবা, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। যা হয়েছে বল। আমার কাছে লজ্জা করিস নে।

দেবতোষ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বললেন, সে কথা জেনে কোনো লাভ নেই, মা! তা ছাড়া তোমাকে হয়তো ঠিক বোঝাতে পারব না। মাঝখান থেকে তুমি শুধু কষ্ট পাবে।

মা আর পীড়াপীড়ি না করে বললেন, আমাকে না বলিস, মহেশকে সব বলতে পারবি তো?

—তিনি সব জানেন।

দেবতোষ বাড়ি ছিলেন না। সুলোচনার ঘরে বসে তাঁরই মুখ থেকে এই কাহিনীটুকু সমস্ত মন দিয়ে শুনছিলেন তালুকদার। শোনবার পর বললেন, হ্যাঁ, মা! আমি সবই জানি, এবং বলবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি। তবে—

সুলোচনা একটু যেন ক্ষুণ্ণ সুরে বললেন, এ বিষয়ে আমাব মন তো তোমার অজানা নেই, মহেশ! তবে আর ইতস্তত করছ কেন?

—না, মা! কিছুদিন আগে হলেও হয়তো দ্বিধা করতাম। কিন্তু আজ আপনার কাছে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। সে মেয়েটিকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানি।

সুলোচনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাহলে আমাকে নিয়ে চলো বাবা! আমি দেখে আশীর্বাদ করে আসি॥

মহেশ মুহূর্তকাল ওঁর আগ্রহাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেখানে আপনি যেতে পারেন না, মা!

—কেন? অনেক দূবে বুঝি? তা হোক—

—না, বেশী দূরে নয়, আমারই কাছে, মানে আমার জেলখানায়।

সুলোচনার মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন নিচের দিকে। তারপর মুখ তুলে বললেন, জেলে থাকলেই যে তাকে ঘরে আনা যায় না, আজ আর সে ভুল আমার নেই, মহেশ! তুমিই সেটা ভেঙে দিয়েছ। তবু বহু পুরুষের

সংস্কার। কত জায়গায় যে টান পড়ে। তা ছাড়া আমি একা নই। দেবতোষ শুধু আমার ছেলে নয়, বনেদী জমিদারবংশের সন্তান। তাদের আজ কিছুই নেই ; কিন্তু বংশ-মর্যাদার দম্ভটা এখনো ছাড়তে পারে নি। তাই ভাবছি—

—সেই কথা ভেবেই আমি ইতস্তত করছিলাম, আপনার কথা ভেবে নয়। আপনাকে তো আমি চিনি। চিনি বলেই আজ সেই আশ্চর্য মেয়েটির সমস্ত কাহিনী আপনার কাছে বলতে এসেছি। সে-ও চায়, তার সবটুকু নিয়ে যে পরিচয় তাই সবাই জানুক। এই কথা বলেই সে দেবতোষকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

—ফিরিয়ে দিয়েছে! সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সুলোচনা।

—হ্যাঁ, মা! কিন্তু কেন দিয়েছে, কোথায় তার বাধা, সে কথাও আপনাকে বলব।

হেমন্তের ছোট বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। হঠাৎ বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুলোচনা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। তুমি একটু বোসো বাবা! আমি চট করে সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।—বলেই বেরিয়ে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে।

গৃহদেবতার আসনের পাশে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন সুলোচনা। অন্যদিনের মতো আজও তাঁর অন্তরে জেগে উঠল একটিমাত্র প্রার্থনা, আমার দেবতোষের মঙ্গল হোক। সে যেন কোনো দুঃখ না পায়।

একটু পরেই যখন ফিরে এলেন, মহেশের চোখে পড়ল মায়ের মুখের উপর যে উদ্বেগের রেখা ফুটে উঠেছিল, সে সব মিলিয়ে গেছে। স্নিগ্ধ চোখ দুটিতে ভেসে রয়েছে একটি পরম নির্ভরতার জ্যোতি, তার সঙ্গে মেশানো গভীর ঔৎসুক্যের ছায়া।

তালুকদার শুরু করলেন সেই রাত থেকে, যেদিন প্রথম একটি অচেনা মেয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল মারাত্মক যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার আবেদন নিয়ে ; ডাক্তার দেবতোষের আপত্তি টিকল না ; তারপর

ধীরে ধীরে কেমন করে তারা এগিয়ে এল একে অন্যের কাছাকাছি, এবং শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন দেবতোষ। তারপর জানালেন, যে কাহিনী সে লিখে গেছে আত্মপ্রচারের জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে। মহেশের কণ্ঠ যখন থেমে গেল, তার পরেও অনেকক্ষণ যেন সম্মোহিত হয়ে বসে রইলেন সুলোচনা। কাছাকাছি কোথায় পেটা-ঘণ্টার শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠলেন, কটা বাজল ?

—এগারোটা।

ঈস্! অনেক রাত হয়েছে তো ? দেবু এখনো এল না!

মহেশ হেসে বললেন, দেবু অনেকক্ষণ এসেছে, মা! আমাদের সামনে দিয়েই গেছে তার ঘরে।

সুলোচনা মনে মনে লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে এসো, বাবা! খাবার আমার তৈরী আছে। শুধু একটু গরম করে দেব।

পরদিন সকালে উঠে বেলঘরিয়া যাবার আয়োজন করছিলেন তালুকদার। সুলোচনা বাইরে থেকে ডাকলেন, মহেশ!

—মা! সাড়া দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

—হেনাকে তোমরা ছাড়বে কবে ?

—ওর খালাসের জন্য আমরা সুপারিশ করে পাঠিয়েছি। যে কোনো দিন সেটা মঞ্জুর হয়ে আসতে পারে।

—সেই দিনই আমাকে টেলিগ্রাম কোরো। তোমার ওখানে গিয়েই আশীর্বাদ করে আসব।

বিস্ময়াবিষ্ট চোখ দুটো তুলে নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন তালুকদার। উত্তর দেবার কথাটাও বোধ হয় মনে পড়ল না। সুলোচনা ক্ষণকাল অপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, তুমি বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গেছ ? অবাক হবার কথাই বটে।

আস্তে আস্তে তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বললেন, কাল প্রথম দিকে কিছু না জেনে এই মেয়েটির সম্বন্ধে

আমার মনে যে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো বাবা!

—ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন মা! এতে যে আমার অপরাধ হয়—বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুলোচনার পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন তালুকদার। তারপর বললেন, এ আমি জানতাম, মা। মেয়েটা যত বড় অপরাধই করে থাক, আপনার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু সে জন্যে আমার বাড়িতে আপনাকে যেতে হবে কেন? ওকেই আমি আপনার পায়ের কাছে নিয়ে আসব।

—না, বাবা! ওর আর কেউ না থাক, তুমি তো আছ। বিয়ের আগেই শ্বশুরের ভিটেয় পা দেবে, এতখানি অনাথ সে হতে যাবে কেন?

—আর বলতে হবে না মা! আমিই সব ব্যবস্থা করব।

বারো

খাতাটা জেলর সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে নিজের সেল-এ ফিরে হেনার সেদিন মনে হল তার বুকের উপর থেকে একটা গুরু ভারও সেই সঙ্গে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। অনেক দিন পরে ভারী হালকা মনে হল নিজেকে। সংসারের কাছে সে সুবিচার পায় নি। এক দিকে পেয়েছে অসঙ্গত লাঞ্ছনা আর অন্যায় প্রবঞ্চনা, আর এক দিকে অন্ধ স্নেহ এবং অহেতুক অনুগ্রহ। কোনোটাই তার ন্যায্য পাওনা নয়। আদালতের কাছেও সে সুবিচার চেয়েছিল, পেয়েছে দয়া। এই কারাজীবনের অন্তরালে তাব নিভৃত অন্তরের দুয়ারে যাঁর দেখা মিলল, তিনিও তাকে একান্ত করে চাইলেন, কিন্তু জেনে নিতে চাইলেন না। কেবল একটিমাত্র মানুষ তাকে তুচ্ছও করেন নি, মিথ্যা মূল্যও দেন নি। এই পাঁচিলঘেরা স্বল্প-পরিসর গণ্ডীটুকুর মধ্যেই শুধু দেখেন নি, দেখতে

চেয়েছেন তার সমগ্র জীবনের বিস্তৃত আঙিনায়। এটা কেবল তার বেলাতেই নয়। এখানকার প্রতিটি অধিবাসীকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন, তার মধ্যে এক দিকে গভীর সংবেদন, আর এক দিকে সূক্ষ্ম বিচারবোধ। অপরাধীকে ক্ষমার চোখে দেখলেও, অপরাধকে ক্ষমা করেন না। কর্তব্যে দৃঢ় কিন্তু মমতায় কোমল এই মানুষটির প্রতি হেনার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই তাঁর একটিমাত্র কথায় নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে সে নিঃসঙ্কোচে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

হেনা আশা করেছিল, তার সব কথা জানবার পর জেলর সাহেব তাকে ডেকে পাঠাবেন। স্পষ্টভাবে বলে দেবেন, কোথায় কতটুকু তার প্রাপ্য, কতখানি তার অধিকার। কিন্তু ছু দিন চার দিন করে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল, ডাক এল না। তারপর একদিন শুনল, তিনি বাইরে চলে গেছেন। তবে কি খাতাটা তিনি পড়েন নি? কিংবা পড়ে স্থির করেছেন, জ তাকে দিতে চেয়েছিলেন, সে তার যোগ্য নয়? হেনার ভয় হল, এই মানুষটির উদার অন্তরের একটি কোণে যে স্থানটুকু সে পেয়েছিল, তাও বুঝি তার হারিয়ে গেল! ধরে দাঁড়াবার মতো আর কিছুই রইল না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে গেছে, আমি যা করেছি, এবং করি নি, তারই বলে যা আমার পাওনা, তার বেশী আমার কোনো দাবি নেই।

এমনিই হয়ে থাকে। হেনার দোষ নেই। এরই নাম মানুষের মন। অন্যের অন্তরের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দুর্নিবার কামনা, তার থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয়। শুধু নিজের মধ্যে তার যে রাজ্য, তাতে তার মন ভরে না। নিজের বাইরেও তার অধিকার বিস্তারের প্রয়োজন। তাই সে কারো কাছে চায় স্নেহ-প্রীতি, কারো কাছে প্রেম, কারো কাছে শ্রদ্ধা-সম্মান, কারো কাছে আনুগত্য! এমন সময় আসে যখন প্রতিবেশীর হিংসা, দ্বেষ এবং বৈরিতাও তাকে তৃপ্তি দেয়। তবু তো কিছু পেলাম। মানুষের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ তার প্রতি অপরের ঔদাসীন্য।

রবিবার। কাজ বন্ধ। কিন্তু উলের ক্লাসের দুটি নতুন মেয়েকে তালিম দিতে গিয়ে সমস্ত সকাল হেনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। খেয়ে-দেয়ে একখানা বই নিয়ে বসেছিল। নানা এলোমেলো চিন্তায় তাতেও মন দিতে পারে নি। কমলাকে ডেকে পাঠাবে কি না ভাবছে, এমন সময় সুশীলা এসে বলল, বইটই রেখে একটু ঘুমিয়ে নে দিকিন। ঠিক চারটা বাজলেই আবার যেতে হবে আফিসে।

—আফিসে কেন? জিজ্ঞাসা করল হেনা।

—জেলর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

হেনার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—ফিরে এসেছেন তিনি?

—আজ সকালেই ফিরেছেন।

সুশীলা চলে যেতেই হেনার মনের মধ্যে আবার জেগে উঠল সেই আশঙ্কার ছায়া। কী জানি কী বলবেন তিনি! বইখানা বন্ধ করে একটু গড়িয়ে নেবার আয়োজন করছে, সেল-এর সামনে হঠাৎ কমলাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, আয়। একটু আগেই তোর কথা ভাবছিলাম।

কমলা অনেকখানি সেরে উঠেছে। চোখে-মুখে ঝলমল করছে নতুন ফিরে-পাওয়া স্বাস্থ্য। তার উপর মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে টানা চোখ দুটো আর একটু টেনে বলল, সত্যি? ভাগ্যিস ব্যাটাছেলে নই? তাহলে তো এখনি গলে জল হয়ে যেতাম!

ভালোই হত। আমিও ঝাঁট দিয়ে নর্দমায় নামিয়ে দিতাম।

—উলটো বললে দিদি! ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে নর্দমা দিয়ে গড়িয়েই তো এসেছিলাম এখানে। তুমিই প্রথম তুলে নিলে দু হাত দিয়ে।

—আমি?

—তা ছাড়া আর কে? যাক সে সব কথা। তোমাকে একটা নতুন জিনিস দেখাতে এলাম।

—কী, দেখি?

—এই নাও। বলে, বুকেব ভিতব থেকে বেব কবে দিল একটা খাম।

হেনা হাত না বাড়িয়েই বলল, কাব চিঠি ?

—আমার।

—কে লিখেছে ?

—পড়েই দেখো না ?

খামখানা খুলে সকলেব নিচে নামটায় চোখ পড়তেই উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল হেনা, সনৎ লিখেছে !

—হুঁ ; কিন্তু অতো খুশী হচ্ছ যা ভেবে, তা নয়।

কয়েক লাইনের চিঠি। উপরে কলকাতার একটা ঠিকানা। লিখেছে—

'কমল, এতদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি। কোন মুখেই বা লিখব ? অনেক দূরে ছিলাম। যখন ফিরলাম, তখন আর কিছুই কববাব নেই। জেলেব আফিসে চিঠি লিখে জেনেছি, তোমার বেবোতে আব পাঁচ-ছ মাস বাকী। ঠিক তারিখটা খালাস পাবার মাসখানেক আগে জানা যাবে। তুমিও জানতে পাববে। সে দিনটা সময়মতো আমাকে জানাতে ভুলো না। সরকার মশাই জেল-গেটে উপস্থিত থাকবেন। তার পবেব যা কিছু ব্যবস্থা, সব ভার তাকে দেওয়া বইল।

তোমারই সনৎ।'

পড়া শেষ করে হেনা ধীরে ধীরে ভাঁজ করল কাগজখানা। খামে ভরে বিছানাব পাশে রেখে দিয়ে নিঃশব্দে তাকাল কমলার মুখের দিকে।

—আমি তো কারো অনুগ্রহ-ভিক্ষা করছি নে, বেশ খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল কমলা, তবে তার কিসের দায় ?

—ভালোবাসার দায়, মুখ টিপে হেসে বলল হেনা।

—তুমি আর জ্বালিও না, বাপু !

হেনা কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, একটি বার যদি দেখা হত আমার সঙ্গে? ভারী ভীরু ছেলেটা।

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, ভীরু মানে?

—দেখতে পাচ্ছিস না, কী রকম ছটফট করে মরছে? অথচ মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছে না, কমল, তুমি আমার কাছে চলে এসো। কী এক তুচ্ছ সংস্কারের বাধা প্রতিবারেই ওর বুক চেপে ধরছে। ঝেড়ে ফেলবে, সে সাহসটুকু নেই।

—তুমি যাকে তুচ্ছ সংস্কার বলছ, হয়তো সেইটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড়।

—তা হতে পারে না, কমলা! ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছুই নেই।

—সে কথা কি তোমার মুখে সাজে হেনাদি?

হেনা চমকে উঠল। এত স্পষ্ট যে কমলার চোখ এড়াতে পারল না। সেই দিকে চেয়ে আবার বলল কমলা, সে বাধা তো তুমিও কাটিয়ে উঠতে পার নি?

—আমি যে মেয়েমানুষ রে! ওরা পুরুষ। আমরা যা পারি না, ওরা তা সহজেই পারে। দেখা হলে এই কথাটাই শুধু ওকে মনে করিয়ে দিতাম। ওর চিঠির কী উত্তর দিতে চাস?

—উত্তর আবার কী দেব?

—তা হয় না, কমলা!

—বেশ, তাহলে একটা ধন্যবাদ পাঠিয়ে দিয়ে বলব আমার পথ আমিই বেছে নিতে পারব।

—সে পথটা কী শুনি?

—অমন একজন ভগ্নীপতি থাকতে আমার আবার পথের ভাবনা কিসের? তুমি জান না বুঝি, ভদ্রলোক তিন-চার বার এই জেল-গেটে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছেন! তাতেই মনে হয়, ফিরে গিয়ে দিদির সতীন হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করবার ভরসা

এখনো আছে। মা-ও নিশ্চিন্ত হয়, আর দিদিও তার বছর বছর আঁতুড়ঘরে যাবার দায়টা বোনের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

—তোর মুখে কি কিছুই বাধে না, কমলা? ব্যথিত কণ্ঠে বলল হেনা।

—কী করব দিদি! যে ভালোবাসা শুধু দায়, শুধু অনুগ্রহ, ভালো ভালো কথা দিয়ে ভুলিয়ে দূর থেকে শুধু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা, তার চেয়ে আমার ঐ নরক শতগুণে ভালো। ঐখানেই আমি ফিরে যাব।

—না; সেটা কিছুতেই হবে না। আমি তোকে যেতে দেব না।

—তুমি! সে জোর তোমার ছিল দিদি, কিন্তু তুমি তা ইচ্ছে করেই হারিয়েছ। তুমিও আজ আমারই মতো অসহায়।

—আমরা কেউ অসহায় নই, কমলা! ওটা তোর ভুল। মেয়ে-মানুষ হলেও আমরা মানুষ। আমাদেরও হাত-পা আছে। তারই ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি, চলতে পারি। না; এটা শুধু কেতাবে লেখা ফাঁকা কথা নয়, এ কথা বলেছেন এবং দিয়েছেন এমন একজন যাঁকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি।

—সে শ্রদ্ধা বজায় রেখেই বলব, মেয়েদের তিনি শুধু মানুষ বলে দেখেছেন, মেয়েমানুষ বলে দেখেন নি। তিনি হয়তো জানেন না, তাদের ঐ হাত-পায়ের জোর আসে শুধু একটা জায়গা থেকে। ঐ একটিমাত্র খুঁটি, যা না পেলে শুধু ফাঁকা মাঠে চরে বেড়ানোই সার। পথও নেই, আশ্রয়ও নেই।

সেল-এর বাইরে সুশীলার গলা শোনা গেল—কী বকতেই পারে ছুটোতে!

সামনে এসে হেনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আর আধ ঘণ্টা পরেই যেতে হবে কিন্তু। দেরি হলে বাবুদের ভিড় লেগে যাবে।

—কিচ্ছু দেরি হবে না, মাসীমা! এই দেখুন না, আমি পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

—তোমার তৈরী হওয়া যে কী, তা আর আমি জানি না? ঐ রকম এলোচুলে গেলে আমি কখখনো নিয়ে যাব না, বলে দিচ্ছি। ওর চুলটা ভালো করে বেঁধে দে তো, কমলা। বলেই, হনহন করে চলে গেল জমাদারনী।

—কেমন জব্দ! বলে, কমলা চুল বাঁধতে বসল। আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হল না। উঠবার আগে চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বলল হেনা, উত্তর এখন থাক। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু লিখিস না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

রবিবার হলেও চারটা বাজবার আগেই জেলরবাবু আফিসে এসে পড়লেন, এবং তার কয়েক মিনিট পরেই সুশীলাব পিছনে হেনা এসে দাঁড়াল তাঁর দরজার সামনে। সুশীলা যথারীতি সেলাম করে চলে গেল। একটা টুল দেখিয়ে হেনাকে বসতে বললেন তালুকদার। হাতের কাজটা সেরে নিয়ে বললেন, সুশীলা বলছিল, তুমি আমার খোঁজ করছিলে। কী ব্যাপার বলো তো?

হেনা সলজ্জ কণ্ঠে বলল, কিছু না, এমনিই। আপনি বুঝি সরকারী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ; তবে কাজটা সরকারী নয়, আমার নিজের। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

জেলর সাহেবের মা আছেন, কখনো শোনে নি হেনা। সাগ্রহে চোখ তুলে তাকাল। সেটা লক্ষ্য করে বললেন তালুকদার, আমার ঠিক নিজের মা নয়, দেবতোষের মা। তবে আমিও তাঁকে মা বলেই জানি।

হেনা নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে নিল। তালুকদার বললেন, সে

কথা পরে হবে। তার আগে তোমাকে একটা দরকারী খবর দেব। কোলকাতায় আমাদের হেড অফিস থেকে জেনে এলাম, গভর্নমেণ্ট তোমার খালাস মঞ্জুর করেছেন। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারব।

হেনার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। চোখে ফুটে উঠল শঙ্কিত এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টি—খালাস পেয়ে কোথায় যাবে সে? তালুকদার বোধ হয় বুঝতে পারলেন তার চোখের ভাষা। মৃদু হেসে বললেন, ছেড়ে দিলেও একেবারে ছাড়া পাবে না। তার পরের প্ল্যানও আমরা স্থির করে ফেলেছি।

হেনার কণ্ঠে সাহস ফিরে এল। বলল, আমাকে যে আপনার কাজে লাগিয়ে দেবেন, বলেছিলেন?

—তা আর হল কই? সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সে কাজের ভার তোমার নেওয়া হবে না।

—হবে না! নিবাশ স্বরে বলল হেনা।

—না; কিন্তু তুমি যা ভাবছ সে জন্যে নয়। অন্য কাবণ আছে।

—কী কাবণ? রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করল হেনা।

তার কারণ, হেনার মুখের দিকে আর-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন তালুকদার, দেবতোষ আজও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

হেনার মুখের উপব ফুটে উঠল বেদনার ম্লান ছায়া। মাথাটা নুয়ে পড়ল মাটির দিকে।

তালুকদার গভীব স্বরে বললেন, শুধু তাই নয়। তার চেয়েও বড় কথা, মা তোমাকে চান।

যেন তড়িৎ-স্পর্শে সহসা মাথা তুলে হেনা বলে উঠল, কিন্তু তিনি তো আমার কোনো কথাই জানেন না?

—জানেন। আমার কাছ থেকে সব কিছুই তিনি শুনেছেন। ড্রয়ার খুলে একখানা ভাঁজকরা কাগজ বের করে বললেন, সব শুনেই

আমার হাত দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। এই নাও তাঁর চিঠি।

হেনার হাত কাঁপছিল। কোনো রকমে চিঠিখানা নিয়ে খুলে ফেলল। কয়েকটি মাত্র লাইন।

'সুচরিতাসু,

মা হেনা, তোমাকে কোনো দিন দেখি নাই, তবু মনে হইতেছে, তোমার পবিত্র সুন্দর মুখখানা যেন আমার চোখের উপব ভাসিতেছে। আমি সব শুনিয়াছি। তুমি আসিয়া আমার দেবতোষের ভার লও। তাহা হইলেই আমি সুখী ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সেই শুভদিনটির অপেক্ষায় রহিলাম। আমার মহেশই সব ব্যবস্থা করিবে।

নিত্য-আশীর্বাদিকা তোমার মা।'

চিঠি পড়া শেষ হল। তারপরেও অনেকক্ষণ তার কোনো সাড় রইল না। দু চোখের কোণ বেয়ে গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে নেমে এল যে অবিরল ধারা, তাও বোধ হয় তার অজ্ঞাত রয়ে গেল। তারপর সহসা এগিয়ে গিয়ে মাথাটা লুটিয়ে দিল মহেশের পায়েব উপর।

তিনি বাধা দিলেন না, পা দুটোও টেনে নিলেন না। পরম স্নেহে ওর মাথার উপর ডান হাতখানা রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মনে মনে আমারও এই কামনাই ছিল। এক কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়ে আর-এক কয়েদে ঢুকতে যাচ্ছ। আমিও নিশ্চিন্ত। এই নতুন কয়েদ তোমার অক্ষয় হোক। সুখী হও তোমরা। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার আর কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ পরে নিজের সেলটিতে যখন ফিরে এল হেনা, সমস্ত পৃথিবীর রং তার চোখে বদলে গেছে। এই দীর্ঘ-পরিচিত বাড়িগুলো, এই পাঁচিলঘেরা মাঠ, তার পাশে ঐ গাছপালা, সবগুলোর জন্যে কী এক গভীর মমতায় সমস্ত বুকখানা তার ভরে উঠল। খানিকটা দূরে হাসপাতালের পাশে ঐ নেবু-ঝোপটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে গেল অনেক দিনের অনেক কথা। মধুর আবেশে চোখ দুটো

বুজে এল। হঠাৎ মনে পড়ল বুড়ীর সেই শীর্ণ মুখখানা। সে আর ফিরে আসে নি। ওখান থেকেই খালাস পেয়ে বাড়ি চলে গেছে। কে জানে আজ কোথায় আছে, কেমন আছে! কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে ছিল, জানতেও পারে নি। চোখ খুলতেই দেখল, কমলা বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়া দিয়ে বলল, কী দেখছিস অমন হাঁ করে?

—দেখছি তোমাকে। সত্যি দিদি, এত সুন্দর তোমাকে কোনো দিন দেখি নি। কী হল তোমার?

—হবে আবার কী!

—না বললে ছাড়ছি নে। কী দেখলে, কী শুনে এলে বল।

হেনা বলল না কিছুই। বুকের ভিতর থেকে মায়ের চিঠিখানা শুধু তুলে দিল কমলার হাতে। অমনি কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরল।

—দিদি! তীব্র উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কমলা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিপুল আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দিন তিনেক পরে সকালবেলা নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ কলরবে জেগে উঠল জেনানা ফাটক। খাটনি-ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে এসে জড়ো হল হেনার চারদিকে। সবারই চোখে জল! যারা একদিন তাকে নানা ভাবে আঘাত দিয়েছে, তাদেরও এক চোখে হাসি, আর এক চোখে আঁচল। নিটিং ক্লাসের মেয়েগুলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হেনাব চোখ দুটোও শুষ্ক রইল না। সুশীলা মাঝে মাঝে এসে তাড়া দিয়ে চলেছে। সবার কাছ থেকে একে একে বিদায় নিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল হেনা। কেউ প্রণাম করল, কেউ দু হাতে জড়িয়ে ধরল, কেউ মাথায় হাত দিয়ে জানাল তাদের শেষ বারের আশীর্বাদ। হঠাৎ চোখে পড়ল সকলের চেয়ে দূরে কোণের দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ফুলবানু। তার হুকুম আসে নি। খালাস না-মঞ্জুর করেছেন সরকার। হেনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে

হাতখানা তার কাঁধের উপর রাখতেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আঁচল চেপে ধরল চোখের উপর। হেনা কিছুই বলতে পারল না। বলবার কী-ই বা আছে। কমলাও দাঁড়িয়ে ছিল সবার থেকে আলাদা। চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল হেনা, যা বলেছি সব মনে আছে তো? সনতেব চিঠি আমার কাছেই রইল। তোকে আব জবাব দিতে হবে না। যা করবার আমিই করব। ছাড়া পেলেই তুই সোজা আমার কাছে গিয়ে উঠবি। মাসীমাকে আর জেলব সাহেবকে সব বলে যাচ্ছি।

কমলা কিছুই বলতে পারল না। প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তেরো

মেল স্টীমার 'ফ্যাল্‌কন্‌' বিশাল ঢেউ তুলে গোয়ালন্দ-ঘাটে এসে যখন লাগল, তার কিছুক্ষণ আগেই পদ্মার বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। দোতলার ডেকে রেলিংএর পাশে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ বালির চর, তার উপরে অসংখ্য চালাঘর। কুয়াশা-মলিন অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঢাকা পড়ে আছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে রেলের এঞ্জিন। ঘণ্টা দুই পরে বহু যাত্রী নিয়ে ছুটে চলবে কলকাতার পথে। সুশীলা এবং হেনাকেও যেতে হবে সেই সঙ্গে। বেলঘরিয়াব বাড়িতেই উঠবে ওরা। তিন-চার দিন পরে জেলর সাহেবও এসে পড়বেন। তারপব আশীর্বাদ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আয়োজন। সব হবে ঐ বাড়িতেই। শান্তি আছে, উমা আছে, আরো সব মেয়েরা আছে। তারাই সব করবে। উৎসবে, আলোকে, হাসি-কলরবে মুখর হয়ে উঠবে তাদের মুহ্যমান গৃহাঙ্গন।

গৃহ যাদের জুটল না, সংসার যাদের জঞ্জালের মতো বাইরে ফেলে দিয়েছে, ক্ষণেকের তরে তারাও পাবে গৃহজীবনের স্বাদ। এই তো চেয়েছিলেন তালুকদার। এর চেয়েও অনেক বেশী তাঁর আশা। আরও যারা পড়ে রইল তাঁর আশ্রয়ে, জীবনের সূর্য যাদের মধ্যগগন ছেড়ে যায় নি, একে একে তারাও একদিন মনের মতো ঘর-বর পেয়ে সুখী হবে, সার্থক হবে। হেনার মতো তাদেরও মুখের উপর ফুটে উঠবে সলজ্জ আনন্দের রক্তিম আভা। এই তাঁর চিরকালের স্বপ্ন। আজ তিনি একা নন। এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দেবতোষ, আর এক পাশে হেনা। সবার উপরে রয়েছে মায়ের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘপ্রসারী দৃষ্টির সুমুখে যেন এক নতুন প্রভাতের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেলেন তালুকদার। মীরার কথা মনে পড়ল। কানে বেজে উঠল তার ক্ষীণ কণ্ঠের শেষ অনুনয়। নবীন উৎসাহে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মহেশবাবু। এই তো সবে শুরু। বাকী পড়ে আছে অনেক পথ। কিন্তু সফল তাকে হতেই হবে। মীরার আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না।

স্টেশনের এক পাশে ভিড় থেকে খানিকটা দূরে জেলর সাহেবের দেওয়া নতুন ট্রাঙ্কটার উপর বসে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল হেনা। মনে পড়ছিল বাহাদুরনগরের সেই দিনগুলো। দাদার সঙ্গে এমনি কত দিন এসে বসত আড়িয়ালখাঁর নির্জন ঘাটে। এই তো সেদিনের কথা। তারপর ছুটে এল কত মেঘ, কত ঝড়, তার এই ক্ষুদ্র জীবনের সরু পথ জুড়ে জমে উঠল কত ধুলো, কত আবর্জনা। আজ কি সত্যিই সব কেটে গেছে? দেখা দিয়েছে নির্মল আকাশ? কী জানি কী নিয়ে আসছে তার অনাগত ভবিষ্যৎ? সহসা বুকের ভিতরটা শিউরে উঠল। আজ এই আনন্দের দিনে এ তার কিসের ভয়, মনের কোণে কেন এই আশঙ্কার ছায়া!

সুশীলা সব দিকটা একবার ঘুরে এসে বলল, ওয়েটিংরুমের যা ছিরি! মা গো! ভাঙা চালাঘর; চার দিকে চাটাইয়ের বেড়া।

হ্যাঁ; ইস্টেশন যদি দেখতে হয়, বুঝলি হেনা, যাস আমাদের বরিশালের ঘাটে। কী একখানা ওয়েটিংরুম! ঢুকলেই মনে হবে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি, আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

হেনা নিঃশব্দে হাসতে লাগল। এই বরিশাল-গরবিনীর অনেক উচ্ছ্বাস সে আগেও শুনেছে। বরিশালের চাল, সুপারি এবং কাউঠার (কচ্ছপ) নাম করতে এখনো যে তার মাসীমার রসনা সজল হয়ে ওঠে সে পরিচয়ও সে অনেক বার পেয়েছে। সুশীলা বলল, মেয়েদের ঘরটা দেখলাম একদম খালি। রাত-বিরেতে ওখানে গিয়ে কাজ নেই। পুরুষদের ঘরেই বসবি চল।

—চলুন, বলে হেনাও উঠে পড়ল।

সেখানেও বিশেষ লোকজন নেই। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে এই মাত্র চলে গেলেন। সেই খালি বেঞ্চিটাই একটু ঝেড়ে নিয়ে হেনা বসে পড়ল। সুশীলা গেল খাবার কিনতে। ঘরের ও পাশটায় আর-একখানা বেঞ্চি জুড়ে কে একজন শুয়ে আছেন। সর্বাঙ্গ সাদা চাদরে ঢাকা। বেরিয়ে আছে চোখ আর নাকের খানিকটা অংশ। দেখেই বোঝা যায় অসুস্থ। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল হেনা। কিছুক্ষণ পরে আবার নজর পড়তেই দেখল, সেই চোখ দুটো যেন অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারী অস্বস্তি বোধ হল। উঠে গিয়ে এ দিকটায় পিছন ফিরে সরে দাঁড়াল জানালার ধারে। আরও খানিকটা বাদে এ দিকে ফিরতেই আবার চোখে পড়ল সেই একাগ্র দৃষ্টি। অমন করে কী দেখছে লোকটা? বাইরে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি ছেলে। অনেকটা তারই বয়সী হবে। ব্যস্তভাবে অসুস্থ লোকটির কাছে গিয়ে বলল, ইনভ্যালিড চেয়ার পাওয়া গেল না। একটা স্ট্রেচার হয়তো যোগাড় হতে পারে। পাই ভালোই, না পেলেও ক্ষতি নেই। আমরা দুজনেই আপনাকে কাঁধে করে ওপরের ডেকে তুলে দিতে পারব।

—তাই দিও ভাই, ক্ষীণকণ্ঠে বলল লোকটি। কাঁধে চড়ার দিন তো আর বাকী নেই। রিহার্সালটা এখানেই হয়ে যাক।···বলে হাসতে গিয়ে প্রবল কাশির দমক আর সামলাতে পারল না। মনে হল এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেটি কী করবে ভেবে না পেয়ে এদিক ওদিক করছিল, চমকে উঠল ঠিক পিঠের কাছে নারীকণ্ঠ শুনে—একটু সরুন তো। সরে যেতেই হেনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাটিতে হাঁটু রেখে বসে পড়ল বেঞ্চির পাশে এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বুকের কাপড় সরিয়ে নিপুণ হাতে মালিশ করে দিতে লাগল। খানিকটা কফ উঠে এসেছিল, তার সঙ্গে রক্ত। আঁচলের কোণে মুখটা মুছে নিতে গেলে প্রতিবাদ করে উঠল ভদ্রলোক, ও কী করছ ; বড্ড ছোঁয়াচে রোগ, জান না ?

—জানি। আপনি চুপ করুন তো।

রোগী আর কথা বলল না ; নিঃশব্দে চোখ বুজে পড়ে রইল। তখনো তার স্পন্দিত বুকের উপর হেনার কোমল আঙুলগুলো মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। ছেলেটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল সেই রোগ-ম্লান শীর্ণ মুখখানা যেন দীপ্তিময় হয় উঠেছে। তার মধ্যে জড়িয়ে আছে পরম তৃপ্তির প্রসন্নতা।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর বিকাশই আবার কথা বলল, যাও ; এবার কাপড়টা ছেড়ে ফেলো। আর দেরি কোরো না। নোংরা জায়গাটা বেশ করে ধুয়ে ফেলো লাইজল দিয়ে।

ছেলেটির দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ওকে একবার নদীর ধারে নিয়ে যাও তো সুরেন! লাইজলের শিশিটা সুটকেশ খুললেই পাবে।

—আপনি আগে সুস্থ হোন ; তারপর গেলেই হবে—মৃদুকণ্ঠে বলল হেনা। গলাটা যেন ধরে গেছে, সেটা নিজের কানেও লুকানো রইল না। বিকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, না না ; এবার উঠে পড়ো। আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।

আবছায়া চাঁদের আলোয় বালির চর ভেঙে পদ্মার দিকে যেতে যেতে সুরেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, উনি কি আপনার কোনো আত্মীয় ?

—না।

ছেলেটি একটু বেশী সরল। এর পরেও প্রশ্ন করল, জানা-শুনা আছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

মিনিট দুই চলার পর একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল সুরেন, আত্মীয়-স্বজন বলতে ওঁর কেউ নেই। আপনি কি ওঁর সব কথা জানেন ?

—না।

—কেমন করেই বা জানবেন ? চিরদিনই উনি একা। সেই কোন ছেলেবেলায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় সমস্ত জীবন কাটালেন বনে, জঙ্গলে, জেলে আর ইণ্টারনী ক্যাম্পে। যখন ছাড়া পেলেন, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে ; মনেও আর জোর নেই। বললেন, এবার সংসারী হব। একটি মেয়েকে ওঁর ভালো লেগেছিল। তাকে নাকি কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল আর-একজনের সঙ্গে। কবে কোন বিপদ থেকে নাকি বাঁচিয়েছিল ওঁকে। সেইটাই হল তার দলিল। পার্টি-লীডার রায় দিয়ে বসলেন, ওকেই বিয়ে করতে হবে। টেররিস্টদের এই লীডারের কথাই হল চরম কথা। আপনাকে এসব বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো ?

—না, না। আপনি বলুন ; মনে করবার কী আছে ?

—এই মাত্র যে দরদ দিয়ে ওঁর সেবা করতে দেখলাম, তাতেই মনে হল আপনাকে সব বলা চলে। বিকাশদার মতো এতবড় একটা মানুষ কোনো দিন দেখি নি, জীবনে এতখানি শ্রদ্ধাও কাউকে করি নি। যাক সে কথা। যা বলছিলাম। বিয়েতে উনি সুখী হলেন না। আর, সে তো মেয়ে নয়, রায়বাঘিনী। তবু প্রাণপণে তাকে সুখী করতে চেষ্টা করেছেন। সে যা চায়, কোনো দিন 'না'

বলেন নি। শেষটায় বোধ হয় আর পারলেন না। সামান্য একটা চাকরি নিয়ে চলে গেলেন পাটনায়। তার কিছু দিন পরে ওঁর স্ত্রী গেল হাসপাতালে। সেইখানে থাকতেই একদিন বিষ খেয়ে মরল।

আপনার অজ্ঞাতসারে একবার চমকে উঠল হেনা। সুরেন সেটা লক্ষ্য না করে বলে চলল, কেউ কেউ বলে, বিষ সে নিজে খায় নি, তার দুর্ব্যবহারে টিঁকতে না পেরে কে নাকি খাইয়েছিল। কিন্তু বিকাশদা বলেন, সে আত্মহত্যা করেছিল। যাক। সেই দিন থেকে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। দু বছর আর খোঁজ নেই। চেনা-শোনা যাকেই জিজ্ঞেস করি, কেউ বলতে পারে না। তারপর যেদিন ফিরে এলেন, দেখে চেনা যায় না। শরীরে আর কিছু নেই। রোজ জ্বর হয়; তার সঙ্গে কাশি আর রক্ত। জিজ্ঞেস করলে চেপে যান। আমরা ক-জন জানতে পেরে জোর করে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। তাঁরই চেষ্টায় যাদবপুরে একটা ফ্রী বেড পাওয়া গেল। তাও কি যেতে চান? জীবনটা যেন খেলার জিনিস! হাসেন আর বলেন, 'কী হবে সেরে উঠে? বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পাই না।' একরকম ধরে-বেঁধেই ভর্তি করে দেওয়া হল। ভালোর দিকেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী খেয়াল হল, দেশে যাব। দেশ মানে নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল দশেক দূরে এক অজ-পাড়াগাঁ। ডাক্তার-কবরেজের নামগন্ধও নেই তিন মাইলের মধ্যে। কিন্তু কী করব! চিরকাল দেখে এলাম, একবার জিদ ধরলে বিকাশ ঘোষকে ঠেকায় এমন সাধ্য কারো নেই।

—সেখানে ওঁর কে আছেন? এতক্ষণে প্রশ্ন করল হেনা।

—কে আর থাকবে! থাকবার মধ্যে আছে এক বুড়ী মাসী। তাকে কে দেখে তার ঠিক নেই। সে কথাও বলেছিলাম। উত্তর শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। মা মারা গেলে ঐ মাসীই নাকি ওঁকে বাঁচিয়েছিল। তাই মরবার আগে তারই কাছে ফিরে যেতে চান।

স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার তীরে একটা নির্জন জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সুরেন বলল, এই নিন আপনার কাপড় আর লাইজলের শিশি! আমি ঐ ঢিবিটার ওপাশে থাকব। আপনার হয়ে গেলে ডাকবেন।

সেইখানে দাঁড়িয়ে পরিম্লান জ্যোৎস্নায় ঢাকা প্রশান্ত পদ্মার আদিগন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে কী এক অব্যক্ত বেদনায় হেনার দু চোখ জলে ভরে উঠল। মনে হল, তার সুমুখে যে জীবন পড়ে আছে, সেও এমনি অস্পষ্ট, এমনি রহস্যময় আবছায়ায় ঢাকা!

কাপড় বদলাতে আর ইচ্ছা হল না। রক্তের দাগটুকু ধুয়ে নিয়ে সুরেনের সঙ্গে যখন ওয়েটিংরুমে ফিরে এল তখনো সুশীলাব দেখা নেই। সুবেনের বন্ধুটি ততক্ষণে এসে গেছে এবং জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে যাবার আয়োজন করছে। একটু পরেই তারা বেরিয়ে গেল বোধ হয় টিকেট কিনতে। ঘরে রইল শুধু ওরা দুজন। হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই চমকে উঠল হেনা। সেই কণ্ঠ, কিন্তু অনেকখানি ক্ষীণ, অনেকখানি দুর্বল; যেন কতদূর থেকে ভেসে এল সেই বহুদিনের পুরনো ডাক। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশান্ত মৃদুস্বরে বলল বিকাশ, আমাব জন্যে অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা তোমাকে সইতে হয়েছে, কিন্তু তার কোনোটাই আমি ইচ্ছে করে দিই নি। পার তো এই শেষ সময়ে আমাকে ক্ষমা কোরো। একটুখানি দম নিয়ে আবার বলল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবাব এই সুযোগটুকু দেবার জন্যেই বোধ হয় বিধাতা আমাদের দেখা করিয়ে দিলেন। নইলে এর তো কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। আজ ভারি হালকা লাগছে বুকটা। মনে হচ্ছে, এবার নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারব।

—একটা অদম্য কান্নার ঢেউ বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে হেনার কণ্ঠ চেপে ধরল। কোনো কথাই বলা হল না। ঠিক সেই সময়ে সুরেন আর তার সঙ্গীটি এসে পড়ল একটা স্ট্রেচার নিয়ে।

হেনা আবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওকে একটা ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে সুরেন আর তার বন্ধু ধরাধরি করে বিকাশের শীর্ণ দেহটা স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে চলে গেল। সেই শূন্য ওয়েটিংরুমের মাঝখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে রইল একা। এমনি করে কেটে গেল কতক্ষণ। হঠাৎ কী এক দুর্বার শক্তির টানে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়ান; আমি যাব।' ওরা ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মুহূর্তকাল বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখল হেনা। ভিড়ের মধ্যে আবছায়ার মতো দেখা গেল, বিকাশের দেহখানা সরে যাচ্ছে দূর থেকে, দূরান্তরে। সেইটুকু লক্ষ্য করেই সে ছুটে চলল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

বিপরীত দিক থেকে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে ফিরছিল সুশীলা। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী! কোথায় চলেছিস ছুটতে ছুটতে! আমাদের পথ ওদিকে নয়।

একবার থমকে দাঁড়াল হেনা। আর্ত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ মাসীমা! এই দিকেই আমার পথ। আমার ডাক এসে গেছে।

—বলছিস কী পাগলের মতো! ফিরে আয়। গাড়ির সময় হয়ে গেছে।

—আর ফেরবার উপায় নেই। ওঁদের বলবেন। আমি চললাম। ···বলেই আবার চলতে শুরু করল।

—কোথায় যাচ্ছিস! কার সঙ্গে চললি? শোন—

—দেখতে পান নি? ঐ যে নিয়ে গেল। আমার শত্রু, আমার চিরদিনের শত্রু।···বলতে বলতেই আবার মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

স্ট্রেচারটা দেখতে পেয়েছিল সুশীলা। কিন্তু আর কিছুই বুঝতে না পেরে ডাকতে ডাকতে চলল ওর পিছনে।

জাহাজের সিঁড়ি তখন তোলা হচ্ছে। একখানা তক্তা শুধু

বাকী। পারের লোকেরা সভয়ে চেয়ে দেখল, তারই উপর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে একটি দুঃসাহসী মেয়ে। পদ্মার হাওয়ায় উড়ছে তার এলো চুল, লুটিয়ে পড়ছে আচল। কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। খালাসীরা চিৎকাব করে উঠল দুর্বোধ্য ভাষায়। ততক্ষণে সে উঠে গেছে নিচেকার ডেকের উপরে।

সুশীলা যখন ঘাটে এসে পৌছল, তার একটু আগেই শেষ সিঁড়িখানা সরিয়ে নিয়েছে খালাসীরা। পদ্মার বুকে সফেন আলোড়ন তুলে জেগে উঠেছে জাহাজের চাকা। জমাদাবনীব চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে গেল। বুক থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটা অসহায় ডাক—হেনা···। 'ফ্যালকন'-এর গম্ভীর গর্জনে সে ডাক কারো কানে পৌছল না।

